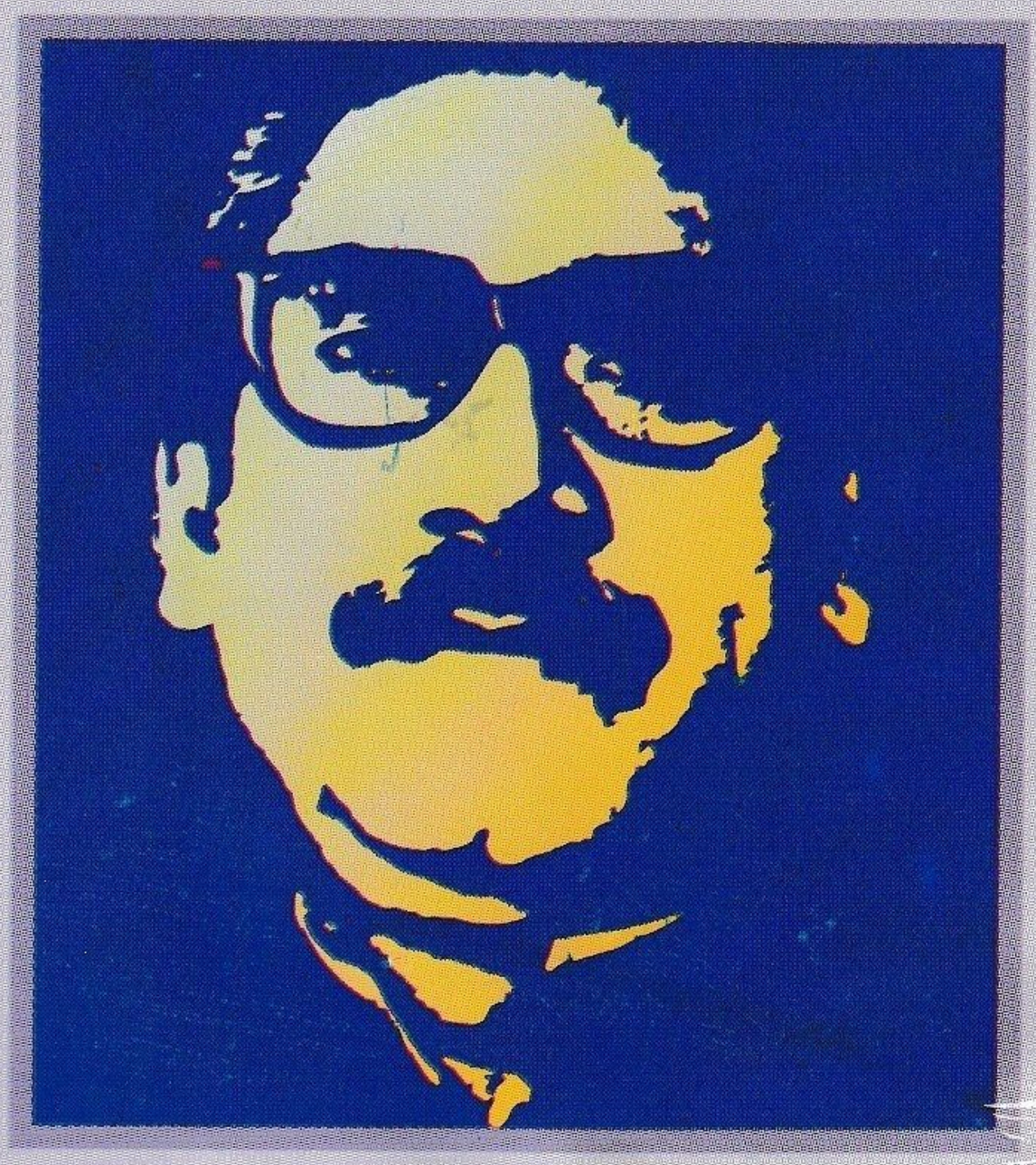


কাজী নজরুল

ইসহাক কাজল



যার আঙ্গুলের ইশারায় উত্তাল হয়ে উঠেছিল ৭ মার্চের রেসকোর্স ময়দান, অতঃপর ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত দেশে। সেই উত্তালতাই জন্ম দিয়েছিল একটি স্বাধীন দেশের। জন্মভূমির সেই মহান পুরুষ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা অধিকাংশ প্রবন্ধসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখা অনেকগুলো প্রবন্ধ নিয়ে জনক তুমি বাংলাদেশ বইটি যেমন বঙ্গবন্ধুকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয় অন্তর্গত অনুভূতি দিয়ে, মগ্ন চেতনালোকে। তেমনি আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে তুলে ধরে নতুন করে।

প্রচ্ছদ: আজহার বিন ফরহাদ

জনক তুমি বাংলাদেশ

জনক তুমি বাংলাদেশ

ইসহাক কাজল

ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ

প্রকাশনার এক দশক

জনক তুমি বাংলাদেশ

প্রবন্ধসংকলন

ইসহাক কাজল

স্বত্ব
লেখক

দ্বিতীয় সংস্করণ
আগস্ট ২০১৪

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১০

প্রকাশক
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
মান্নান মার্কেট
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৪৭৬০, ০১৭১৫ ৪২৮২১০, ০১৭১২ ২৩৫৩৪২
e-mail : ittadisutrapat@yahoo.com

প্রচ্ছদ
আজহার বিন ফরহাদ

অক্ষরায়ন
বন্ধু কম্পিউটার্স
২৮/সি-২ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

ছাপাখানা
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
১০/১ বি কে দাশ রোড, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা

মূল্য
৩৫০ টাকা

ISBN : 984 70289 0105 3

উৎসর্গ

মোহাম্মদ আমজাদ উল্লাহ
সায়েরা বেগম

আমার শ্রদ্ধেয় মা-বাবা

ভূমিকা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করে পাঠকের দৃষ্টিকে কুয়াশামুক্ত ও প্রসারিত করার প্রয়োজন ইসহাক কাজল তীব্রভাবে অনুভব করেন। তিনি রাজনৈতিক কর্মী এবং পেশাগতভাবে সাংবাদিক। নির্মোহ সাংবাদিকের দৃষ্টিতে তিনি উল্লিখিত বিষয়গুলো বিচার-বিশ্লেষণ করে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন।

বর্তমান গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সম্পর্কে নয়টি লেখা রয়েছে। এই লেখাগুলির মাধ্যমে ইসহাক কাজল ব্যাখ্যা করেছেন—বঙ্গবন্ধু কিভাবে ছাত্রনেতা থেকে রাজনৈতিক দলের নেতা এবং ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে জাতির জনকে পরিণত হন। এই উপলক্ষে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠ হয়ে উঠেছিল সাত কোটি মানুষের একক কণ্ঠস্বর। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর অমোঘ বাণী 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'—নিপীড়িত বাঙালিকে সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে অনুপ্রাণিত করে। তা সত্ত্বেও ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর ধর্মান্ধ, বাঙালি জাতীয়তাবাদবিরোধী মহল বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে নির্জলা কুৎসা প্রচার অব্যাহত রাখে। এই গ্রন্থ পাঠে আমরা দেখতে পাই, ইসহাক কাজল এদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী জামায়াতে ইসলামী ও পাকিস্তানপন্থী রাজাকারদের সম্পর্কে তথ্য ও বিশ্বস্ত দলিলপত্র উদ্ধৃত করে লেখক যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অনুষ্ঠানের দাবি অবিলম্বে কার্যকর করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন। এদের অপকর্ম সম্পর্কিত তিনটি লেখার মধ্যে একটি শিরোনাম হলো 'হাইকোর্টের রায় ও ফতোয়াবাজদের হুংকার।'

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান শনি গ্রহের ভূমিকা পালন করেন। ক্ষমতা দখল করার পর তিনি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংবিধান কাটছাঁট করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ গ্রহণ, বঙ্গবন্ধু হত্যা তদন্ত কমিশন বাতিল, ছয়জন রাজাকারকে

তাঁর তথাকথিত মন্ত্রিসভায় নিয়োগ দান করেন এবং কর্নেল তাহেরসহ বহু সংখ্যক সামরিকবাহিনীর সদস্যকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। তাঁর আমল সম্পর্কে চারটি লেখা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

এই গ্রন্থের লেখাগুলির মধ্যে 'যুদ্ধ দিনের স্মৃতি' শীর্ষক লেখাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তরুণ বয়েসী লেখক ও তাঁর সহযোদ্ধাদের সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কিত একটি স্পর্শকতার কাহিনী এই লেখায় বর্ণিত হয়েছে। ১৯৭১ সালের মে মাসের এক দুপুরবেলা অভুক্ত ইসহাক কাজল ও তাঁর সহযোদ্ধারা সত্তর বছর বয়সী এক হিন্দু মহিলার বাড়িতে হাজির হন। যুদ্ধের ভয়ে গ্রামের আর সবাই গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। বয়সের ভারে নত হয়ে যাওয়া এই বৃদ্ধার আদর-আপ্যায়নের কথা মুক্তিযোদ্ধারা ভোলেননি। চির-চেনা ভিটে এবং স্বামীর সংসার ফেলে তিনি স্বজনদের সঙ্গে অন্য দেশে যাননি। উদার এবং অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এই মহৎপ্রাণ মহিলা স্বাধীনতাকামী বাঙালির নমস্য।

এই গ্রন্থের আরেকটি লেখার শিরোনাম হলো 'স্বাধীনতার প্রথম ডাক দেন মওলানা ভাসানী।' মওলানা সাহেবকে লেখক আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনসহ মুসলিম লীগবিরোধী সংগ্রামে, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী কর্মকাণ্ডে, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধকালে 'সিপাহসালার' হিসেবে দেখেছেন। লেখক তাঁকে স্বাধীনতার পথিকৃৎ হিসেবে বর্ণনা করেন।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের গোড়াপত্তন হয়। এর ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটে। 'ভাষা আন্দোলনে সিলেট' শীর্ষক লেখায় বলা হয়, একুশের ভাষা আন্দোলনে সিলেটবাসী ছিলেন প্রথম কাতারে। দেশের অন্যান্য অনেক জেলায় ভাষা আন্দোলন প্রসারিত হতে সময় লাগলেও জাতীয় পর্যায়ে আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকে সিলেটে এ আন্দোলনের ব্যাপক তৎপরতা ছড়িয়ে পড়ে। সিলেট জেলায় পরিচালিত আন্দোলনে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী, মতিন-উদ-দীন আহমদ, আবদুস সামাদ আজাদ, বেগম জোবেদা খান চৌধুরী, সৈয়দা শাহারা বানু, পীর হাবিবুর রহমান, তাসাদ্দুক আহমদ, আবুল মাল আবদুল মুহিত, প্রসুন কান্তি রায় ও মাহমুদ আলী (মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের বিরোধিতাকারী)। এই লেখাটি ভাষা-আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আকর বলে বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এডওয়ার্ড হিথ (পরবর্তীকালে স্যার এড্ওয়ার্ড)। ১৯৭২ সালের শুরুতেই পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে বঙ্গবন্ধু ৮ জানুয়ারি লন্ডনে এসে হাজির হন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি প্রধানমন্ত্রী হিথ-এর সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। এই সাক্ষাৎকারকালে মি. হিথ বাংলাদেশকে শিগগিরই ব্রিটিশ সরকার স্বীকৃতি দান করবে বলে আশ্বাস দেন। ব্রিটিশ সরকারের সৌজন্যে রাজকীয় বিমানবাহিনীর একটি 'কমেট' বিমানযোগে বঙ্গবন্ধু দিল্লি হয়ে ঢাকায় পৌঁছান। ২০০৫ সালে ১৭ জুলাই ৮৯ বছর বয়সে স্যার এডওয়ার্ড হিথ মারা যান। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে লেখা একটি নিবন্ধ এই গ্রন্থ রয়েছে।

এ গ্রন্থে সংযোজিত নিবন্ধগুলি দু খণ্ডে সাজানো হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির স্মৃতিচারণমূলক লেখা। এদের মধ্যে রয়েছেন : অন্নদাশঙ্কর রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা মিত্র, বিজয় সিংহ নাহার, অধ্যাপক দিলাপ চক্রবর্তী ও সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত।

এ গ্রন্থটিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ভাষা আন্দোলন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রামাণ্য তথ্যভিত্তিক বিবরণ রয়েছে।

লন্ডন, ৩১ মার্চ ২০০৯

আবদুল মতিন

সূচিপত্র

'সূর্য অস্ত যায় না কখনো' / ১৩

ইতিহাসের দায়বদ্ধতা ও বঙ্গবন্ধু / ১৭

বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ / ২১

'আমার পিতাকে আমি পিতা বলবই তার জন্য কি ৬

জাতির জনকই স্বাধীনতার ঘোষক / ৩২

বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাই ছিল একমাত্র মন্ত্র / ৩৯

জনক তুমি বাংলাদেশ / ৪২

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ৮৩ দিনের দুঃসহ স্মৃতি / ৪৮

জনক তোমার জন্মদিনে / ৫৪

আমাদের বঙ্গবন্ধু / ৫৮

স্বাধীনতার প্রথম ডাক দেন মওলানা ভাসানী / ৬৪

জাতির পতাকা খামচে ধরেছে স্বদেশী শকুন / ৭১

আরেকটি মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য / ৭৭

যুদ্ধদিনের স্মৃতি / ৮২

এবার শুরু হোক কুকুর নিধন অভিযান / ৮৭

পাকিস্তানি পতাকা জ্বালানোর ঘটনাটি শমসেরনগরেই ঘটে / ৯৫

স্বাধীনতার শত্রু-মিত্র / ১০১

শ্রদ্ধাঞ্জলি : স্যার এডওয়ার্ড হিথ / ১০৭

জল্লাদ এক রাষ্ট্রপতি / ১১২

ভাঙা স্যুটকেস নিয়ে আর কত ডুগডুগি বাজাবেন? / ১২০

ভাষা আন্দোলনে সিলেট / ১২৫
সাহস চাই, সাহস, আরো সাহস / ১৩২
অষ্টম সংশোধনী এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা / ১৩৮
'ব্লাডি সিভিলিয়ান'দের জন্য শোক প্রকাশের কেউ নেই / ১৪৬
হাইকোর্টের রায় ও ফতোয়াবাজদের হুংকার / ১৫২
শাসকগোষ্ঠী নয়, ইতিহাস তৈরি করে জনগণ / ১৫৮
জহির রায়হান থেকে শাহরিয়ার কবির / ১৬৩
সাইফুর রহমানের মানসিক বৈকল্যসুলভ মন্তব্য প্রসঙ্গে / ১৬৮
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড কার বুক ঝাঁঝরা হবে আরো একবার? / ১৭২
যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং রাষ্ট্রের দায় / ১৭৯
রাজাকার চিকন আলী এবং আজকের বাংলাদেশ / ১৮৬
বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের বীরসেনানী শহীদ খালেদ মোশাররফ / ১৯২
দায়মুক্তি হলো চৌত্রিশ বছর পর / ২০০

পরিশিষ্ট

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট কয়েকজনের স্মৃতিতে / ২০৫

সব সাক্ষ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ করে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারিক আদালতের বিচারক জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল তার রায়ে বলেছিলেন, ‘ভোর ৫টায় হত্যা করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। সাক্ষীদের অনেকেই হত্যাকাণ্ডের সময় বোঝানোর জন্য আজানের পরপরই ঘটনাটি সংঘটিত হয় বলে উল্লেখ করেছেন।’ বাংলাদেশের ইতিহাসে নৃশংসতম এই হত্যাকাণ্ডে প্রাণ হারান স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৯ জন। আগামী ১৫ আগস্ট রবিবার সেই কালরাতের ২৯তম বার্ষিকী। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশটি দীর্ঘ ২১ বছর নৃশংস এ হত্যাকণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার পথে ছিল প্রধান বাধা। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ নামের এই কালো আইনটি বাতিল করার পর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়। মামলার দীর্ঘ শুনানির পর রায় ঘোষণা করা হয়। মামলার রায়ে ১৫ জনের মৃত্যুদণ্ড এবং ৪ জনকে নির্দোষ ঘোষণা করা হয়। ২০০১ সালের বিতর্কিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতার বলয় থেকে ছিটকে পড়ে। সরকার গঠন করে বিএনপি-জামায়াত জোট প্রতিক্রিয়াশীল চক্র। তারপর থেকেই গত তিন বছরের অধিক সময় ধরে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদলতের আপিল বিভাগে মামলটি বিচারাধীন অবস্থায় পড়ে আছে। কিন্তু এই মামলা শুনানির জন্য বর্তমানে বিচারকও নেই আবার শুনানির জন্য বাদীপক্ষের আইনজীবীও নেই। পাকিস্তানের সেনাশাসক আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করেছিল, সে মামলার বিচার কার্যক্রম বিশেষ ট্রাইব্যুনালে শুরু হয়েছিল। গণঅভ্যুত্থানের ফলেই সেসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সে মামলা থেকে অব্যাহতি লাভ করেছিলেন। নতুবা সে মামলার রায় নির্ধারিত ছিল মৃত্যুদণ্ড। সেনাশাসক জিয়াউর রহমানের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন কর্নেল

আবু তাহের। বিদ্যমান আইনে তাহেরের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছিল তাতে ফাঁসি দেয়া যায় না। শুধু তাই নয়, পঙ্গু ব্যক্তিকে ফাঁসি দেয়া যায় না। জিয়াউর রহমান তাই কর্নেল আবু তাহেরের বিচার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে সম্পন্ন করে ফাঁসির রায় কার্যকর করেছিলেন। কর্নেল আবু তাহেরকে ফাঁসি দেয়ার ১০ দিন পর একটি সামরিক অধ্যাদেশ জারি করে ফাঁসির রায়কে বৈধতা প্রধান করা হয়। বিচারপতি সাত্তার যখন নামমাত্র রাষ্ট্রপতি ছিলেন, সেসময় সামরিক আদালতে বিচারের নামে প্রহসন করে ১২ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ফাঁসি দেয়া হয়। গোপন বিচারের মাধ্যমে সেনাশাসক জিয়াউর রহমান কয়েক হাজার সেনা সদস্যকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেন। এজন্য তাদের কোনো জবাবদিহি করতে হয়নি। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এসব হত্যাকণ্ডের ব্যাপারে কোনো প্রকার তদন্ত করা তো দূরের কথা, বরং নীরবতা পালন করে হত্যার ঘটনাগুলোকে বৈধতা প্রদান করেছে। অথচ যাদেরকে প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে, তারা সবাই ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা।

এতসব প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ সরকার বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা দেশের প্রচলিত আইনে সম্পন্ন করার উদ্যোগ কেন যে নিয়েছিল তা এক রহস্য বটে। কেন দেশের প্রচলিত আইনে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারপ্রক্রিয়া চালানো হয়েছিল এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন, তারা দেশের প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলেই বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার শুরু করেননি। কিন্তু তাদের সে উদারতা যে ভুল ছিল, এখন সে সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা নিয়েও জনমনে অনেক প্রশ্ন ছিল এবং এখনো আছে। এই মামলায় কেবল দৃশ্যমান ঘাতকদেরকেই আসামি করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে আওয়ামী লীগের একটি কুচক্রী মহলসহ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্র যে জড়িত ছিল, সে বিষয়টি অতি সুকৌশলে উপেক্ষা করা হয়। অথচ বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে যে মার্কিন ষড়যন্ত্র ছিল, সে সত্য গোপন ছিল না। আন্তর্জাতিকভাবে তা স্বীকৃত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতিতে একটি কথা প্রচলিত আছে, 'পলিটিক্স হ্যাজ নো মার্সি এটওল।' কিন্তু মর্মান্তিক হলেও সত্য, 'ক্ষমাই আমাদের বারবার প্রতারিত করেছে। একাত্তরের

ঘাতক দালালদের আমরা ক্ষমা করে দিয়েছি। সেই ক্ষমার প্রতিশোধ এখন কড়ায়গণ্ডায় আমাদেরকে দিতে হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বাসঘাতক খন্দকার মোশতাক আহমদকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন বলেই এই মোশতাক চক্রের চক্রান্তে তাঁকে সপরিবারে প্রাণ দিতে হয়। বিপ্লবী কমরেড চেগুয়েভারার একটি বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে,

'While the destiny of whole mankind is at stake, the future of the security of an individual is not a mater at all.'
'সমস্ত মানবজাতির ভাগ্যই যেখানে বিপন্ন সেখানে কোনো ব্যক্তির ভবিষ্যৎ বা নিরাপত্তার প্রশ্ন অবান্তর।' সে বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে কমরেড চেগুয়েভারা বিপ্লবের পতাকা উত্তোলনের জন্য গিয়েছিলেন বলিভিয়ায়। কিন্তু সেখানে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একই বিশ্বাস ধারণ করতেন বলেই বঙ্গভবনের নিরাপত্তা বেষ্টনীতে বসবাস না করে ৩২ নম্বরে নিরাপত্তাহীনভাবে নিজের বাসভবনে বসবাস করতেন। আর এই বিশ্বাসের ফলেই তাঁকে হত্যা করতে ঘাতকদের তেমন বেগ পেতে হয়নি। এই বিশ্বাসে বিভোর হয়ে আরো হাজার হাজার সাহসী যোদ্ধা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড একটি নিছক হত্যার ঘটনা নয়। এই হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত আমাদের সুফলগুলো নির্বাসনে প্রেরণ করা হয়। এ কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার ঘটনা যারা নিছক হত্যাকাণ্ড হিসেবে দেখেন তারা কিন্তু কৌশলে ইতিহাসের প্রবহমান সত্যকে অস্বীকার করেন। পাকিস্তানের সেনাশাসক আইয়ুব খান-ইয়াহিয়া খানকে আমরা আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে পরাজিত করেছিলাম। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান সেই সামরিক স্বৈরাশাসনকেই বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনেন। জেনারেল এরশাদ সেই শাসনকে বেগবান করেন। তারপর থেকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বেসামরিক সরকারের ক্ষমতায় থাকা না থাকা সেনাবাহিনীর সমর্থনের উপর নির্ভর করে। তাই সেনাবাহিনীর নির্যাতনে ৫০ জন বেসামরিক লোকের মৃত্যু হলে দ্বিতীয় দফা সংসদে ইনডেমনিটি আইন পাস করে হত্যার দায় থেকে সেনা সদস্যদের দায়মুক্ত করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কথা যখনই মনে পড়ে

তখনই মনে পড়ে চীন, পাকিস্তান আর সৌদি আঁতাতের কথা। মনের আয়নায় ফুটে ওঠে হেনরি কিসিঞ্জার ও নিক্সনের চেহারা। আর মুক্তিযুদ্ধকালীন স্মৃতি যখন চোখের পর্দায় ভেসে ওঠে, তখন মনে পড়ে ইন্দিরা গান্ধীর উজ্জ্বল ভাবমূর্তি। মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে সাথীদের মুখেমুখে উচ্চারিত হতো শেখ মুজিবের নাম। সে সময় তো ভুলেও কেউ কোনো মেজরের নাম উচ্চারণ করেনি।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে রাহুর কবলে বাংলাদেশ আর বাঙালি জাতি। কিন্তু এই রাহুগ্রাস অবশ্যই ক্ষণস্থায়ী। গোয়েবলসের প্রচারণার মতো মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে সত্যকে মিথ্যা করা যায় না। সত্য একদিন আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবেই। আইয়ুব খান-ইয়াহিয়া খান কত দাপটের সাথে অনেক মিথ্যাচার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। কিন্তু আজ তো কারো মুখে তাদের নাম উচ্চরিত হয় না। ডোবাকে যারা দিঘি বলে, পুকুরকে সাগর বলা তাদের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। হাওরকে তারা কি বলবে? নিশ্চয়ই সমুদ্র। তাই তাদের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মূল্যায়ন প্রত্যাশা করা যায় না। প্রত্যাশা করা বোকামির নামান্তর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির পরিচয়। এ পরিচয় কোনোদিন ম্লান হবে না। সানইয়াত সেন, লেনিন, স্টালিন, মাও সেতুং, হোচি মিন, গান্ধীজী, পণ্ডিত নেহরু, মওলানা ভাসানী যেমন স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন তেমনি বাঙালি জাতির জনক স্বধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও বাঙালি জাতির হৃদয়ে চিরভাস্বর হয়ে আছেন। পনের আগস্টের এই দিনে তাই আমার স্বগত উচ্চারণ 'অতএব দৃঢ় চিত্তে শোন/ সূর্য অস্ত যায় না কখনো'। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও বাঙালি জাতির হৃদয়ে এক উজ্জ্বল সূর্য, সে সূর্য কখনো অস্ত যেতে পারে না।

১০.০৮.২০০৪

ইতিহাসের দায়বদ্ধতা ও বঙ্গবন্ধু

পনেরই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। বাংলাদেশের ইতিহাসে নৃশংস ও রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে ঘৃণিত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশ দেশী-বিদেশী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকারীদের সহযোগিতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি ও রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। বঙ্গবন্ধুর পুরো পরিবারের মধ্যে তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশ থাকার কারণে ঘাতকচক্রের গুলির নিশানা থেকে রক্ষা পেয়ে যান। ইতিহাসের এই নির্মম হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের রাজনীতির ধারাই পাল্টে দেয়। এই হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসীন হয় বিশ্বাসঘাতক খন্দকার মোশতাক। যার হাত ধরে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতাবিরোধী রাজনীতির সূত্রপাত ঘটে, যা জিয়া ও এরশাদ এবং বেগম খালেদা জিয়ার আমলে পরিপুষ্ট হয়ে এখন পর্যন্ত অব্যাহত আছে। এই দীর্ঘ একুশ বছর সময় বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নির্বাসনে ছিল। বিশ্বাসঘাতক মোশতাক আইন করে ঘাতকদের বিচারের পথ রুদ্ধ করে দেয় এবং সেই আইনকে জিয়া সংবিধানের সাথে যুক্ত করে ঘাতকদের নিরাপদ করে দেন। শুধু এখানেই শেষ নয়, বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের বিদেশের দূতাবাসে চাকরি ও দেশে রাজনীতি করার সুযোগ দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। এই শোকাবহ ঘটনার একুশ বছর পর বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া দল আওয়ামী লীগ তাঁরই কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ১৯৯৬ সালের জুন এবং এ বছরই পনেরই আগস্ট জাতীয় শোকদিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের উদ্যোগ সংবিধানের সাথে যুক্ত কালো অধ্যাদেশটি বাতিল করে বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের বিচার সম্পন্ন হয়। বিচারের রায়ে

ঘাতকদের ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু আইনের জটিলতায় সে রায় এখনও কার্যকর হয়নি। আওয়ামী লীগ সরকার এই হত্যাকাণ্ডের পেছনের নায়কদের এবং আন্তর্জাতিকভাবে যারা জড়িত ছিল তাদের আড়াল করে রেখে দৃশ্যমান ঘাতকদের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। শুধু এখানেই শেষ নয়, এই বিচারের উদ্যোগ যেখানে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে সম্পন্ন করা উচিত ছিল, সেখানে সাধারণ আদালতে এই হত্যাকাণ্ডের বিচারকার্য সম্পন্ন করার ফলে দীর্ঘসময় অতিবাহিত হওয়ার পর রায় ঘোষণা হলেও রায় কার্যকর হচ্ছে না। কবে যে সে রায় কার্যকর হবে, আর বাঙালি জাতি জনকের রক্তের ঋণ শোধ করতে পারবে তা অনিশ্চিত হয়ে আছে।

ঔপনিবেশিক অভিঘাতে এ অঞ্চলে দ্বিজাতিতত্ত্ব নামের একটি আজবতত্ত্বের উদ্ভাবন করেন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ। এই আজবতত্ত্বের মাধ্যমে বাঙালি জাতিসত্তার জাগরণকে চিরনির্মূলের উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু বাঙালির স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় নাকচ করে দেয় দ্বিজাতি তত্ত্বকে, নাকচ করে দেয় ঔপনিবেশিকতাকে, বিজয় অর্জন করে বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম। প্রমাণিত হয় ঔপনিবেশিক অভিঘাতে সৃষ্ট জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্ব ভুয়া এবং অসার একটি তত্ত্ব। যার ফলে শুধু জন্ম নেয় হিংসা-সহিংসতার। ঔপনিবেশিকতা ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির তেইশ বছরের ধারাবাহিক রাজনৈতিক সংগ্রাম ও নয় মাসের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে দ্বিজাতিতত্ত্বের কবর রচিত হয়। বাঙালি জাতির তেইশ বছরের এই ধারাবাহিক রাজনৈতিক সংগ্রামে নেতৃত্বের পাশাপাশি বাংলাদেশের জনগণের সশস্ত্র স্বাধীনতাযুদ্ধের চূড়ান্ত সংগ্রামের মহানায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান; এতে কারো কোনো প্রকার সন্দেহ পোষণ করার সুযোগ নেই। আমাদের সহস্র বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা। এই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই একটি জাতির উত্থান ঘটে, এই উত্থান আর বিজয়ের কারিগর ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই মর্মান্তিক সত্যকে বিবৃতি দিয়ে, বক্তৃতা দিয়ে বদলে ফেলা যায় না। এমনকি অস্বীকার করেও সঠিক ইতিহাস বদল করা যাবে না।

রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে রাজনৈতিক সমালোচনা থাকতেই পারে। বরং না থাকাটা অস্বাভাবিক। বঙ্গবন্ধু হত্যার সপক্ষে অবস্থান নিয়ে অনেকেই বলে থাকেন, এই হত্যাকাণ্ড ছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে একদলীয় শাসন কায়েম করেছিলেন সে শাসন কাঠামো পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বাস্তব ইতিহাস হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত। এই হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ক্ষমতার শীর্ষ নেতৃত্বের পরিবর্তন করে রাজনীতিতে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী, পাকিস্তানপন্থী ও সাম্প্রদায়িক ধারাই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং গণতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের পর যারাই ক্ষমতা জবরদখল করেছেন তারাই 'বাকশাল' প্রবর্তিত রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থাসহ সংবিধানের সকল স্বৈরাচারী পরিবর্তনকে সযত্নে লালন করেছেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জোরদার করেছেন। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর থেকে যারাই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছেন তারা কেবল ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশকে স্বাধীনতাবিরোধী একাত্তরের ঘাতক দালাল আর সাম্প্রদায়িক শক্তির অভয়ারণ্যে পরিণত করেন। দীর্ঘ গণআন্দোলনে নব্বই সালে স্বৈরাচারী ব্যবস্থার পরিবর্তন করে দেশকে পুনরায় গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। অথচ এই দীর্ঘসময় যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন তারা শুধু রাষ্ট্রযন্ত্র থেকেই নয়, বাঙালির হৃদয় থেকেও বঙ্গবন্ধুকে জোর করে সরিয়ে রাখতে চেয়েছেন। কখনো ইনডেমনিটির মাধ্যমে, কখনো অধ্যাদেশ জারি করে বঙ্গবন্ধুকে নির্বাসনে রেখেছেন। বঙ্গবন্ধু না জন্মালে বাংলাদেশ সৃষ্টি হতো না, আর বাংলাদেশ সৃষ্টি না হলে এখন যারা বড় বড় বুলি আওড়ান, তাদের নামও কেউ জানতে পারত না।

এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্থপতি এবং জাতির জনক। বঙ্গবন্ধুর ধারাবাহিক সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগকে যারা খাটো করে দেখতে চায়, যারা তাঁর অবদানকে অস্বীকার করে, তারা একাত্তরে বাঙালির বিপক্ষে ছিল। লাখো লাখো বাঙালির রক্তে তাদের হাত রঞ্জিত, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে তাদের কোনো দায়বদ্ধতা যেমন থাকতে পারে না, তেমনি বঙ্গবন্ধুকে জনক হিসেবে মেনে নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যারা বিশ্বাসী, ইতিহাসের দায়বদ্ধতাকে তাদেরকে মেনে নিতেই

হবে। আর সে দায়বদ্ধতা হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোনো বিশেষ দলের নয়, তিনি গোটা বাঙালি জাতির জনক। আমরা বর্জন করেছি অনেক সত্যকে, কিন্তু এই সত্যকে এড়াতে চেয়েছি বলেই দেশের শত্রু, স্বাধীনতার শত্রু ও মিত্র নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশের এই দুর্যোগ সময়ে আবার আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে। কেবল ইতিহাসের দায়মুক্তির জন্য নয়, আমাদের আত্মপরিচয়ে জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অপরিহার্য।

১৪.০৮.২০০৩

বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি নাম, একটি ইতিহাস, একটি মানচিত্র। বঙ্গবন্ধু এ দেশে জন্মেছিলেন বলেই আমরা বাঙালি জাতিসত্তার স্বরূপ খুঁজে পেয়েছিলাম। বিশ্বের দরবারে জাতি হিসেবে আমরা পেয়েছিলাম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। আমরা পেয়েছি একটি ভূখণ্ড, একটি মানচিত্র, একটি পতাকা ও একটি জাতীয় সঙ্গীত। বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে এসব পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মহান নেতা, বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের স্থপতি বা রূপকার। এ ব্যাপারে কোনোরূপ বিতর্ক বা সমালোচনা অর্থহীন। এসব সত্য যারা মানতে রাজি নয় তারা হয় রাজাকার নয়তো জন্মান্ধ। বাংলার এই ভূখণ্ডে বঙ্গবন্ধুর মতো এত বড় মাপের আরেক বাঙালি জননেতার জন্ম হয়েছিল, তিনি হচ্ছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

নেতাজী সুভাষ বসু আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব উভয়ের মধ্যে চিন্তা চেতনা আর রণকৌশলগত ভিন্নতা থাকলেও উভয়েরই লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতির মুক্তি। সাহসী বীর বাঙালির বীর নেতা ছিলেন এই দুই মহাপুরুষ। নেতাজী সুভাষ বসু ব্রিটিশ সিংহাসনকে কাঁপিয়ে তুলেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা ব্রিটিশ বিতাড়ন আন্দোলনে নেতাজীর ভূমিকা ছিল সর্বোচ্চে। তিনি মহাত্মা গান্ধীর মতো আপস করে ভারতের স্বাধীনতা পেতে চাননি। তাই তিনি অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের মতো এক বিরাট বাহিনী। বঙ্গবন্ধু পাক বর্বরদের সাথে আপসরফা করেননি। তাই বন্দি হবার পূর্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। ৭ মার্চ ১৯৭১ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঐতিহাসিক জনসভার ভাষণে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণাকে সাথী করে

বাঙালি জীবন বাজি রেখে পাক বর্বর-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ নেমে পড়ে। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে বীর বাঙালি স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনে।

নেতাজী সুভাষ বসু লড়াই করেছেন সত্য, কিন্তু বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হননি। ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তের জাল বুনে সুভাষ বসুর ভারতে ফিরে আসার পথ করা হয় রুদ্ধ। যে সুন্দর ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন নেতাজী, সে ভারতের মাটিতে তিনি ফিরে আসতে পারেননি। রহস্যজনক এক বিমান দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন বলে প্রচার করা হয়। নেতাজীর সে মৃত্যুরহস্য আজো উদ্‌ঘাটিত হয়নি। তবে ব্রিটিশের সেবাদাস স্বাধীন ভারতের শাসক-শোষক গোষ্ঠীর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে যে তিনি নিহত হয়েছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বাঙালি জাতির এই মহান নেতাকে এভাবেই নিঃশেষ করে দেয়া হয়। যিনি বীরদর্পে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমাকে রক্ত দাও আমি স্বাধীনতা দেব।' নেতাজীর এ আহ্বানে মানুষ রক্ত দিয়েছিলেন; কিন্তু নেতাজী তার স্বপ্নের স্বদেশ স্বাধীন ভারত গড়ে তুলতে পারেননি। তাকে মাঝপথে থামিয়ে দেয়া হয়। তাকে এ দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। ভারত স্বাধীন হলেও নেতাজীর মৃত্যুরহস্য খুঁজে বের করার দায়ভার কোনো সরকারই নেয়নি। এতেই প্রমাণিত হয়, নেতাজীর মৃত্যুর নেপথ্যে তৎকালীন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ জড়িত ছিলেন।

নেতাজীর অন্তর্ধানের পর দীর্ঘসময় চলে যায়। বাঙালির উপর চলে চরম শাসন-শোষণ। টুঙ্গীপাড়ার শেখ মুজিব গর্জে ওঠেন। আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি বাঙালির চোখে আপসহীন নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বাঙালি আর শেখ মুজিব এক মোহনায় এসে মিলিত হন। বাঙালি জাতি তার সাহসী ভূমিকা আর আপসহীন নেতৃত্বের জন্য তাকে 'বঙ্গবন্ধু' আর 'জাতির পিতা' উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি হয়ে দাঁড়ান বাঙালি জাতির ত্রাণকর্তা। বাঙালি আর কোনো নেতার ভাগ্যে জনতার এত ভালোবাসা জোটেনি। শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিকভাবেও শেখ মুজিব একজন মহান নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। জাতিসংঘের অধিবেশনে তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে বাঙালি জাতি আর বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তার সুযোগ্য নেতৃত্ব আর সুদৃঢ় বিদেশনীতির জন্য তিনি সারা বিশ্বে সুপরিচিতি

লাভ করেন। শেখ মুজিবের উত্থান মানেই বাঙালি জাতির উত্থান। সাম্রাজ্যবাদী ও মৌলবাদী রাষ্ট্রগুলো ভীতির চোখে দেখতে থাকে। তৃতীয় বিশ্বে শেখ মুজিবের মতো নেতার উত্থান এবং তার আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা দেখে সাম্রাজ্যবাদী ও মৌলবাদী রাষ্ট্রগুলোর হৃদকম্পন শুরু হয়। আলেন্দে ও লুমুম্বার জাগরণকে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী ভালো চোখে দেখেনি। তাই তাদের হত্যা করে ভীতিমুক্ত হয়। একই কায়দায় শেখ মুজিবকে শেষ করে দেয়ার জন্য তারা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জল বুনতে থাকে। মুজিবের শাসনামলকে কলঙ্কিত করতে শুরু করে। কিউবায় চট রপ্তানির ঘটনাকে একটি অজুহাত হিসেবে খাড়া করে মার্কিন সামাজ্যবাদ ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে প্রেরণ করা চালের চালান ফিরিয়ে নেয়। ফলে বাংলাদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অনাহারে বহু লোকের মৃত্যু ঘটে। মার্কিনিদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে চাল না আসার কারণে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তাতে কোটি লোকের মৃত্যু হতো এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় সে দুর্ভিক্ষ কাটিয়ে উঠতে বেশি সময় লাগেনি। এই দেশী-বিদেশীচক্রের চক্রান্ত ছাড়াও বঙ্গবন্ধুর কাছাকাছি অবস্থানকারী অনেক বিশ্বাসঘাতক চক্রান্তকারীদের সাথে হাত মিলায়। মীর জাফর আর কুইখমলিং এর ভূমিকা পালন করে খন্দকার মোশতাক।

অবশেষে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোররাতে বাঙালি জাতির মহান নেতা বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারের হত্যা করা হয়। ভোরে বেতারে খবর শোনার পর বাংলার মানুষ শোকে দুঃখে পাথর হয়ে যায়। বাংলার মানুষ তাদের বাকশক্তি হারিয়ে ফেলে। শুধু কতিপয় রাজাকার আলবদর আর স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির মুখচেনা কতিপয় লোক আনন্দ উল্লাস করতে থাকে। বিশ্বাসঘাতক মোশতাক বঙ্গবন্ধুর লাশকে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সিঁড়িতে রেখে ক্ষমতার মসনদে বসে। ভীরু কাপুরুষ, অযোগ্য দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যগণ মুজিবকোট ফেলে দিয়ে বিশ্বাসঘাতক মোশতাকের মন্ত্রিসভা ও সংসদে গিয়ে যোগ দেন। এই বিশ্বাসঘাতকদের হাসিমাখা ছবি টিভির পর্দায় দেখে সাধারণ মানুষের মন ঘৃণায় ভরে যায়। এসব ঘৃণিত নেতার আচরণ ও বোল পাল্টানো কথাবার্তা শুনে মানুষ লজ্জায় মুখ ঢাকে। একমাত্র বাঘা কাদের সিদ্দিকী ছাড়া কেউ টুঁ-শব্দ পর্যন্ত করেননি। এই ঘটনা প্রচার হবার পর দেশে-বিদেশে

আমাদের সম্মান ধুলোয় লুণ্ঠিত হয়। বীর বাঙালির পরিবর্তে আমরা ভীরু বাঙালি নামে পরিচিত হলাম। আমরা খুনিদের কাছে আত্মসমর্পণ করে আমাদের ভীরুতার প্রমাণ দিলাম। এমনকি এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচার যাতে না হয় সেজন্য খুনি মোশতাকের একটি অধ্যাদেশ সংবিধানে অন্ত র্ভুক্ত করে আমাদের পবিত্র সংবিধানকে করা হয় কলঙ্কিত ও অপবিত্র।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শুধু শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়নি, হত্যা করা হয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মহান ফসলগুলো। কেননা শেখ মুজিব ছিলেন আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক, খুনিরা আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের মহান আদর্শগুলোকে বিসর্জন দিতে থাকে, যা জীবিত শেখ মুজিবের আমলে সম্ভব ছিল না। যে দুর্বৃত্তরা আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল, তারাই শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে তাদের শক্ত ঘাঁটি গড়ে তোলে। বিদেশী চক্রান্তে আমাদের বাঙালিত্ব কলমের এক খোঁচায় মুছে ফেলা হয়। বাংলাদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়। ১৯৭১ সালের ঘাতক জামায়াত গোষ্ঠী সংসদে ২০টি আসন লাভ করে। আমরা স্বাভাবিকভাবে তা মেনে নিচ্ছি। শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ড আমরা নীরবে সহ্য করেছি, বর্তমানে জামায়াতের উত্থানও নীরবে সয়ে যাচ্ছি। শেখ মুজিব হত্যাকারীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্য সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল বিল উত্থাপন করা হয়েছে। এই বিল বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে। দেশবাসীর প্রত্যাশা, সংসদে এই বিল পাস হবে। এই বিল পাস হলে মোশতাক কাঠগড়ায় দাঁড়াবে। সাথে সাথে সংসদে আরেকটি বিল উত্থাপন করা জরুরি। যে বিলের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ঘাতক গোলাম আজম, আব্বাস আলী, নিজামী ও তাদের সহযোগীদের আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়া করানো যায়। কেননা খুনিদের বিচার হওয়া স্বাভাবিক। চল্লিশ বছর পর যদি হিটলারের নাজি বাহিনীর সদস্যদের বিচার হতে পারে, তাহলে বিশ বছর পর ১৯৭১ সালের ঘাতক গোষ্ঠীর বিচার হবে না কেন?

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আমাদের দেশের মানুষের জন্য, স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির জন্য এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। এই কলঙ্ক থেকে মুক্তি পাবার সময় এসেছে দীর্ঘদিন পর। খুনি দানবদের বিচার হবে এ বাংলার মাটিতে। যে বাংলার মাটিতে জাতীয় মহান নেতা শেখ মুজিবের

রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। শেখ মুজিব কোনো একক দলের সম্পত্তি নন। শেখ মুজিব জনতার, জনতা শেখ মুজিবের। জনতা ও শেখ মুজিবের মধ্যে এক অভিন্ন সেতুবন্ধন। এ বন্ধন কোনোদিন ছিন্ন হবার নয়। যত দিন বাংলাদেশ থাকবে, যতদিন বাঙালি জাতি থাকবে ততদিন শেখ মুজিব অমর-অবিনশ্বর হয়ে থাকবেন। শেখ মুজিবের জন্য আলাদা কোনো স্মৃতিসৌধের প্রয়োজন নেই। কেননা সমগ্র বাংলাদেশটাই তো একটি স্মৃতিসৌধ। আর সে স্মৃতিসৌধ শেখ মুজিবের। শেখ মুজিব চির অম্লান, চির ভাস্বর। জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু। জয় জনতার জয়।

১৫.০৮.১৯৯১

‘আমার পিতাকে আমি পিতা বলবই তার জন্য কি অস্বস্তি কোন বজ্জাতের’?

বাংলাদেশের বিরোধীদলবিহীন জাতীয় সংসদে শুধু ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলীয় এবং সরকারের প্রতি অনুগত সংসদ সদস্যদের উপস্থিতিতে গত ১৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের জন্য একটি বিল পাস করা হয়েছে। সংসদে গৃহীত বিলের সংক্ষিপ্ত বিধান হচ্ছে এখন থেকে সরকারি, আধা সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি টানাতে হবে। এমনকি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে যে কোনো প্রকার অবমাননাকর বক্তব্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এই বিধানসমূহ সংসদে গৃহীত হওয়ায় আইনে পরিণত হয়েছে। তাই এসব বিধান লঙ্ঘন করলে জেলদণ্ডসহ অর্থদণ্ড ভোগ করতে হবে। শ্রদ্ধা ও ভালবাসার জন্য আইনি বিধান! তাও আবার বাংলার মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ফসল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য। বড় বিচিত্র এই দেশ এবং তার চেয়ে বিচিত্র বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেখে শুনে আশ্চর্য হই বঙ্গবন্ধুর আদর্শের দাবিদার বর্তমান সরকারের চিন্তা চেতনার ক্ষমাহীন দীনতার স্বরূপ অবলোকন করে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রক্তের উত্তরাধিকার দাবি করেন এবং এ দাবি যে মর্মান্তিকভাবে সত্য তিনি তার কর্মের মাধ্যমে বরাবর প্রমাণ করেছেন। তাই বলতে হয় তিনি তাঁর পিতা শেখ মুজিবকেই শুধু জানেন, বাংলার জনগণের নেতা একটি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তিনি মেটেই জানেন না এবং জানার চেষ্টাও করেন না। ফরিদপুর জেলার টুঙ্গিপাড়ার একটি দামাল ছেলে জনগণের আন্দোলন সংগ্রাম আর আপসহীন লড়াইয়ের মাধ্যমে ধাপে

ধাপে কিভাবে বাংলার মুকুটহীন সম্রাট তথা জাতির জনকে পরিণত হলেন সে ইতিহাস বাংলার মানুষের অজানা নয়। কিন্তু শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সে আন্দোলন-সংগ্রাম ও আপসহীনতার প্রতিফলন নেই। স্বৈরশাসক এরশাদবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রধান অঙ্গীকার ছিল বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল, ছাত্র সমাজের ১০ দফা দাবির বাস্তবায়ন, ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের পুনঃপ্রতিষ্ঠাসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন। কিন্তু শেখ হাসিনা ক্ষমতায় গিয়ে জনগণকে দেয়া কোনো অঙ্গীকারই পূরণ করেননি। ক্ষমতা লাভের জন্য যেমন ঘাতক জামায়াতের সাথে আঁতাত করেছেন, তেমনি পতিত স্বৈরশাসক এরশাদের সমর্থন গ্রহণে পিছপা হননি। মাথায় পট্টি, হাতে তসবিহ এবং বারবার হজ পালনের কালচারের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করেছেন এবং করে যাচ্ছেন। অথচ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনে আপসকামিতার কোনো নজির নেই। সেজন্য বারবার কারাবরণ করেছেন। মৃত্যুর দরজা থেকে বারবার ফিরে এসেছেন। 'জেলের তালা ভাঙাব শেখ মুজিবকে আনব' জনতার এই রক্তশপথ স্লোগানের কাছে শাসকচক্রকে বারবার নতি স্বীকার করতে হয়েছে। জনতার মুজিব জনতার কাতারে ফিরে এসেছেন। তাই বাংলার জমিনে শেখ মুজিবের বিকল্প শেখ মুজিবই ছিলেন। অন্য কোনো নেতার নাম জনমনে এত গভীর স্থান করে নিতে পারেনি। তখনও জনতা এবং শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দেশের একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থান ছিল। সে ক্ষুদ্র অংশটি শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অনেক অপপ্রচার করেছে। কিন্তু তাদের অপপ্রচার জনগণের কাছে কোনোদিনই গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেনি। মুজিব হয়ে ওঠেন বাংলার মানুষের আলোকিত সূর্য, যে সূর্য অস্ত যায় না কখনো। সূর্যের আলো হয় না অন্ধকার। যারা অতীতে চোখ বুজে ছিল এখনো তাদের চোখ বোজাই রয়েছে। কেননা আলোকিত সূর্য তাদের কাছে ভীতিজনক।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যতদিন ক্ষমতার বাইরে ছিলেন ততদিন তিনি ছিলেন জনতার নেতা। জনতাই ছিলেন শেখ মুজিবের শক্ত খুঁটি। স্বাধীন বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করার পরই স্তাবকের দল জনতার মুজিবকে জনতার কাছে থেকে দূরে সরিয়ে

নিয়ে যায়। এই স্তাবকের দল তাদের আখের গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনতা ও মুজিবের মধ্যখানে দেয়াল তৈরি করে বিচ্ছিন্ন করে দেয় ভালোবাসার সম্পর্ক। দেশের মানুষের কথা, দেশের প্রকৃত অবস্থা আড়াল করে সুবিধাবাদী নেতারা তাদের লাভের কথা বলতেন। ফলে শেখ মুজিব সাড়ে তিন বছরের ক্ষমতায় থাকাকালীন জনতার নেতা জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এককথায় বিচ্ছিন্ন রাখা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোররাতে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর জনতা ও শেখ মুজিবের মধ্যখানে যারা দেয়াল সৃষ্টি করে রেখেছিলেন তাদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ির সিঁড়ির উপর বঙ্গবন্ধুর রক্ত শুকানোর আগেই স্তাবকের দল গায়ের মুজিবকোট খুলে ফেলে ঘাতক মোশতাকের সাথে হাত মিলিয়ে ক্ষমতায় আরোহণ করে। বাংলার মানুষ যখন এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ শুনে আর্ত আহাজারি করছেন এবং প্রতিরোধের আহ্বান শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, তখন বেতার-টিভিতে ঘাতক মোশতাকের নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নামের তালিকা দেখে দেশের সাধারণ মানুষের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। দেশের মানুষ অবাক বিস্ময়ে দেখলেন 'এক নেতা এক দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' বলে যেসব নেতা মুখে ফেনা তুলতেন, তাদের হাসিমুখে মোশতাকের মন্ত্রিসভায় শপথ গ্রহণ করার দৃশ্য। দেশের সাধারণ মানুষ এ দৃশ্য দেখে নেতৃত্বের প্রতি তখন ধিক্কার আর ঘৃণা বর্ষণ করলেন। নেতৃত্বের প্রতি সেদিন থেকে জনগণের যে আস্থাহীনতা আর অবিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছিল তার ধারাবাহিকতা এখনো অব্যাহত।

জাতীয় সংসদে ১৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের যে বিলটি গৃহীত হয়, সে বিলটি যিনি সংসদে উত্থাপন করেন তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মুজিবকোট ফেলে দিয়ে জনকের রক্তের দাগ ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ির সিঁড়িতে শুকানোর আগেই মোশতাকের মন্ত্রিসভায় শপথগ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভা থেকে নৈতিকতাবিরোধী কাজের অপরাধে যে নেতা মন্ত্রিসভা থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন তার সাথে একজোট হয়ে ব্রাকেটবন্দি আওয়ামী লীগ গঠন করে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সমালোচনায় মুখর হয়ে মাঠ গরম করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। যদিও তার সে প্রচেষ্টা জনগণের গ্রহণযোগ্যতা

লাভ করেনি। ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক ঘটনার পর তিনি যখন মন্ত্রিসভার সদস্য, তখন বঙ্গবন্ধুর অনুসারীদের জন্য তার দরজা ছিল বন্ধ। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নানা বিরূপ মন্তব্য করা ছাড়াও অসম্মানজনক অনেক উক্তি করতেন। সেই তিনি বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসার আইনি বিধান সংসদে উত্থাপন করেছেন এবং সে বিধান সংসদে গৃহীত হয়েছে। যে মানুষ মহাহৃদয়ের উৎস, যিনি শ্রদ্ধা-ভালোবাসার প্রতীক, তাঁকে আইন করে ভালোবাসা প্রদর্শনের বিধান শুধু লজ্জাজনক নয়, অপমানজনক বলা যায়। ভালোবাসার জন্য আইন—এ কি লজ্জা নয়? আর যে ব্যক্তি এই আইন সংসদে উত্থাপন করেছেন তিনি নিজেই বঙ্গবন্ধুর প্রতি যে শ্রদ্ধাশীল নন সে প্রমাণ জনগণের অজানা নয়। তাই বলতে হয়, ২৬ বছর পরের প্রভাতে রাতের ইস্তেহার বিলির কারণ কী? এ প্রশ্নের জবাব তাকে যেমন একদন দিতে হবে, তেমনি বর্তমান সরকারকেও এজন্য একদিন জনতার আদালতে দাঁড়াতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেবতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন রক্তেমাংসে গড়া একজন মানুষ। এক সময় যারা তাঁকে দেবতার কাতারে নিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন, তারাই তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে ক্ষমতা জবরদখল করেন। এই বিশ্বাসঘাতক চক্রের কারণেই বঙ্গবন্ধুর বিরোধীপক্ষ সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পায় এবং বঙ্গবন্ধুর অবমূল্যায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। বঙ্গবন্ধুঅন্তঃপ্রাণ ছিলেন তাদেরই একজন বঙ্গবন্ধুর গায়ের চামড়া দিয়ে জুতো বানানোর খায়েশ প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করেছিলেন এবং সেই ছাত্রনেতাই স্বৈরশাসক এরশাদের গৃহপালিত বিরোধীদলীয় নেতার ভূমিকা দক্ষতার সাথে পালন করে বর্তমানে বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকার শেখ হাসিনা সরকারের অনুগত মন্ত্রী।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর কমরেড সিরাজ শিকদারের হত্যার ঘটনা দিয়ে দৈনিক ইত্তেফাক আট পৃষ্ঠার ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। পুরো ক্রোড়পত্র ছিল মিথ্যাচারে ভরপুর। বঙ্গবন্ধুকে অপমান করাই ছিল এই ক্রোড়পত্র প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য। এই ক্রোড়পত্র সাজিয়েছিলেন সিরাজ শিকদারের বোন ভাস্কর শামীম শিকদার আর তখন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক ছিলেন বর্তমান সরকারের যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার ছড়ানোর পরও তারা পুরস্কৃত হয়েছেন

শেখ হাসিনার সরকারের কাছ থেকে। শামীম শিকদার বঙ্গবন্ধুকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার পর একটি ভাস্কর্য তৈরি করে একুশে পদক ছিনিয়ে নেয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। শেখ শহিদুল ইসলাম, কোরবান আলী, ভোলা মিয়া কত নাম বলা যায়। যারা বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকতে তাঁকে দেবতার কাতারে নিয়ে যাবার প্রতিযোগিতা করেছেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর তাদের বিপরীত স্রোতে অবস্থান করতে দেখা যায়। তারা তখন বঙ্গবন্ধুকে অমানুষ হিসেবে তুলে ধরতে কোনো কার্পণ্য করেননি। বামধারার নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করতেন এবং এখনো করেন। কিন্তু শেখ মুজিব হত্যায় তাদের কোনো সমর্থন ছিল না। কিন্তু তারপরও তাদের অযথা দোষারোপ করা হয়। অথচ যাদের হাত বঙ্গবন্ধুর রক্তে রঞ্জিত, তাদের ব্যাপারে কতিপয় কলমপেশী নিশ্চুপ থাকেন। তাদের স্বরূপ তুলে ধরার ব্যাপারে আলো অন্ধকারে এই বুদ্ধিজীবীদের অবস্থান সত্যই রহস্যঘেরা। একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা দেখানো চিন্তা-চেতনা আর রুচির ব্যাপার। শ্রদ্ধা-ভালোবাসা কখনো জোর করে আদায় করা যায় না। সম্মান দেখানোর মধ্যেও রুচিবোধ জড়িত। কবির ভাষায় বলতে হয় 'উচ্চমান নাহি যার বংশের ভেতর, কেমনে বুঝিবে সে মানীর আদর।' যারা জনগণের সাথে ছিল না, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর যারা সুযোগে নেতা হয়েছে, তাদের কাছে বঙ্গবন্ধুর মূল্যায়ন চাওয়া মানে আমড়া গাছে আপেলের প্রত্যাশা করা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিলেন না, যেমন ছিলেন না কার্ল মার্কস, লেনিন, মাও সেতুং, স্টালিন, সুকর্ন, মহাত্মা গান্ধী এবং এ সময়ের সবচেয়ে আলোচিত-সমালোচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জ্যোতি বসু, সাদ্দাম হোসেন প্রমুখ। বঙ্গবন্ধু তার সমালোচনাকারীদের প্রতি কোনো সময়ই বিরূপ ছিলেন না। তাই তিনি সগর্বে ঘোষণা করেন 'আমি মানুষ, ফেরেস্তা নই, ভুল ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক।' বঙ্গবন্ধুর এই সত্য উচ্চারণের পর তাঁকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, সে আইন তার প্রতি অনাস্থার প্রমাণ বহন করে। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সে তো বাংলাদেশের মানচিত্রের অপর নাম। যারা বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা করে না, বঙ্গবন্ধুর প্রতি যাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই তারা তো ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ প্রতিকৃতি টানাবে না। আইন মান্য করার নামে যেনতেন

প্রকারে অযত্ন অবহেলায় অস্থানে অপরিবেশে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি রাখবে। তাই এ রাখা কখনো সম্মানের হতে পারে না। 'আমি মম বাতি জ্বলি সারা রাতি কবু না দুঃখ করি'। বঙ্গবন্ধু একটি দেশ, একটি পতাকা এবং একটি জাতীয় পরিচয়, বিশ্বের দরবারে বাঙালি জাতিকে দিয়ে গেছেন একটি স্বাধীন আবাসভূমি। তাই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রত্যেক বাঙালির নৈতিক কর্তব্য ও দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে আমরা আমাদের আত্মপরিচয়ের সংকটে নিমজ্জিত হব। এতে আমাদের দুঃখ বাড়বে। বঙ্গবন্ধুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে আমাদের গৌরব বাড়বে আর অসম্মান প্রদর্শনের অর্থ হবে জনকের রক্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।

আইন করে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক অটুট রাখা যায় না, যদি না পিতা ও পুত্রের মধ্যে রক্তের ঋণের প্রশ্ন জড়িত থাকে। আর সে ঋণ হচ্ছে পিতার আদর্শের প্রতি অটল থেকে তার অসমাপ্ত সকল কাজের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে ধাপে ধাপে সেগুলো বাস্তবায়ন করা। কিন্তু জনকের রাজনৈতিক জীবনের রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কোনো কাজই সমাপ্ত করার কোনো উদ্যোগ না নিয়ে আইন করে তাঁকে অমর করে রাখার প্রচেষ্টা প্রকৃত সন্তানের কাজ হতে পারে না। বরং এ প্রচেষ্টার ফলে জনককে অযথা বিতর্কে জড়ানো হবে। ইতোমধ্যে সে আলামত শুরু হয়ে গেছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কবি বেলাল মোহাম্মদের ভাষায় বলতে চাই : 'আমার পিতাকে আমি পিতা বলবই, তার জন্য কি অস্বস্তি কোন বজ্জাতের? বলি না তো পিতাকে আমার অবশ্যই, চূড়ান্ত পবিত্র আত্মা, যুগ যুগান্তের—মানুষ মানুষ মাত্র, কে তার অধিক? কেউ নয় আজাজিল নির্ভল প্রতীক।'

২৭.০২.২০০১

জাতির জনকই স্বাধীনতার ঘোষক

ইতিহাস বিকৃতি নতুন নয়। যুগ-বিবর্তনে এবং ক্ষমতার হাত বদলের কারণে প্রকৃত ইতিহাস মুছে ফেলার ঘটনা অহরহ ঘটছে। ইতিহাসের শিক্ষা বড় শিক্ষা। কিন্তু মর্মান্তিক সত্য হলো, আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেই না। আমরা সঠিক-সত্য ইতিহাস গোপন করে নিজেদের মনগড়া ইতিহাস রচনা করতে চাই। আর এ জন্য 'শাহনামা' রচয়িতা ফেরদৌসীর অভাব নেই আমাদের দেশে। সামান্য ভেট দিলেই তার নতজানু হয়ে কর্তার পদচুম্বন করে কাগজ কলম নিয়ে বসে যান। নিজে যা নন তা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ও ইতিহাসের ধারাবাহিকতার বিকৃতি ঘটাতে গিয়ে নিজেরাই ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়ে যান। আইয়ুবের 'প্রভু নয় বন্ধু' ইতিহাস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। আইয়ুব শাহীর পতনের পর এই গ্রন্থ মুদির দোকানের ডাল-লবণ বাঁধার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। খন্দকার ইলিয়াসের 'মুজিববাদ'ও ইতিহাসে স্থান লাভ করেনি। বিকৃত ইতিহাসের জন্য শেখ মুজিবের পতনের পর তা জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। মুজিব অনুসারীগণ পর্যন্ত এই দর্শনের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন না। তাই আজ কারো মুখে মুজিববাদের কথা শোনা যায় না। 'মুজিববাদ'-এর লেখক বর্তমানে কলম ছেড়ে গার্মেন্টস ব্যবসায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন।

মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান কোনোদিন নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে দাবি করেননি। ১৯৭৪ সালে 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত 'একটি জাতির জন্ম' শীর্ষক নিবন্ধে জিয়া একজন সৈনিকের দৃষ্টিতে ধর্মীয় মৌলবাদের বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যৌক্তিকতা প্রমাণ করেন। তিনি যে শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছেন সে কথাও বলেছেন। তিনি স্বেচ্ছায় এই ঘোষণা পাঠ করার জন্য কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে ছুটে আসেননি। পটিয়া থেকে অনুরোধ করে তাকে নিয়ে আসেন

কবি বেলাল মোহাম্মদ। এ সম্পর্কে যারা বিস্তারিত জানতে চান তাদেরকে কবি বেলাল মোহাম্মদ রচিত 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' বইটি পাঠ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। অবশ্য যারা সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পান, মিথ্যার বেসাতি যাদের নিত্যসঙ্গী, তাদের প্রতি অনুরোধ, বইটি পড়বেন না। সাংঘাতিক নিরাশ হবেন।

ইতিহাস বিকৃতি কোনো জাতির জন্যই মঙ্গলজনক নয়। বরং ইতিহাস বিকৃতির ফলে জাতীয় জীবনে নেমে আসে চরম দুর্যোগ। কথায় বলে, একটি সত্যকে শত মিথ্যা দিয়ে ঢাকা যায় না। সত্য আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক এবং অনন্য নেতা। নয় মাস যুদ্ধ চলেছে শেখ মুজিবের নামে। আন্তর্জাতিক সমর্থন পাওয়া গেছে শেখ মুজিবের মতো বড় মাপের নেতার জন্য। অন্যরা ছিলেন সহায়কশক্তি মাত্র। রুশ বিপ্লব বা চীনের বিপ্লব একা লেনিন-মাও সেতুং করেননি। তাদের সাথে অনেক সাহসী ও ত্যাগী সৈনিক ছিলেন। ভিয়েতনামের হো-চি-মিন কিংবা কিউবার চে গুয়েভারা এককভাবে সাম্রাজ্যবাদী স্বৈরশাসকদের বিতাড়িত করে জনতার মুক্তি আনেননি। দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তারা জাতির আস্থাভাজন নেতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাই আজও ঐসব দেশে তারা জাতির কর্ণধার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সময়ের বিবর্তনে তাদের বিরুদ্ধে অল্প সমালোচনা হলেও জাতির কাণ্ডারি হিসেবে তাদের অবদান কেউ অস্বীকার করছেন না।

কিন্তু আমরা বড় আত্মবিস্মৃত জাতি। আমাদের স্মৃতিশক্তি বড় দুর্বল। আমাদের স্মৃতিকে যদি এখনও ১৯৭১ সালের নয় মাসের রণাঙ্গনে নিয়ে যাই তা হলে স্মৃতির আয়নায় কেবল শেখ মুজিবের ছবি ভাসবে। অন্য কারো নয়। এ কথা মীমাংসিত সত্য যে, শেখ মুজিব স্বাধীনতার প্রতীক, মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক, বাঙালি জাতির ঐক্যের প্রতীক। ২৭ মার্চ কোনো মেজর এসে বেতারে একটি ঘোষণা পাঠ করলেন আর বাঙালি জাতি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল এমন চিন্তা বোকামির নামান্তর। জিয়া ২৬ মার্চ পর্যন্ত পাক হানাদার বাহিনীর চাকরি করেছেন। চট্টগ্রাম বন্দরে 'সোয়াত' নামক জাহাজ থেকে যখন বাঙালি নিধনের জন্য অস্ত্র খালাস করা হয়, তখন বেসামরিক জনতা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। বন্দর শ্রমিকরা অস্ত্র খালাস করতে

অস্বীকার করে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু মেজর জিয়া তখন চট্টগ্রাম সেনানিবাসে অবস্থান করলেও টুঁ-শব্দ করেননি বা সেনানিবাস থেকে বের হয়ে এসে জনতার প্রতিরোধযুদ্ধে শরিক হননি। তিনি তখন আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে দুলছিলেন। চাকরির মায়া ত্যাগ করতে পারেননি। আর্মি ইন্টেলিজেন্স-এ চাকরি করেও তিনি সবকিছু গোপন রেখেছেন। অথচ তিনি যদি সেসময় পাক-বাহিনীর গোপন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতেন, তাহলে বাঙালিরা এত বেশি পাক বর্বর-বাহিনীর নিধনযজ্ঞের শিকার হতেন না। এ কথা সত্য, কোনো দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে সে দেশের সেনাবাহিনী বা আমলা যুদ্ধের শুরুতেই স্বপক্ষ ত্যাগ করে স্বাধীনতার লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন না। অন্যদিকে স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হয় সাধারণত বেসামরিক নেতৃত্বের অধীনে এবং প্রতিরোধযুদ্ধের সৈনিক থাকেন বেসামরিক জনতা। সামরিক-বেসামরিক আমলারা তখন নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে পরিস্থিতি পর্যলোচনা করেন। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নির্ভরশীলতা খুঁজে না পান ততক্ষণ পর্যন্ত তারা স্বপক্ষ ত্যাগ করেন না। এ নির্ভরশীলতা হলো তাদের চাকরির নির্ভরশীলতা। অনেক বিপ্লবী বীর পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। অথচ তৎকালীন মেজর জিয়া ২৬ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করেননি। ২৬ মার্চ তিনি আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে এবং জীবনের নিরাপত্তার জন্য সেনানিবাস ত্যাগ করেন। সেনানিবাস ত্যাগ করলেও তিনি পটিয়া অবস্থান করেন। স্বাধীনতাযুদ্ধের সংগঠকদের সাথে কোনো প্রকার যোগাযোগের প্রয়োজন মনে করেননি। এখানে যদি বলি, অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তিনি পটিয়া অবস্থান নিয়েছিলেন তা হলে কি ভুল হবে? তাই বলে মুক্তিযুদ্ধে মেজর জিয়ার অবদানকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। তাকে পটিয়া থেকে খুঁজে এনে মেজর পদবির জন্যই সামরিক বেসামরিক প্রয়োজনে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি পাঠ করতে দেয়া হয়।

তাকে পটিয়া থেকে আনার পরামর্শ এবং পটিয়ায় অবস্থানের খবর দেন মেজর রফিকুল ইসলাম। কালুরঘাট বেতারকেন্দ্রে যখন জিয়াউর রহমান আসেন, সে সময় বেতার ভবনে বর্তমান বিএনপি নেতা অলি আহমদ উপস্থিত ছিলেন। কবি বেলাল মোহাম্মদ ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'আমরা সবই মাইনর আপনি মেজর, ঘোষণাটি আপনি পাঠ করলে গুরুত্ব

বেশি পাবে।' এভাবেই জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেন। এই ঘোষণা পাঠ করার জন্য তিনি স্বাধীনতার ঘোষক বা স্থপতি হয়ে যান না। এ কথা যারা বলেন, তারা ইতিহাস বিকৃতি এবং সত্যের অপলাপ করেন। মেজর জিয়া বাঙালি জাতীয়তাবাদ, জয়বাংলা স্লোগান মেনে এবং মুখে উচ্চারণ করে নয় মাস যুদ্ধ করেছেন। সে সময় জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে তিনি কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। স্বাধীনতাযুদ্ধে নয় জন সেক্টর কমান্ডারের যে অবদান, মেজর জিয়া একটি সেক্টরের একটি কমান্ডার হিসেবে সে অবদান রেখেছেন। তাই তিনি এবং অন্যরা আমাদের কাছে জাতীয় বীর—অন্য কিছু নন। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে জিয়াকে উপযুক্ত সম্মান ও পদবি দেয়া হয়। তাকে ডেপুটি চিফ অব স্টাফের পদটি দেয়া হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশী-বিদেশী চক্রান্তে ও মুখোশধারী মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে শহীদ হন। এই চক্রান্তকারীদের সাথে জিয়া যে জড়িত ছিলেন তা আজ আর কারো বুঝতে বাকি নেই। বিদেশী সাংবাদিকদের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থে তা প্রকাশ করা হয়েছে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর স্বাধীনতার চিন্তা-চেতনাবিরোধী শক্তির হাতে ক্ষমতা চলে যায়। শুরু হয় ইতিহাস বিকৃতি ও স্বাধীনতার মহান অঙ্গীকারসমূহের পরিবর্তনের পালা। বাংলাদেশ বেতার হয়ে যায় 'রেডিও বাংলাদেশ, 'জয় বাংলা' স্লোগান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। মুজিব অনুসারীদের উপর চালানো হয় নির্মম অত্যাচার। আপস করেননি বলে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হয়। উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের মধ্যে শুরু হয় ক্ষমতা দখলের তীব্র প্রতিযোগিতা। মেজর জিয়া 'গাছেরটাও খাব নিচেরটাও কুড়াব' এই নীতি অবলম্বন করে ঘাপটি মেরে বসে থেকে গোপনে কলকাঠি নাড়তে থাকেন। এই নীরবতা পালনের মাধ্যমে তিনি সাফল্য লাভ করেন। ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় উত্তরপাড়ার আকাশ বাতাস বারুদের গন্ধে দূষিত হয়। এই আত্মঘাতী প্রতিযোগিতায় সেনাবাহিনীর অনেক সেনা অফিসার পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন। মেজর জিয়ার পথ কণ্টকমুক্ত হয়। গোয়েন্দা বিভাগের চতুর জিয়া শত্রুবিনাশের এই মহড়ায় সফলতা লাভ করেন। তিনি সুযোগ ও সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। কর্নেল তাহের সরল বিশ্বাসে সে সুযোগ তার

হাতে এনে দেন। জিয়া ফ্রন্ট লাইনে এসেই তার আসল স্বরূপ প্রকাশ করেন। হয়ে যান ৭ নভেম্বরের মহানায়ক। সুকৌশলে তিনি ক্ষমতা দখল করেন। ক্ষমতার অধিকারী হয়েই তিনি তার প্রাণরক্ষাকারী কর্নেল তাহেরকে গ্রেফতার এবং পরবর্তীতে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে তার প্রাণরক্ষার পুরস্কার প্রদান করেন! বঙ্গবন্ধুর ঘাতকগোষ্ঠীকে উচ্চপদ ও চাকরি দিয়ে বিদেশে প্রেরণ করেন। কিন্তু জেলহত্যার জন্য একটি তদন্ত কমিটি পর্যন্ত গঠন করেননি। জিয়ার শাসনামলে সর্বাধিক সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ও সৈনিক শহীদ হন। কালো চশমার আড়ালে থেকে যাকেই তিনি মনে করতেন তার ক্ষমতার জন্য নিরাপদ নয়, তাকেই তিনি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতেন। অন্যদিকে স্বাধীনতাবিরোধী ১৯৭১ সালের নরঘাতক রাজাকার-আলবদর গোষ্ঠীকে গর্ত থেকে বের করে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব প্রদান করে তিনি মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতাযুদ্ধের চরম অবমাননা করেন। মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা-চেতনা তার শাসনামলেই সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছিত হয়। তিনিই আমাদের পবিত্র সংবিধানকে চরম সাম্প্রদায়িকতার নাগপাশে বন্দি করেন। কেবল ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য মুক্তিযোদ্ধা জিয়া মুক্তিযুদ্ধের সকল সফলতা, চিন্তা-চেতনা অস্বীকার করে বাংলাদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করেন।

জিয়া জেনে শুনেই এসব করেছিলেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভারত পছন্দ করেনি। ভারতের সাথে সীমান্ত ও পানির সমস্যা নিয়ে শেখ মুজিব অনেক দেন-দরবার করেন। ভারতের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি লাহোরে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার বৈঠকে যোগ দেন। এসব কারণে ভারত একটা পরিবর্তন চাইছিল। শক্তিশালী বাংলাদেশ নয়, দুর্বল বাংলাদেশই ভারতের কাম্য ছিল। জিয়া ভারতের সে আশা পূর্ণ করেছিলেন। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা, ভারতের সাথে বেশি দরকষাকষি না করা ইত্যাদি কারণে জিয়ার প্রতি ভারতের পূর্ণ সমর্থন ছিল। শেখ মুজিব ছিলেন বড় মাপের নেতা। তাই শেখ মুজিব ভারতের ভীতির কারণ ছিলেন। জিয়া যত বেশি ভারতবিদ্বেষী প্রচারণা করতেন, তার চেয়ে বেশি ভারতের তাঁবেদারি করতেন। জিয়া ছিলেন সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের ক্রীড়নক মাত্র।

একজন মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতির কাছে জাতি এসব আশা করেনি। কিন্তু জাতির দায়ভার যাদের নেই—ক্ষমতাই যাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাদের

কাছে দেশ-জাতির মূল্য নেই। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস, জিয়াকেও প্রাণ দিতে হলো নির্মমভাবে। জিয়া যখন নিহত হন তখন বিএনপি ক্ষমতায়। রাষ্ট্রযন্ত্র তাদের হাতে। জিয়ার কফিনকে টিভিতে প্রদর্শন করে সরকার মানুষের আবেগকে পুরোপুরি কাজে লাগায়। আবেগতাড়িত মানুষের সে আবেগকে পুঁজি করে, বিএনপি ক্ষমতার অবস্থানকে সুদৃঢ় করে। যার প্রমাণ বৃদ্ধ সাত্তারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজয়। অনেকে জেনে শুনেই প্রশ্ন তোলেন, জিয়ার জানাজায় দেশের লাখো লোক জমায়েত হয়েছিলেন। সারা দেশের লোক জিয়ার জন্য কেঁদেছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মৃত্যুতে কেউ কাঁদেনি। তাই শেখ মুজিব গণবিচ্ছিন্ন নেতা ছিলেন। এই প্রশ্ন যারা তোলেন তারা হয় রাতকানা নয়তো জন্মান্ধ। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবকে যখন হত্যা করা হয় তখনকার অবস্থা কী ছিল? কারা ক্ষমতায় ছিল? শেখ মুজিবের নাম পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করা তখন সম্ভব ছিল না। হত্যাকারীরা শেখ মুজিবকে ঢাকায় দাফন করতে পর্যন্ত দেয়নি। দেশে সান্ধ্য আইন জারি ছিল। এসব যে তারা জানেন না, তা নয়। শেখ মুজিবের যদি স্বাভাবিক মৃত্যু হতো এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকত তাহলে শুধু বাংলাদেশের মানুষ নয়, বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ছুটে আসতেন বাংলার শ্যামল মাটিতে বাঙালি জাতির মহান নেতা শেখ মুজিবের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। সামরিক আইনে চোখের জল ফেলতে মানা ছিল, তবুও মানুষ কেঁদেছে মহান নেতা শেখ মুজিবের জন্য। অবশ্য অন্ধজনদের তা দেখার কথা নয়। বিএনপি ক্ষমতায় ছিল বলেই কুর্মিটোলা বিমানবন্দর হয়েছে জিয়া বিমানবন্দর। জিয়ার মাজারের জন্য বিরাট জমি বরাদ্দ ও সৌধ তৈরি হয়েছে।

২৭ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পূর্বে বিএনপি একটি পোস্টার প্রকাশ করে বিতর্কের ঝড় তোলে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা গ্রহণের পর এবং বিএনপি মন্ত্রিপরিষদ গঠনের পূর্বপর্যন্ত বেতার ও টিভি স্বাধীনভাবে জনতার মতামত প্রকাশ করেছে। বর্তমানে বেতার-টিভি আবার দলীয় প্রচারযন্ত্রে পরিণত হয়েছে। ৭ মার্চের ভাষণ প্রচার করার অনুমতি দেয়া হয়নি। কিন্তু ক্ষমতার জোরে জিয়ার মৃত্যুদিবসে নানা অনুষ্ঠান পালনের নির্দেশ দেয়া হয়। সিলেট বেতার কেন্দ্রে একজন সাংবাদিক এক জরুরি কাজে গিয়েছিলেন। তাকে ধরে তাৎক্ষণিকভাবে জিয়ার উপর একটি কথিকা প্রচার করা হয়। টিভির

আলোচনা নিয়ে উঠেছে বিতর্কের ঝড়। এই ঝড়কে কেন্দ্র করে দেশে একদফা তুফান বয়ে গেছে।

কোনো মানুষই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। আবার মিথ্যে ভাষণ দিয়ে কোনো ব্যক্তিকে মহাপুরষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা সুখকর নয়। বরং অসত্য ভাষণ দিয়ে সে ব্যক্তিকে খাটো করা হয়। জিয়ার বেলায়ও ইতিহাস বিকৃতির এক সর্বনাশী খেলা চালানো হচ্ছে। এই অসত্য খেলা হয়তো তারা ক্ষমতার দাপটে চালিয়ে যাবেন। প্রচারযন্ত্রকে ব্যবহার করে অসত্যকে সত্যে পরিণত করার জোর প্রচেষ্টা চালাবেন। কিন্তু সফল হবেন না। মিথ্যা ইতিহাস প্রতিষ্ঠিত হয় না। জনগণকে কিছুদিনের জন্য বোকা বানানো যায়, কিন্তু সর্বসময়ের জন্য বোকা বানানো যায় না। আইয়ুব, ইয়াহিয়া, ফ্রাঙ্কো, মার্কোস ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু জিন্নাহ, গান্ধী, ভুট্টো দোষগুণ নিয়েও ইতিহাসে বেঁচে আছেন, থাকবেন। বাংলাদেশের স্থপতি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে থাকবেন অনন্তকাল ধরে। যতদিন বাংলাদেশ নামক দেশ থাকবে, বাঙালি জাতি থাকবে, শেখ মুজিব থাকবেন লিবার্টি অব স্ট্যাচু হিসেবে বাঙালিদের হৃদয়ে।

শাসক শেখ মুজিবের সমালোচনা হতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশের স্থপতি ও স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে শেখ মুজিব একক ব্যক্তিত্ব। এখানে অন্য কারো অংশীদারিত্ব ইতিহাস বিকৃতির নামান্তর। জিয়া একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বাধীনতার ঘোষণার পাঠক হিসেবে অবশ্যই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র—জাতীয় বীর। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা-চেতনাবিরোধী তার শাসনামল কখনো বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। যারা যা প্রাপ্য সে প্রাপ্য তাকে দিতে হবে। যদি বেশি দিতে চান তবে ইতিহাসের কাঠগড়ায় আসামি হবেন। ক্ষমতাসীন বিএনপি নেতৃবৃন্দ মিথ্যার বেসাতি না করে সঠিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করবেন—এটাই জাতির প্রত্যাশা।

১০.০৬.১৯৯১

বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাই ছিল একমাত্র মন্ত্র

একাত্তরের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সে ভাষণটি দীর্ঘ ছিল না। মাত্র ১৯ মিনিটের ভাষণে তিনি অনেক কথা বলেছেন। আর এজন্যই একাত্তরে বিখ্যাত মার্কিন সাপ্তাহিক নিউজউইক তাকে 'রাজনীতির কবি' বলে আখ্যায়িত করেছিল। কবি যদি হন বঙ্গবন্ধু, তবে কবিতার নাম বাংলাদেশ। তার এই ঘোষণাটাই ছিল পূর্ববাংলার স্বাধীনতার ইশতেহার। বঙ্গবন্ধু যে ৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন সে খবর বিশিষ্ট সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ সম্পাদিত একাত্তরের ১৩ মার্চ প্রকাশিত 'স্বরাজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'স্বাধীনতার ঘোষণা' এই শিরোনামে আট কলামে এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়। পাশে লাখো জনতার উত্তাল জনসভার ছবি, সেখানে উড়ছে সবুজ জমিনে লালবৃত্তের মধ্যে হলুদ মানচিত্র আঁকা বাংলাদেশের পতাকা। প্রথম বাক্যটি ছিল, 'নিপীড়িত, শোষিত ও বুলেটের আঘাতে রঞ্জিত বাংলাদেশের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা করা হয়েছে।' তারপর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, 'রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় মঞ্চের ওপর ও ময়দানের সর্বত্র কেবল একটি পতাকা গর্বের সঙ্গে মাথা তুলেছিল—সেটা স্বাধীনতার পতাকা। গাঢ় সবুজের ওপর রক্তবর্ণ সূর্য ও তার মাঝে বাংলাদেশের মানচিত্র। শেখ সাহেব তাঁর সেদিনকার ঐতিহাসিক বক্তৃতা উক্ত নতুন পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে করেছেন। আওয়ামী লীগ আহূত উক্ত সভায় আওয়ামী লীগের দলীয় পতাকাও ছিল না। মওলানা ভাসানীও ৯ মার্চ স্বাধীনতার পতাকা পিছনে রেখেই বক্তৃতা করেছিলেন পল্টন ময়দানে। বত্রিশ নম্বর রোড থেকে শেখ সাহেবের নির্দেশ মোতাবেক সরকারি বেসরকারি কর্মচারীগণ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। তাঁরই নির্দেশে আজ বাংলাদেশ চলছে। সর্বত্র স্বাধীনতার জয়ধ্বনি। আজ বাংলাদেশের হাটে ঘাটে মাঠে চারিদিকে কেবল স্বাধীনতার সংগ্রামের ডাক।'

তার ডাকেই জেগেছিল মুক্তিপাগল বাঙালি। ধমনী থেকে রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়ে মুছে দিয়েছিল জাতির ললাট থেকে পরাধীনতার কালিমা।

১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস। এদিন ঢাকায় জেনারেল ইয়াহিয়া খান, জুলফিকার আলী ভুট্টো আর জেনারেল টিক্কা খানদেরকে স্বচক্ষে যে হৃদয়বিদারক দৃশ্যটি দেখতে হয়েছিল তা হলো পাকিস্তানের পতাকার বদলে স্বাধীন বাংলার পতাকা। তাদের দৃষ্টিতে কোথাও পাকিস্তানি পতাকা চোখে পড়েনি। সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, সেক্রেটারিয়েট যেদিকে দৃষ্টি গেছে, দিকে দিকে সগর্বে পতপত করে উড়ছে স্বাধীন বাংলার পতাকা। আর সেই সাথে প্রতিবাদ ও শোকের প্রতীক কালো পতাকা। এসব দেখে নিশ্চয়ই তাদের বুঝতে বাকি ছিল না যে, পূর্ব পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান নামের ভূখণ্ডে অভ্যুদয় ঘটেছে বাংলাদেশ নামের এক নতুন দেশের। পাকিস্তান সরকার ২৩ মার্চ সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছিল। সরকারি কর্মসূচির মধ্যে ছিল সরকারি বেসরকারি ভবনে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, সেদিন কোথাও সরকারের ঘোষিত কর্মসূচি পালিত হয়নি। অর্থাৎ তখন পূর্ববাংলায় পাকিস্তানের সরকারের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ইয়াহিয়া খান কিংবা ভুট্টো কেউই নিশ্চয়ই বোকা ছিলেন না। আর বুদ্ধিমানের জন্য ইশারাই যথেষ্ট। তারা সেদিন তাই যা বুঝার বুঝে নিয়েছিলেন। বুঝেছিলেন, ঘণ্টা বেজে গেছে। এবার কেবল সময়ের অপেক্ষা। একাত্তরের মার্চ মাসের অগ্নিঝরা দিনগুলোতে পাকিস্তানের গোলামির জিঞ্জির থেকে মুক্তিলাভের জন্য বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আন্দোলন প্রতিদিন বেগবান হতে থাকে। ২৩ মার্চের পূর্ব থেকেই ঢাকায় ছিলেন ইয়াহিয়া, ভুট্টোসহ পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তা ও শীর্ষ রাজনীতিকরা। তখন ইয়াহিয়ার সাথে বঙ্গবন্ধুর বৈঠক চলছিল। একাত্তরের ২১ মার্চের দৈনিক পাকিস্তানের প্রথম পৃষ্ঠায়, '২৩ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাংলাদেশে ছুটি' শিরোনামে খবর প্রকাশিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৩ মার্চ লাহোর প্রস্তাব দিবস উপলক্ষে সারা দেশে ছুটি ঘোষণা করেছেন। অপর একটি খবরে বলা হয়, স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এ দিনটিকে 'প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালন ও বাংলাদেশের প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি বাসভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন

করার আহ্বান জানিয়েছে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) দিনটিকে 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা দিবস হিসেবে পালন করার জন্য ঢাকা শহরের বিভিন্নস্থানে পথসভা করে।' ২২ মার্চ বাংলা সংবাদপত্রগুলো 'বাংলাদেশ' শিরোনামে চার পৃষ্ঠার একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। এতে শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাক্ষরিত একটি বাণীও প্রকাশিত হয়। বাণীতে বলা হয়েছিল, 'বাংলাদেশের সাত কোটি মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য আমাদের আজকের এই সংগ্রাম। অধিকার বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। বুলেট বন্দুক বেয়নেট দিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে আর স্তব্ধ করা যাবে না। কেননা জনতা আজ ঐক্যবদ্ধ...।' এখানে উল্লেখ্য যে, একাত্তরের ২ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান শব্দের পরিবর্তে সংবাদপত্রে বাংলাদেশ ছাপা হতো। সাধারণ বিজ্ঞাপনগুলোতেও বাংলাদেশ ব্যবহার করা হতো। একটি ব্যাংকের বিজ্ঞাপনে 'একটি চেতনা... একটি প্রত্যয়' শিরোনামে উল্লেখ করা হয়, 'বাংলাদেশ আজ এক নতুন চেতনায় উদ্বেলিত। এ চেতনা নিজেকে নতুন করে জানার। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চেতনা।'

এসবই স্পষ্ট করে দেয় বাংলাদেশ আসছে। প্রসব বেদনায় কাতর হয়েছে বিশ্ব মানচিত্র। সময়ের অনিবার্য সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের অভ্যুদয়। এটি প্রশ্নাতীত সত্য। এই সত্য তখন যেমন অস্বীকার করা যায়নি, আজো তেমনি সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের সেই ভাষণ স্বাধীনতা ঘোষণার একমাত্র সত্য। এরপর আর নতুন কোনো ঘোষণার প্রয়োজন ছিল না। তখন কেবল সময়ের অপেক্ষা মুখ্য হয়ে ওঠে। যদি স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়ে পাকিস্তানিদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকত, তবে ২৫ মার্চ রাতে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী এমন বর্বরতা প্রদর্শন করত না। কোনো শাসকই তার দেশে এমন নগ্ন আক্রমণ করে না। পাকিস্তানিরা বুঝতে পেরেছিল, পূর্ববাংলা আর তাদের নেই। আর তাই এতটা বর্বর আক্রমণ করতে তাদের বুকে বাঁধেনি। একাত্তর সালে লাখো মুক্তিকামী মানুষ নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে প্রমাণ করেছিল বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাই একক এবং একমাত্র মন্ত্র ছিল সেই দুর্বার সংগ্রামে। আজ এতদিন পর সেটি নিয়ে যারা বির্তক করে, তাদের মানসিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক হবে না।

২২ মার্চ ২০০৬

জনক তুমি বাংলাদেশ

আব্রাহাম লিংকনের নামের সাথে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম মিশে আছে, তেমনি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন বলতে লেনিন, ভিয়েতনাম বলতে হো চি মিন, উত্তর কোরিয়া বলেতে কিম ইল সুং, চিলি বলতে আলেন্দে, প্যাট্রিস লুমুম্বা বলতে কঙ্গো, মাও সেতুং বলতে চীন, ভারত বলতে মহাত্মা গান্ধী, ফিদেল ক্যাস্ট্রো ও চে গুয়েভারা বলতে কিউবা এবং বাংলাদেশ বলতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম এক এবং অভিন্ন হয়ে গেছে। এই মহান নেতৃবৃন্দের জীবনদর্শন ছিল, জীবন জীবনের জন্য নয়, জীবন দেশ ও মানুষের জন্য। তাই দেশ ও মানুষের জন্য তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। আর এ কারণেই তাদের নাম দেশের নামের সাথে একাকার হয়ে যে সেতুবন্ধন রচনা করেছে তা কোনোদিন মুছে যাবার নয়। যেতে পারে না। তাদের নাম মুছে ফেলার চেষ্টা যে করা হয়নি তা নয়। কিন্তু প্রতিটি চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। যারাই জাতির বীরদের নাম মুছে ফেলে নিজেদের নাম ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন, তারাই একদিন ইতিহাসের পাতা থেকে নির্বাসিত হয়েছেন। মানুষের হৃদয়ের স্মৃতির মিনারে যাদের নাম চিরভাস্বর হয়ে আছে তাদের নাম মুছে ফেলা কি সম্ভব? না, সম্ভব নয়। ইতিহাসই তার প্রমাণ বহন করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি নাম, একটি ইতিহাস। এককথায় শতাব্দীর মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। হঠাৎ করে অবৈধভাবে ক্ষমতা জবরদখল করে টাকা আনা পাই এর মাধ্যমে তিনি নেতৃত্বের আসনে বসেননি। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় জনগণের সুখ-দুঃখের সাথে একাকার হয়ে জনতার দাবি আদায়ের সংগ্রামে অগ্রসেনানীর ভূমিকা পালন করে জনগণের নেতা থেকে বঙ্গবন্ধু তথা জাতির জনকের মর্যাদা লাভ করেছেন। মানুষের কথা বলতে গিয়ে জীবনের দীর্ঘসময় অতিবাহিত হয়েছে লৌহ কপাটের অন্ত রালে। লোভ, লালসা, ভোগ, বিলাস, ক্ষমতার অংশীদারিত্ব সবকিছুকে তুচ্ছ

জ্ঞান করে বাঙালি জাতির ভাগ্য উন্নয়নের জন্য আপসহীনভাবে লড়াই করে গেছেন। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সগর্বে ঘোষণা করেছেন, 'দাবায়ে রাখতে পারবা না'। বঙ্গবন্ধুর সে সাহসী উচ্চারণ বৃথা যায়নি। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ধাপে ধাপে বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এগিয়ে গেছে চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে। ১৯৭০ সালের নির্বাচন আর ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধ। এই সময়কালে বঙ্গবন্ধু ছিলেন লড়াই সংগ্রাম তথা স্বাধিকারের প্রধান প্রেরণার উৎস। বঙ্গবন্ধু আর জয় বাংলা এই দুটি শব্দ হয়ে ওঠে সাহসের হাতিয়ার । এ সময় নেতা ছিলেন অনেক, কিন্তু তারা ছিলেন জনসমর্থহীন। বাংলার মানুষ তখন আর কারো কথা শুনতে রাজি নয়। জনতার জোয়ার তখন শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বের দিকে। অন্য কোনোদিকে চোখ ফেরাবার সময় তখন জনতার নেই। আর এই গণজাগরণের মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন, 'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে তৈরি হও। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। জয় বাংলা।' বঙ্গবন্ধুর সে ঘোষণা বাঙালি জাতির মধ্যে বাঁধভাঙা জোয়ারের সৃষ্টি করে। কোটি-কোটি কণ্ঠ থেকে ঐকতানে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে জয় বাংলা, বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর। এ সময় যারা পাক সরকারের অধীনে চাকরি করছিলেন তারা নীরবে দৃশ্যপট যাচাই করে দেখছিলেন। তাদের মনে তখন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল 'যদি হারিয়ে যাই' তখন কি হবে। দেশে জনতার লড়াই চলছে, পাক বর্বর-বাহিনীর হাতে মানুষ প্রাণ দিচ্ছেন। কিন্তু সুযোগ আলীর দল নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে 'দেখি কি হয়' অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন। ২৬ মার্চ পর্যন্ত যে জিয়া জনতার এই আপসহীন আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন না, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে একটি ঘোষণা পাঠ করার সুযোগ পাওয়ায় তাকে হিরো বানানোর অবান্তর চেষ্টা এখনও অব্যাহত আছে। যারা এই ঘৃণ্য অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা একটি মর্মান্তিক সত্য স্বীকার করতে রাজি নন যে, জোর করে ক্ষমতা জবরদখল করা যায় কিন্তু জনগণের মন জয় করা যায় না। মনগড়া ইতিহাস একদিন নির্বাসনে যায়। কেননা ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না।

দীর্ঘ নয় মাস মরণপণ লড়াই করে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে এলো স্বাধীনতা। স্বাধীনতাযুদ্ধের সেই চরম সময়ে বঙ্গবন্ধু ছিলেন পাকিস্তানের

কারাগারে বন্দি। তাঁর অনুপস্থিতিতে স্বাধীনতাযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে তাঁর নামে। সে সময় বঙ্গবন্ধুর নাম বাদ দিয়ে কারো নাম সেখানে যুক্ত করা সম্ভব ছিল না। কেননা রণাঙ্গন থেকে সর্বক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা আর লড়াইয়ের হাতিয়ার। সেখানে অন্য কারো অংশীদারিত্ব ছিল না। বিশ্বজনতার চাপ আর বাঙালি জাতির সাহসী প্রত্যাশার কাছে ভুট্টো, ইয়াহিয়া, নিজামী চক্রকে হার মানতে হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজয়ীর অহংকার নিয়ে স্বদেশে আপন জনতার মাঝে ফিরে আসেন। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে বাংলা আর বাঙালির ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। স্বজন হারানের ব্যথা ভুলে গিয়ে মানুষ আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠেন। শেখ মুজিবের নামে বাংলা ও বাংলার মানুষ আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে তোলে। আজও সেদিনের স্মৃতি মনে হলে সাহস বেড়ে যায়। ঘাতক নির্মূলের এরূপ একটি দিনের জন্য এখনো প্রহর গুনছি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির জনক, স্বাধীনতার মহান সিপাহসালার এবং বাঙালি জাতির পরিচয়। এ সত্য যারা স্বীকার করেন না তারা স্বাধীনতার পক্ষের লোক বলে দাবি করতে পারেন না। সত্যই শক্তি। সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকা যায় না। আর সত্যকে যারা স্বীকার করতে রাজি নয়, তারা নেতৃত্ব পাওয়ার যোগ্য হতে পারে না। যে কারণে বাংলাদেশে দীর্ঘদিন থেকে নেতৃত্বের শূন্যতা বিরাজ করছে। ১৯৭১ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট—এই স্বল্পসময়ের জন্য বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের কর্ণধার ছিলেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ তখন আন্তর্জাতিক চক্রান্ত, পরাজিত শক্তির ষড়যন্ত্রসহ হাজারো সমস্যাভারে জর্জরিত। একান্ত বাধ্য হয়ে বঙ্গবন্ধুকে কিছুকিছু ব্যাপারে আপস করতে হয়। অন্য কেউ হলে আরো বেশি আপস করতেন। কিন্তু সে সময়ের সাফল্যকে উল্লেখ না করে কেবল ব্যর্থতার তালিকা আরো বৃদ্ধি করে বঙ্গবন্ধুর শাসনামলের সমালোচনা করা হয়। বঙ্গবন্ধু ভারতের সাথে দেনদরবার করে ফারাক্কা দিয়ে ৪৫ হাজার কিউসেক পানি এনেছিলেন, জল্লাদ জিয়া এনেছিলেন ১৯ হাজার কিউসেক। তারপর এরশাদ আর বেগম জিয়ার শাসনামলে কোনো চুক্তিই ছিল না। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দীর্ঘমেয়াদি পানিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। বর্তমানে যারা বঙ্গবন্ধুর সমালোচনায় পঞ্চমুখ, তারাই বঙ্গবন্ধুর মহান হৃদয়ের ক্ষমা পেয়েছিলেন।

তাদের বেঁচে থাকার কথা ছিল না। কিন্তু বড় মাপের নেতা বঙ্গবন্ধু ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। 'বাঙালির ভালোবাসার কাঙাল' বঙ্গবন্ধু ছিলেন প্রকৃতই 'ভালোবাসার সোল এজেন্ট।' আর সেজন্যই চিহ্নিত শত্রুদের প্রতিও কঠোর হতে পারেননি। সেটাই হয়েছে কাল। যাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন সেই তারাই পরবর্তীতে তাঁর প্রাণসংহারক হিসেবে ঘাতকের ভূমিকা পালন করেছে এবং এখনো সে ভূমিকা তারা পালন করে চলেছে। বঙ্গবন্ধু যদি অন্যান্য দেশের মতো 'খতম' নীতি গ্রহণ করতেন তা হলে আনোয়ার জাহিদ, গোলাম আযম, নিজামী, সাঈদীরা অসৎ ও ঘাতক হয়েও 'সৎ লোকের শাসন' দাবি করতে পারতেন না। স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী হয়েও বর্তমানে তদের মুখে স্বাধীনতা রক্ষার কথা উচ্চারিত হচ্ছে।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে বঙ্গবন্ধু যখন দেশে স্থিতিশীল অবস্থা ফিরিয়ে এনে সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে একদল বর্বর ঘাতক হত্যা করে। বারবার মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসা শেখ মুজিব বাংলার একদল মীরজাফরের হাতে শহীদ হলেন। বিশ্বাসঘাতক মোশতাক বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কলকাতায় বসে ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের দৃঢ়তার কাছে পরাজয় বরণ করে ঘাপটি মেরে মুজিবদরদী সেজেছিল। সেই বিশ্বাসঘাতক বেঈমান মোশতাকের চক্রান্তে শেখ মুজিব সপরিবারে শহীদ হলেন। পুরনো শকুনের কালো থাবায় ক্ষতবিক্ষত হলো বাংলাদেশ তথা বাংলার পতাকা। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড নিছক একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ছিল না, কিংবা ক্ষমতা দখলেরও ব্যাপার ছিল না। বঙ্গবন্ধু ছিলেন স্বাধীনতার প্রতীক, বাঙালি জাতির জাগরণের মহান ব্যক্তিত্ব। এই হত্যাকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত এবং তাদের নেপথ্যে যারা ছিল তাদের একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল একাত্তরের লক্ষপ্রাণের বিনিময়ে আমরা যে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, যে বিজয় অর্জন করেছিলাম তার বিনাশ সাধন করা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে সে প্রক্রিয়া শুরু হয়, যার ধারাবাহিকতা এখনো অব্যাহত আছে। বঙ্গবন্ধুকে জীবিত রেখে স্বাধীনতার মূল্যবোধ এবং সুফলগুলোকে এভাবে নির্বাসনে প্রেরণ সম্ভব ছিল না। বর্তমানে যেসব ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও জাতির জনকের বিরুদ্ধে

অবিরাম মিথ্যাচার প্রচার করে যাচ্ছে, তাদের অতীত ভূমিকা যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল না তা কারো অজানা নয়। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের পাশবিকভাবে হত্যা করার পর থেকে এই দীর্ঘসময়ে অনেকেই বলেছেন তিনি স্বাধীনতা চাননি, তিনি বাংলাদেশ চাননি, তিনি ভাষা আন্দোলনের সাথে আদৌ জড়িত ছিলেন না, তিনি পতাকা ওড়াননি, তিনি পাকিস্তানি আর্মির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন ইত্যাদি। এসব মিথ্যা অপপ্রচারের জবাব অনেক দেয়া হয়েছে। কিন্তু বেহায়া বেজন্মাদের মুখ বন্ধ হচ্ছে না। এসব মিথ্যাচারের জবাব তো একটিই। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান বেতার মারফত ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই ভাষণে একজনের নামই উচ্চারিত হয়েছিল। সেই নাম শেখ মুজিবের। কত লোক স্বাধীনতা ঘোষণার কৃতিত্ব নিতে তৎপর, কত লোক পতাকা ওড়ানোর মহিমায় বিগলিত, কত লোক ক্ষমতায় এসেছেন এবং পিছু হটেছেন। সেদিনের বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া তো তাদের নাম উচ্চারণ করেননি। ইয়াহিয়া দম্ভোক্তি করে বলেছিল, 'Mujib is traitor to the nation, this time he will not go unpunished.' তাই সেসব অপপ্রচারকারীর কাছে জানতে ইচ্ছে করে, যে মানুষটি স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন না, পতাকা ওড়ালেন না, তাঁর নাম ইয়াহিয়ার ভাষণে এলো কেন? অন্য কোনো নাম তো আসতে পারত। জিয়াউর রহমান নামের একজন মেজরের নামও তো আসতে পারত। কিন্তু আসেনি। আসার কথা নয়। কারণ বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া কোনো মেজর কর্নেলকে পাওয়া যায়নি।

মোশতাক থেকে খালেদা জিয়া দীর্ঘ একুশ বছর প্রতারণামূলক শাসন ব্যবস্থায় সামরিক শাসন আর অসৎ নেতৃত্বের কবলে বন্দি ছিল বাংলাদেশ। তারপর পাঁচ বছর ক্ষমতাসীন ছিল আওয়ামী লীগ। কিন্তু আবার একাত্তরের ঘাতক-দালালদের সাথে আঁতাত করে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় ফিরে এসেছেন। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শ ছিল অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বিনির্মাণ। সে অঙ্গীকার ঘোষণা করেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন। যে সংবিধানের ভিত্তি ছিল জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। জনকের প্রণীত সংবিধানই সবশেষ কথা। তারপর যা কিছু যুক্ত করা হয়েছে, সবকিছুই

আগাছা। তাই সংবিধানের সাথে যুক্ত আগাছা পরিষ্কারের সাথে সাথে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী অপশক্তিকে পরিষ্কার করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব হয়ে পড়েছে। জনকের বাংলাদেশ আবার জেগে উঠবেই। জনক জন্মেছিলেন বলেই জন্মেছে বাংলাদেশ। যদি বাংলাদেশে জনকের জন্ম না হতো, তাহলে যারা অতীতে বঙ্গভবন জবরদখল করেছিলেন এবং এখনো দখল শাসক সেজেছেন তারা বাংলাদেশে ঠিকানাবিহীন পরিচয়েই বসবাস করতেন। তাই তাদের উদ্দেশে বলব, সত্যই শক্তি। সত্যকে মেনে নেয়ার মধ্যে অগৌরব নেই বরং গৌরবই বেশি। মিথ্যার বেসাতি করে টিকে থাকা হয়তো যায়, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হওয়া যায় না। সূর্য সে তো আপন আলোতেই উজ্জ্বল, মেঘে ঢাকা আকাশে নক্ষত্র ক্ষণস্থায়ী মাত্র। জনকের বাংলায় আবারো সমস্বরে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হবে জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। একাত্তরে জনকের নির্দেশ আমরা অমান্য করিনি। বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট রাতে আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম বলে ডাকাতরূপী ঘাতকরা হত্যা করে জাতির জনককে। যার পরিণামে আমরা এতিম হয়েছি। পিতাকে হারিয়েছি। পিতার হন্তারকরা বর্তমানে বেহিসাবি তর্জন গর্জন করছে। একজন 'খতীব' মুক্তিযোদ্ধাদের গাদ্দার বলেছে। যদি আমরা একাত্তরে সত্যই গাদ্দার হতাম তাহলে খতীবের মুখে এই শব্দ উচ্চারিত হতে পারত না। দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা সেদিন গাদ্দার হতে পারিনি। তাই আজকের দিনে আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার, বজ্রশপথ, জনকের লাল রক্তের কসম, জনক হত্যার বদলা নেবই। জনকের বাংলাকে আমরা ঘাতকমুক্ত করে সোনার বাংলা গড়ব। প্রয়োজনে আমরা বারুদের গন্ধে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে কুকুর নিধন অভিযান পরিচালনা করব। জীবন ধীরে বহে মেঘনা নয়, জীবন উত্থাল তরঙ্গে ভরপুর পদ্মা। আমরা লড়ব জনকের বাংলার জন্য, জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের জন্য। আমরা লড়ব হন্তারকদের নির্মূল করার জন্য।

১৪ আগস্ট ২০০২

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ৮৩ দিনের দুঃসহ স্মৃতি

মোশতাকের তিরাশি দিনের অবৈধ ক্ষমতা দখলের শাসন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। ৮৩ দিনের ইতিহাস রক্তঝরানো অত্যাচার আর নির্যাতনের এবং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাওয়া সুফল ও মীমাংসিত সত্যগুলোকে নির্বাসনে প্রেরণের কালো অধ্যায়। সেই সময় যারা পুলিশের হাতে বন্দি হয়েছেন কেবল তারাই জানেন মোশতাক সরকারের নির্মম অত্যাচারের কাহিনী। যারা পাকিস্তানপন্থি কিংবা মুজিববিরোধী পুলিশ ছিলেন, তারা তো রীতিমতো হিংস্র হয়ে ওঠেন বন্দিদের উপর। বুটের লাথি কিংবা ইলেকট্রিক শক দিয়ে ব্যঙ্গ করে বলতেন 'শালা জয় বাংলা বল', 'তোর বাবা মুজিবের নাম বল' ইত্যাদি আরো কত নগ্ন উচ্চারণ করতেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে তাদের উল্লাসের শেষ ছিল না। সে উল্লাস প্রকাশ করতেন বন্দিদের উপর নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচারের মাধ্যমে। সে সময় পুলিশি নির্যাতনে অনেকেই পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। সে পঙ্গুত্বের চিহ্ন ধারণ করে আজো অনেকে বেঁচে আছেন। মোশতাকের সেই ৮৩ দিনের অত্যাচার আর নির্যাতনের সাথে হিটলারের নাৎসি বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতনের তুলনা করা যায়। হিটলারের গ্যাস-চেম্বারে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বন্দিরা অত্যাচার নির্যাতন থেকে রক্ষা পেয়েছেন। কিন্তু মোশতাকের ৮৩ দিনের শাসনামলে প্রতিটি থানা হাজত ছিল একেকটি গ্যাস-চেম্বার। তবে থানা হাজতের এসব গ্যাস-চেম্বারে মৃত্যুর হিমশীতলতা ছিল না। ছিল প্রতিদিন পালা করে বন্দিদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার আর নির্যাতনের স্টিমরোলার চালানোর ইতিহাস। একটানা ১৫-২০ দিন এমনকি এক মাসের অধিক সময় থানা হাজতে রেখে চালানো হয়েছে নির্যাতন। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস যেমন স্বাধীনতাবিরোধী দালালচক্রের দালালি আর হিংসা চরিতার্থ করার মোক্ষম স্থান ছিল থানা আর পাক বর্বর-বাহিনীর ক্যাম্প, তেমনি মোশতাকের ৮৩ দিনের

শাসনামলে প্রতিটি থানা ছিল নতুন-পুরাতন স্বাধীনতাবিরোধী দালালচক্রের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার একমাত্র নিরাপদ স্থান।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে খুনি মোশতাকচক্র ক্ষমতা দখল করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ড নিছক একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড নয়। সে হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে লাখো শহীদের আত্মবলিদানে পাওয়া স্বাধীনতার সুফলগুলোও একে একে হত্যা করা হয়। রাষ্ট্রীয় চরিত্রের আমূল পবির্তন সাধন করা হয়। খুনি মোশতাকচক্র ক্ষমতা জবরদখল করেই সারা দেশে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সে ত্রাস ছিল মুক্তিযুদ্ধের, মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে এবং প্রতিবাদী সাহসী মানুষের বিরুদ্ধে। অস্ত্র আইনের নামে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা এবং নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিসভার অধিকাংশ মন্ত্রীকে মোশতাক ক্ষমতার অংশীদারিত্ব দিয়ে তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যায়। মধ্য ও নিম্নসারির নেতা-কর্মীদের উপর পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়ে প্রতিবাদী হওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়। আজ যারা বঙ্গবন্ধু হত্যা ও জেলহত্যার প্রতিবাদ হয়নি বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করার প্রচেষ্টা চালান কিংবা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের প্রতি কটাক্ষ করেন, তারা জেনেশুনেই তা করেন। কেননা সেদিন যদি সত্যই সংগঠিত শক্তিতে প্রতিবাদ করা যেত তাহলে তাদের ক্ষমতার অংশীদারিত্ব পাওয়া দূরের কথা, নাম পরিচয়হীন হিসেবে বেঁচে থাকতে হতো। জিয়া ও এরশাদ ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বর জেলহত্যার প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী দুই সেনানায়ক। এই দুই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের সাথে জিয়া, এরশাদ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে যে তাদের ভূমিকা ছিল, সে সত্য আজ সর্বমহলে স্বীকৃত। আর এজন্য জিয়া ও এরশাদ বঙ্গবন্ধু হত্যা কিংবা জেলহত্যার ঘাতকচক্রের বিচার করা দূরের কথা, বরং বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে চাকরি দিয়ে, ব্যবসা করার সুযোগ দিয়ে খুনিচক্রকে তারা সম্মানিত করেছিলেন। অপরাধীকে আশ্রয় প্রশ্রয় দেয়া আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। আর এ কারণে জিয়া এরশাদসহ খুনি চক্রের সহযোগিতাকারীদের বিচার হওয়া জরুরি। ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে যারা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাওয়া সুফলগুলো বিনষ্ট করে আমাদের প্রত্যাশার বাংলাদেশকে একটি চরম সাম্প্রদায়িক

রাষ্ট্রে পরিণত করেছে, তাদের বিচার না করেলে বঙ্গবন্ধু হত্যা ও জেলহত্যার বিচার অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। আরেকটি ১৫ আগস্ট সৃষ্টি করার জন্য যারা হুমকি দেয়, তাদের বিষদাঁত চিরতরে নির্মূল করতে হবে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর খুনি মোশতাকচক্র ক্ষমতা গ্রহণ করে ৮৩ দিন রাষ্ট্রক্ষমতা জবর দখল করে রাখে। সে সময়ের অত্যাচার নির্যাতনের দগদগে ঘা থেকে এখনো হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। যে সব নেতৃত্বের অনুপ্রেরণায় রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ এবং যাদের নির্দেশে জীবনবাজি রেখে রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক কর্মসূচি পালন করেছি—সেই তাদের দেখলাম পলাশীর প্রান্তরে মীরজাফর যে ভূমিকা পালন করেছে সে ভূমিকা পালন করতে। ব্যতিক্রমী ছিলেন শুধু একজন। কমলগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক 'মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট সংগঠক ত্যাগী জননেতা এমএ গফুর। নেতা গফুর নামে যিনি বহুল পরিচিত। পাক বর্বর-বাহিনীর হাতে গফুর ভাইয়ের পিতা ও আপন ভাই শহীদ হয়েছেন। কিন্তু তিনি আপস করেননি কোনোদিন। তিনি আমাকে রাজনৈতিক অঙ্গনে এনেছিলেন এবং ১৫ আগস্টের পর তিনিই আমাকে সাহস নিয়ে বেঁচে থাকার প্রেরণা দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন তার সাথে একত্রে আত্মগোপনে থাকার সুযোগ হয়। অনেক আশ্রয়ে গিয়েছি। কোথাও আশ্রয় পেয়েছি, আবার অনেকের দরজা থেকেই বিতাড়িত হয়েছি। সে কাহিনী অনেক দীর্ঘ এবং কষ্টের। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস পাকহানাদারকবলিত বাংলাদেশে ঝুঁকি নিয়ে মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছেন, মুখের গ্রাস তুলে দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধাদের মুখে। কিন্তু ১৫ আগস্টের পর মানুষের সে ভালোবাসা আর পাওয়া যায়নি। আপন স্বজনরাই আশ্রয় দিতে অনীহা প্রকাশ করেন। এক পর্যায়ে গ্রামের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে সিলেট শহরে চলে যাই উচ্চপর্যায়ের নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য। আমাদের হৃদয়ে তখন প্রতিরোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলছিল। কিন্তু তৎকালীন সংসদ সদস্য এবং উচ্চপর্যায়ের নেতাদের সাথে অলোচনা করে আমরা চরমভাবে হতাশ হই। সাক্ষাৎ করি সিলেট জেলা বাকশালের সাধারণ সম্পাদকের সাথে। তারপর একেএকে মোহাম্মদ ইলিয়াস, গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী, হাবিবুর রহমান, ইসমত আহমদ চৌধুরী, দেওয়ান ফরিদ গাজীসহ আরো অনেকের সাথে। সবার একই কথা 'নিজেকে বাঁচান নিজ

কৌশলে।' দু-একজনকে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে দেখেছি। মোশতাক সরকারের প্রতিমন্ত্রী দেওয়ান ফরিদ গাজী তার গৃহে প্রবেশ করতে না দিয়ে বাইরে থেকে আমাদের তাড়িয়ে দেন। শুধু বলেছিলেন, তোমরা আমার বাসায় আসলে আমার বিপদ হবে। তাই কখনো আমার বাসায় এসো না। নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শুনে আমরা যখন দিক্‌ভ্রান্ত ও হতাশ, ঠিক সেসময় আমরা নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে সতর্কতা ভুলে যাই। আর ঠিক সেসময় কলমগঞ্জ থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চন্দ্রকুমার চাকমা সিলেটে কূটকৌশল প্রয়োগ করে বন্দর বাজারের একটি চা স্টল থেকে আমাকে এবং শাহী ঈদগাঁর মাহমুদ কলোনি থেকে এমএ গফুর এবং তাঁকে আশ্রয়দানকারীকে গ্রেফতার করান। আমার উপর কি নিদারুণ নির্যাতন চালানো হয়েছে তা বলতে চাই না। কেননা গফুর ভাইয়ের উপর যে পৈশাচিক নির্যাতন চালানো হয় তা নজিরবিহীন। এরূপ নির্যাতনের কাহিনী ইতিহাসে বিরল আর সভ্যসমাজে তো এমন নির্যাতনের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু মর্মান্তিক সত্য হচ্ছে, গফুর ভাই এমন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। যে নির্যাতনের চিহ্ন নিয়ে তিনি এখনো বেঁচে আছেন। গফুর ভাইয়ের উপর নির্যাতনের কাহিনী এখনো মানুষকে ভীত বিহ্বল করে তোলে। প্রতিহিংসাপরায়ণ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রেলস্টেশন থেকে গফুর ভাইয়ের গলায় জুতার মালা পরিয়ে বাজার প্রদক্ষিণ করান। গফুর ভাইয়ের বিরুদ্ধে দীর্ঘ বক্তব্য দেন ভারপ্রাপ্ত সেই কর্মকর্তা। সেই ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরবর্তীকালে মৌলভীবাজার জেলার এএসপি হয়ে আসেন। একদিন মাত্র সাক্ষৎ ঘটেছিল। কিন্তু কোনো কথা হয়নি। বিদ্রোহী হওয়ার ইচ্ছা ছিল। বহু কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলাম। পতন ঊষার ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ নেতা ওমর আলী, জমির উদ্দিন চৌধুরী, শ্রীমঙ্গলের ইসমাইল হোসেন, এমএ রহিম, শহিদুল আলম, আবু শহীদ আব্দুল্লাহসহ হাজার হাজার নেতাকর্মী নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হন।

বঙ্গবন্ধু হত্যার দীর্ঘ একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হয়। ১৯৯৬ সালের ২ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু হত্যার ব্যাপারে দায়ের করা এজাহারের ভিত্তিতে ১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর ঢাকার দায়রা জজ বিচার কাজ শেষ করে ১৫ আসামিকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। মোশতাক

খুনিচক্রকে রক্ষার জন্য আইনি বিধান তৈরি করে গিয়েছিল। কিন্তু সে কালো আইন বাতিল ঘোষণার পর খুনিদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। মোশতাক বেঁচে থাকলে নিশ্চয় সেসময়ে বিচারের সম্মুখীন হতে হতো। সেসময় তাই মনে প্রশ্ন জেগেছিল, মরণোত্তর পুরস্কার দেয়া যেতে পারলে মরণোত্তর বিচার করা যাবে না কেন? এই বিধান থাকা খুবই জরুরি ছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারপ্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতায় আহত হয়েছি। এজন্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছি সেসময়। বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ঘাতকদের বিচার করার জন্য দাবি জানিয়েছি। যারা সামরিক আদালত গঠন করে গোপন বিচারের প্রহসনের মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহের এবং সেনাবাহিনীর হাজার হাজার সদস্যকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেছে, নির্যাতন করে হত্যা করেছে কমরেড গোলাম মাজেদকে, তারাই আগস্ট ও নভেম্বরের খুনিদের রক্ষা করার পাঁয়তারা করতে থাকে। তাই হত্যাকাণ্ডের ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হলেও বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া শেষে খুনিদের চিহ্নিত করে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করার পর এই রায় অনুযায়ী ১২ খুনির মৃত্যুদণ্ডে হাইকোর্ট অনুমোদন দিলেও আইনি মারপ্যাঁচে তাদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ এখনও কার্যকর হয়নি। এই মামলার রায় কার্যকর করার ক্ষেত্রে বর্তমান জোট সরকার রহস্যজনক কালক্ষেপণ করে চলেছে। তাই ক্ষমতাসীন জোট সরকারের আমলে ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম এই হত্যাকাণ্ডের মামলার নিষ্পত্তি হওয়ার আদৌ কোনো সম্ভাবনা নেই। যারা বিচারব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করে রেখেছে তাদের উদ্দেশ্য একটি কথাই বলতে চাই, সত্যের মৃত্যু নেই। শত মিথ্যা দিয়ে সত্য চেপে রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন, সত্য একদিন আপন গৌরবে বের হয়ে আসবেই। মীর জাফর আলী খান বিশ্বাসঘাতক হিসেবে সারা বিশ্বে কুখ্যাত ধিক্কৃত নিন্দিত একটি নাম। মোশতাক এবং তার সহযোগীরা অবশ্যই ইতিহাসের পাতায় কুখ্যাতদের তালিকাভুক্ত হবে। আজ হোক কাল হোক তাদের বিচার হতেই হবে। ইতিহাসের রায় অস্বীকার করার উপায় কারো নেই।

১৯৭৫ সালে ছিলাম টগবগে যুবক। আজ পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রৌঢ়। কিন্তু কালো আগস্টের দুঃসময়ের স্মৃতি মনে পড়লে এখনো শরীর শিউরে ওঠে। তাই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ

হাসিনাসহ চৌদ্দ দলের নেতৃবৃন্দের কাছে আমার বিনীত আবেদন, খুনি মোশতাকের ৮৩ দিনের বর্বর শাসনের শ্বেতপত্র তৈরি করুন। আমরা কেন প্রতিবাদী হতে পারিনি সে সত্য অবশ্যই বের হয়ে আসবে। আমরা ভীরু ছিলাম না। ভীরু নেতৃত্বই আমাদের দ্রোহী হতে নিবৃত্ত করে রেখেছিল। সে সময় যারা গ্রেফতার হয়েছিলেন প্রতিটি থানা থেকে সে তালিকা সংগ্রহ করে তাদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করুন। যারা নিজেদের ক্ষমতার লোভ ও লালসা আড়াল করার জন্য বলে থাকেন প্রাণভয়ে মোশতাক মন্ত্রিসভায় যোগদান করেছিলেন, তাদের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য—ভীরু নেতৃত্ব জাতির জন্য কখনো মঙ্গলজনক হতে পারে না। তাই বঙ্গবন্ধুর রক্তাক্ত লাশ সিঁড়িতে ফেলে রেখে যারা বঙ্গভবনে গিয়ে মন্ত্রিত্বের শপথ নিয়েছিলেন, তারা অবশ্যই খুনিচক্রের সহযোগী এবং বিশ্বাসঘাতক। তাই তাদের বিচার করা অপরিহার্য। তাদের অপকর্মের জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হারিয়েছি, হারিয়েছি অগণন বীরমুক্তিযোদ্ধাকে। হারিয়েছি মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাওয়া রাষ্ট্রীয় কাঠামো। ছিন্নভিন্ন হয়েছে আমাদের পবিত্র সংবিধান। তাই আগস্টের আর নভেম্বরের খুনিদের ব্যাপারে নিষ্ঠুর কঠোরতা চাই, চাই সাহস, আরো সাহস।

১৬.০৮.২০০৫

জনক তোমার জন্মদিনে

আমি কান পেতে আছি। আমার কানে এখনো সেই অমর কবিতার সুর বাজে। যে কবিতা তুমি পাঠ করেছিলে লাখো লাখো মানুষের সেই ৭ মার্চের মহাসমুদ্রে। সেদিনই তুমি জনক, বাঙালিদের 'তুমি' বলে সম্বোধন করলে। আহা! যেন পিতার কোমল কঠিন আদেশ 'তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো'। তোমার কথামতো মৃত্যুকে তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম সত্যি। যেমন ডানপিটে ছেলে পিতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। তুমি ছিলে পিতা, দুরন্ত সাগর অথবা তুমি ছিলে অসীম আকাশ। তোমার বুক ধারণ করেছে বাংলাদেশের গোটা ৫৬ হাজার বর্গমাইল। বাঙালির আবেগ অনুভূতি তোমার মতো করে আর কেউ এমন সুনিপুণভাবে চিনে নিতে পারেনি। বাংলার সাত কোটি মানুষ যেন তোমার কাছে ছিল ক্লাস ওয়ানের পাঠ্যপুস্তকের মতো। খুব সহজেই যা আত্মস্থ করা যায়। এত সহজে সবাইকে চিনে নিলে পিতা, কিন্তু চিনতে পারলে না জল্লাদ ঘাতকদের, যারা তোমার খুব আশপাশেই ছিল। নাকি তুমি চিনতে পেরেছিলে পিতা, কিন্তু কিছুই বলোনি? হয়তো-বা তুমি তাদের শুধরে দেবার চেষ্টা করেছিলে। কিন্তু মীর জাফরের রক্ত যাদের শরীরে তারা কিভাবে নিজেকে শুধরায়। পিতা এই ১৭ মার্চ তোমার জন্মদিন। জানি তুমি বেহেশতের বাগানে বসে এখন পুষ্পের হাসি হাসছো। কিন্তু তোমার চোখের কোণে এইতো জল জমে আছে। তুমি কাঁদছো পিতা। তোমার কান্নায় কে জানে বেহেশতের বাতাস ভারী হলো কিন্তু বাংলার বাতাস এখন বড় দূষিত। এখানে তোমার কান্নার আওয়াজ তেমন করে ঠাহর করা যায় না। আমাদের কানে যেন কেউ ঢেলে দিয়েছে গরম সীসা। আমরা বধির হয়ে গেছি, আমরা বোবা হয়ে গেছি, আমাদের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। আমরা এখন জটিল অসুখে ভুগছি।

পিতা, তোমার প্রিয় বাংলাদেশ এখন অসুস্থ একটি জনপদ। এখানে এখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে মৌলবাদ। ধর্মের দোহাই দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে মানুষ। মানুষের রক্তে পৈশাচিক উল্লাসে মত্ত হায়েনারা। পিতা, তুমি অবাক হবে এরা মানে মৌলবাদীরা দেশের সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় দেশে নিয়ে এসেছে গাঢ় এক অন্ধকার। তোমার সেই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ আজ বড় বেশি অবহেলায় দূরে সরে গেছে।

পিতা, ১৯৭১ সালের সেই যুদ্ধাপরাধীরা এখন তাদের গাড়িতে জাতীয় পতাকা নিয়ে চষে বেড়ায় দেশ। পিতা, তুমি এই সংবাদে আমাদের অভিশাপ দিচ্ছ। জানি পিতা, তোমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটবে। তুমি আহত হবে। কিন্তু কি করব পিতা, আমরা যে আক্ষরিক অর্থেই অসহায়। তোমার সেই আওয়ামী লীগ এখন আপসকামী হয়েছে। ওরা মুখে বলে তোমার কথা। বলে তোমার স্বপ্নের কথা। কিন্তু কাজের বেলায় বড় বেশি রকমের নগদের লোভ। জানো পিতা, ওরা তোমার পতাকা বহন করার যোগ্যতা যেন দিনদিন হারিয়ে ফেলেছে। বস্তুবাদী মানসিকতার কারণে ওরা তোমার শিখিয়ে দেয়া পথ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। তুমি তো দেশ স্বাধীন করোনি কেবল একটা পতাকার জন্য।

তুমি চেয়েছিলে, ধর্ম বলতে মানুষ বুঝবে মানুষ শুধু। রাষ্ট্র আর ধর্ম হবে দুটি আলাদা বিষয়। সবাই যে যার ধর্ম পালন করবে পরম নির্ভাবনায়। ধর্মকে কখনো রাজনীতির সাথে যুক্ত করা হবে না। তুমি চেয়েছিলে একটি আদর্শ রাষ্ট্র। জনগণের সরকার। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাই রাষ্ট্রের নাগরিক। সবার সমান অধিকার। ধর্ম এখানে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে না। অথচ ধর্মের নামে এখন সারা বাংলাদেশে অধর্মের জয়জয়কার। অসুর এখানে সুর হতে চাইছে। জানি পিতা, এসব কথা তোমার বুকের যন্ত্রণা বাড়িয়ে দেবেই কেবল। তুমি জানতে চাইবে, এই দুঃসময়ে আওয়ামী লীগ কি করছে। পিতা, ওরা হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে। ওরা দেখেও দেখে না, ওরা শুনেও শুনে না। তুমি পিতা আমেরিকা কিংবা পাকিস্তানের রক্তচক্ষুকে অবলীলায় তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে পেরেছিলে। তুমি জানতে তোমার মাথার উপর মৃত্যু পরোয়ানা। তবুও বলেছিলে, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তুমি জীবনের জয়গান গেয়েছিলে। সেই

বিরাট সাহস আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এখন অনেক অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে আওয়ামী লীগ সংসদ থেকে দীর্ঘ ওয়াক আউট করে বটে, কিন্তু যখনই আমেরিকা বলে সংসদে ফিরে যাবার কথা, তখন সুরসুর করে আবার সংসদে ফিরে যায়। নিজের মেরুদণ্ড যেন বাঁকা হয়ে গেছে। এখন অন্যের কথায় নৃত্যের তালে তালে বয়কট আর বৈঠকের নাটক। বঙ্গবন্ধু, এখন তোমার বাংলাদেশ আক্ষরিক অর্থেই এক নাট্যশালা। সবাই অভিনয় করছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মুখ থেকে মিউ মিউ করে উচ্চারিত হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কথা। তারা এক সময় সমাজতন্ত্রের কথা বললেও এখন আর তাদের মুখে এ শব্দটি উচ্চারিত হয় না। ধর্মনিরপেক্ষতার কথা তেমনভাবে আর বলেন না আওয়ামী লীগের নেতানেত্রীরা। আর বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার সরব উচ্চারণ কারো কণ্ঠে শোনা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড আর বোস্টার আপনার কাছে আসার সাহস পেত না। আর এখন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ আর বচন শোনার জন্য আমাদের নেতানেত্রীরা দরজা খুলে অধীর আগ্রহে বসে থাকেন একটু কৃপালাভের প্রত্যাশায়। দেশ পরিচালনা থেকে শুরু করে দেশের অর্থনীতিসহ সব বিষয়েই নির্দেশ দেয়া হয়। নেতানেত্রীরা পোষা পাখির মতো সেসব নির্দেশ পালনে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু করেন। পিতা, সবচেয়ে বড় অভিনয় করে চলেছেন বর্তমান জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী আপনার মমতায় তিনি স্বামী, সংসার ফিরে পেয়েছিলেন। আপনার সে মমতার মূল্য তিনি কড়ায়গণ্ডায় পরিশোধ করে চলেছেন! আপনাকে সপরিবারে যারা হত্যা করেছিল সেসব ঘাতককে তিনি মুক্তি না দিলেও জেলখানায় জামাই আদরে রেখেছেন। আর হত্যা মামলার বিচারপ্রক্রিয়া রেখেছেন স্থগিত করে। আপনার নাম বাংলার জমিন থেকে মুছে ফেলার জন্য তিনি সর্বপ্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করেও ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ তিনি তো জানেন না সূর্য যেমন অস্ত যায় না কখনো, তেমনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামও বাংলার মাটি, বাংলার আকাশ, বাতাস সর্বত্রই বিরাজমান। তাই দু-চারটি ছবি ভেঙে খান খান করলে কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠান আর সেতুর নাম পরিবর্তন করলেই শেখ মুজিব মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়বে না। লোকমুখে শোনা যায়, যৌবনের সূচনায় তিনি একজন

সফল অভিনেত্রী হওয়ার খায়েসে বোম্বে পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কিন্তু তার সে ইচ্ছে অপূর্ণ থাকলেও তিনি 'সালশা'র চক্রান্তে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সে ইচ্ছে পূর্ণ করেছেন। বিশেষ করে বাংলা ভাই আর শায়খ রহমান গ্রেফতার অভিযানে যে অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তাতে প্রমাণিত হয়েছে তিনি কাঁচা খেলোয়াড় নন। এ দুজন ধরা পড়েছে, কিন্তু তাতে আহ্লাদে আটখানা হবার কোনো কারণ নেই। নতুন আরো কেউ তৈরি হবে। সে হয়তো আরো ভয়াবহ হবে। তাকে নিয়ে নোংরা খেলায় মগ্ন হবে জামায়াত নিয়ন্ত্রিত সরকারের অংশটি। আবার নিজামী বলবে, নতুন কোনো জঙ্গি তৈরি হয়নি। সে মিডিয়ার তৈরি। ঠিক এই কথাটি সে বাংলা ভাইয়ের বেলায়ও বলেছিল। আবার বাংলা ভাই গ্রেফতার হওয়া মাত্র সে তার বক্তব্য পাল্টে ফেলে। এমনই বিশ্ব বেহায়ার কবলে পড়েছে পিতা, তোমার প্রিয় স্বদেশ। জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে পুরাতন পুরাতন সেই শকুন।

পিতা, তোমার জন্মদিনে এই অক্ষমতার কথা বলার কোনো ইচ্ছা ছিল না। জন্মদিনে শোনাবার কথা ছিল, সৃষ্টির কথা, প্রাপ্তির কথা, সত্য ও সুন্দরের কথা। কিন্তু সেইসব গল্প আমাদের দাঁড়িয়ে কিভাবে বলি সৃষ্টির ইতিহাস। অথচ পিতা তুমি কিন্তু ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েও গেয়েছিলে সৃষ্টির গান। আর এ কারণেই তো তুমি অনন্য। তোমার তুলনা আমি কোথাও খুঁজি না। তোমার তুলনা কেবলই যে তুমি। পিতা তবুও দেশের মানুষ প্রাণপণে আজ আলোর প্রত্যাশায় আছে। আমরা জানি না আলোর ভোর কত দূরে। কিন্তু আলোর জন্য আমাদের তাবৎ কাঙালপনা।

পিতা, তুমি কি বলতে পারো আলোর জন্য আর কতকাল আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

লন্ডন, ১৫ মার্চ ২০০৬

আমাদের বঙ্গবন্ধু

রাষ্ট্রনেতার ক্ষেত্রে 'আমাদের নেতা' অভিধায় একক নেতার অস্তিত্ব বড় বিরল। কোনো কোনো জাতি অতি সৌভাগ্যক্রমে সেই ধরনের একজন নেতাকে পেয়ে যান। বিশ্বের ইতিহাসে এমন নেতার সংখ্যা হাতেগোনা। বাঙালির সৌভাগ্য সেই হাতেগোনা নেতাদেরই একজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যাঁকে অক্লেশে আমাদের বঙ্গবন্ধু বলা যায়।

বঙ্গবন্ধু কিভাবে আমাদের হয়ে উঠলেন? তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতা। আওয়ামী লীগ একটি রাজনৈতিক দল। আরো অনেক রাজনৈতিক দলের একটি। এবং আওয়ামী লীগে আরো অনেক নেতাও ছিলেন। মেধায়-প্রজ্ঞায় তাদের কাউকেই খাটো করে দেখার উপায় নেই। তবুও সবাইকে ছাপিয়ে কেন বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠলেন গোটা একটি জাতির একক নেতা; কী সেই গোপন রহস্য, কী সেই যাদু? হ্যাঁ, যাদুই বটে। একাত্তর কিংবা তার আগের সময়কাল যারা দেখেছেন তারা এক বাক্যে মানবেন, বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ছিল যাদুকরের মতো। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ যাদুকরও তাঁর যাদুর কাছে নস্যি হয়েছিলেন। রূপকথার সেই হ্যামেলিনের বংশীবাদক যেন বঙ্গবন্ধুতে এসে প্রাণ খুঁজে পায়। বঙ্গবন্ধু বাঁশি বাজালেন, সেই বাঁশির সুর শুনে, মাঠ থেকে কৃষক, নদী থেকে জেলে, কলেজ থেকে ছাত্র, ঘর থেকে পুত্র, অফিস থেকে চাকরিজীবী পথে নামলেন। সাত কোটি মানুষ শামিল হলো এক কাতারে। তারা ভুলে গেল প্রতিপক্ষ ভীষণ শক্তিধর। তারা ভুলে গেল, কেবল সাহস ছাড়া অন্য কোনো রসদ তাদের নেই। সাহস দিয়েই কি দাঁড়ানো যায় মেশিনগানের বিপরীতে? শুধু সাহসকে সঙ্গী করে এখন যদি কেউ মেশিনগানের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ান, আমরা তাকে অবশ্যই বোকা বলে ব্যঙ্গ করব। অথচ কী অনায়াসেই না একাত্তরের সেই পেক্ষাপট পাল্টে গিয়েছিল। ট্যাংক, মেশিনগানের বিপরীতে মানুষ কী অসীম সাহস নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং

সেটাকে মোটেও বোকামি বলে বোধ হলো না, মনে হলো সময়ের সেরা সিদ্ধান্ত হচ্ছে এটাই। মানুষের এমন সাহসে ভড়কে গেল মারণাস্ত্র। অস্ত্রের প্রতিপক্ষ সাহস এবং সাহসের কাছে অস্ত্রের পরাজয়। এমন আশ্চর্য ব্যাপার একাত্তরেই কেবল সম্ভবপর হয়েছিল, আর সেটিকে বাস্তব করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি না থাকলে আমাদের এমন ক্ষেপাটে সাহসী হওয়ার সুযোগ ছিল না।

বঙ্গবন্ধুর এমন আশ্চর্য ক্ষমতার নেপথ্যে কী ছিল? একটু আগে তাঁকে যাদুকরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে তিনি তারও অধিক কিছু ছিলেন। হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালা বললেই বঙ্গবন্ধুকে পরিচয় করিয়ে দেয়া যায় না, তিনি তার চাইতেও বড় মাপের। বঙ্গবন্ধুর 'আমাদের বঙ্গবন্ধু' হয়ে উঠার পেছনে ছিল তার অসাধারণ সম্মোহনী ক্ষমতা। তিনি গোটা জাতির নাড়ির স্পন্দন টের পেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দুর্দান্ত চিকিৎসক। জাতির নাড়ির যন্ত্রণা তাঁর মতো করে এত ভালোভাবে পৃথিবীর সেরা স্নায়ুবিদের পক্ষেও ঠাহর করা সম্ভব ছিল না। এই যে নাড়ির স্পন্দন বুঝতে পারা, এটাই বঙ্গবন্ধুকে আমাদের বঙ্গবন্ধুতে পরিণত করেছিল। একাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন সাত কোটি মানুষের একক কণ্ঠস্বর। তিনি যা বলেছিলেন, সেটি সাত কোটি মানুষের ভাষা হয়েছে। তাতে দ্বিমত করার মানুষ খুঁজে পাওয়া যায়নি (এই বাক্য শুনে অনেকেই স্বাধীনতাবিরোধীদের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাইবেন, তবে খেয়াল করলে দেখবেন এখানে কেবলই 'মানুষের' কথা বলা হচ্ছে)।

বঙ্গবন্ধু যখন এই বিশাল ক্ষমতার অধিকারী, তখন স্বয়ং মওলানা ভাসানীও বেঁচে ছিলেন। তবে কথা হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু সেই সময়ে একক নেতা হয়ে উঠেছিলেন। কেউ যদি একক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন তবে তিনি সর্বগ্রাসীও হয়ে ওঠেন। বিস্ময়কর রকমভাবে বঙ্গবন্ধু এই দোষে দুষ্ট হননি। তাঁর সময়েই কিন্তু তাজউদ্দীন, সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ জাতীয় নেতার ঠিকই আলো ছড়িয়েছেন। এমনকি তরুণ নেতৃত্বও যথারীতি বিকশিত হয়েছিল। চার খলিফা হিসেবে খ্যাত আবুল কুদ্দুস মাখন, আ স ম রব, নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাজাহান সিরাজ যার যার অবস্থান থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনায় ছিলেন সফলতম। তাদের এই সফলতার

পেছনে একটিই কারণ বিদ্যমান। তারা বলতেন, 'আমরা কথা বলছি, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে।' এই একটি কথাই স্বাধীনতার আন্দোলনে তাদেরও অমরতা দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু এই তরুণ নেতাদের বিকাশে বাধা দেননি। বঙ্গবন্ধু কারো বিকাশেই বাধা দেননি। সবাই সবার অবস্থান থেকে একাত্তরে কাজ করেছেন। তাদের মাথায় ছাতা হয়ে ছিলেন বঙ্গবন্ধু।

স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হলেন। সেই সময়ে গোটা জাতির উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। কোনো কোনো মুক্তিযোদ্ধা এমনও ভাবতে লাগলেন, যদি বঙ্গবন্ধুর কিছু হয়ে যায়, তাহলে স্বাধীনতা দিয়ে কী হবে? এক্ষেত্রে ঐসব মুক্তিযোদ্ধার ভাবনায় স্বাধীনতার সমার্থক শব্দে পরিণত হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা যুদ্ধদিনের গল্প বঙ্গবন্ধুর জন্য তুলে রাখলেন। যদি এই কথাটি কোনোদিন তারা বঙ্গবন্ধুকে বলার সুযোগ না পেতেন, সম্ভবত তাদের মুক্তিযুদ্ধ অপূর্ণ থেকে যেত। সেই সময়ে যখন পাকিস্তানের কারাগারের বন্দিদশায় বঙ্গবন্ধু, তখন একজন সাধারণ পিতা যদ্ধে যাওয়া তার সন্তানের চাইতে বেশি চিন্তিত থেকেছেন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে। বঙ্গবন্ধুর খবর শোনার জন্য সাত কোটি মানুষের হাপিত্যেশ সেটি পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল একটি ঘটনা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি নাম একটি ইতিহাস। বাঙালি জাতির সংগ্রামী জীবনধারার প্রতিটি সিঁড়িতে বঙ্গবন্ধু মুজিব ছিলেন এককভাবে অগ্রসরমান। একটি মুজিবের জন্যই একটি জাতির জাগরণ, একটি জাতির অভ্যুত্থান, একটি রক্তাক্ত একাত্তর এবং একটি স্বাধীনতা। এ সব অর্জন সম্ভব হয়েছিল একজন শেখ মুজিবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিশাল ব্যক্তিত্বের কারণে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখানেই অতুলনীয় এবং তুলনাহীন। যেন আপন দ্যুতিতে প্রোজ্জ্বল এক অবিনাশী ধ্রুবতারা। এককথায় শতাব্দীর মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। হঠাৎ করে অবৈধভাবে ক্ষমতা জবরদখল করে টাকা-আনা-পাই এর মাধ্যমে তিনি নেতৃত্বের আসনে বসেননি। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় জনগণের সুখ-দুঃখের সাথে একাকার হয়ে জনতার দাবি আদায়ের সংগ্রামে অগ্রসেনানীর ভূমিকা পালন করে জনগণের নেতা থেকে বঙ্গবন্ধু তথা জাতির জনকের মর্যাদা লাভ করেছেন। মানুষের কথা বলতে গিয়ে

জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে লৌহ-কপাটের অন্তরালে। লোভ, লালসা, ভোগ, বিলাস, ক্ষমতার অংশীদারিত্ব সবকিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে বাঙালি জাতির ভাগ্য উন্নয়নের জন্য আপসহীনভাবে লড়াই করে গেছেন। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সগর্বে ঘোষণা করেছেন, 'দাবায়ে রাখতে পারবা না'। বঙ্গবন্ধুর সে সাহসী উচ্চারণ বৃথা যায়নি। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ধাপে ধাপে বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এগিয়ে গেছেন চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে। ১৯৭০ সালের নির্বাচন আর ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধ। এই সময়কালে বঙ্গবন্ধু ছিলেন লড়াই সংগ্রাম তথা স্বাধিকারের প্রধান প্রেরণার উৎস। বঙ্গবন্ধু আর জয় বাংলা এই দুটি শব্দ হয়ে ওঠে সাহসের হাতিয়ার। এই সময় নেতা ছিলেন অনেক, কিন্তু তারা ছিলেন নেতৃত্বহীন। বাংলার মানুষ তখন আর কারো কথা শুনতে রাজি নয়। জনতার জোয়ার তখন শেখ মুজিবের নেতৃত্বের দিকে। অন্য কোনো দিকে চোখ ফেরাবার সময় তখন জনতার নেই। আর এই গণজাগরণের মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন, 'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে তৈরি হও। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। জয় বাংলা।' বঙ্গবন্ধুর সে ঘোষণা বাঙালি জাতির মধ্যে বাঁধভাঙা জোয়ারের সৃষ্টি করে। কোটি কোটি কণ্ঠ থেকে ঐকতানে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে থাকে 'জয় বাংলা, বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর।' এই সময় যারা পাক সরকারের অধীনে চাকরি করছিলেন, তারা নীরবে দৃশ্যপট যাচাই করে দেখছিলেন। তাদের মনে তখন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল 'যদি হারিয়ে যাই' তখন কি হবে। দেশে জনতার লড়াই চলছে, পাক বর্বর বাহিনীর হাতে মানুষ প্রাণ দিচ্ছেন তখন সুযোগ আলীর দল নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে, 'দেখি কি হয়' অপেক্ষায় ছিল। ২৬ মার্চ পর্যন্ত যে জিয়া জনতার এই আপসহীন আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন না, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে একটি ঘোষণা পাঠ করার সুযোগ পাওয়ায় তাকে হিরো বানানোর কাল্পনিক প্রচেষ্টা এখনও অব্যাহত আছে। যারা এই অবান্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা একটি অমোঘ সত্য স্বীকার করতে রাজি নয় যে, জোর করে ক্ষমতা জবরদখল করা যায়, কিন্তু জনগণের মন জয় করা যায় না। মনগড়া ইতিহাস একদিন নির্বাসনে যায়। কেননা ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না।

দীর্ঘ নয় মাস মরণপণ লড়াই করে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে এলো স্বাধীনতা। স্বাধীনতাযুদ্ধের সেই চরম সময়ে বঙ্গবন্ধু ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। তাঁর অনুপস্থিতিতে স্বাধীনতাযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে তাঁর নামে। সে সময় বঙ্গবন্ধুর নাম বাদ দিয়ে কারো নাম সেখানে যুক্ত করা সম্ভব ছিল না। কেননা রণাঙ্গন থেকে সর্বক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা আর লড়াইয়ের হাতিয়ার। সেখানে অন্য কারো অংশীদারিত্ব ছিল না। বিশ্বজনতার চাপ আর বাঙালি জাতির সাহসী প্রত্যাশার কাছে ভুট্টো, ইয়াহিয়া, গোলাম আজম, নিজামী চক্রকে হার মানতে হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজয়ীর অহঙ্কার নিয়ে স্বদেশে আপন জনতার মাঝে ফিরে আসেন। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে বাংলা আর বাঙালির ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। স্বজন হারানোর ব্যথাকে ভুলে গিয়ে মানুষ আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠেন। শেখ মুজিবের নামে বাংলা ও বাংলার মানুষ, আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হতে থাকে। আজো সে দিনের স্মৃতি মনে হলে সাহস বেড়ে যায়। ঘাতক নির্মূলের এরূপ একটি দিনের জন্য এখানে প্রহর গুনছি।

বঙ্গবন্ধু অবশ্যই রাজনৈতিক দলের নেতা। তিনি রাজনীতির মানুষ চিরকাল রাজনীতি করেছেন। রাজনৈতিক নেতাদের সীমাবদ্ধতা থাকে। তাকে নিজের দলের স্বার্থ দেখতে হয়। আওয়ামী লীগের স্বার্থ এবং সাত কোটি মানুষের স্বার্থ এক ছিল না। ফলে এক্ষেত্রে একটি দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়া অসম্ভব কিছু ছিল না। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে তাই দুই পক্ষ থেকেই অপবাদ উঠার সুযোগ ছিল, দলের কর্মীরা বলতে পারতেন, তিনি দলের চাইতে দলের বাইরের মানুষের মতামতকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন, সাধারণ মানুষ বলতে পারতেন, বঙ্গবন্ধু তার দলের স্বার্থ দেখছেন। কিন্তু কোনো পক্ষই এ কথাটি বলার সাহস পাননি, অথবা বঙ্গবন্ধু কাউকেই এই সুযোগও দেননি। এটি করার জন্য বঙ্গবন্ধুকে বিশেষ কৌশলী হতে হয়নি। তাঁকে যা করতে হয়েছে, সেটি হলো নিজের স্পষ্ট অবস্থান স্থির করা। বলতে গেলে তার কারণেই আওয়ামী লীগ পরিণত হলো গণমানুষের সংগঠনে। আর যখন সেটি গণমানুষের সংগঠনে রূপ পায় তখন দলের স্বার্থ এবং জনগণের স্বার্থ এক হতে বিলম্ব ঘটেনি।

এ সবকিছুই সম্ভব হয়ে উঠেছিল বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কারণে। তাঁর ব্যক্তিত্ব মানুষকে এতটাই মুগ্ধ করে রেখেছিল, যে এমন কি বঙ্গবন্ধু তিনি নিজের গায়ে হাতাকাটা যে কোট চাপাতেন, সেটিও স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি প্রতীকী পোশাকে পরিণত হলো। আজ এতদিন পরও মুজিব কোটের জনপ্রিয়তায় ঘাটতি আসেনি।

সবমিলিয়ে বঙ্গবন্ধু সর্বাত্মকরণেই 'আমাদের বঙ্গবন্ধু'। একটা জাতি একবারই পায় তাকে, তারপর আর পায় না কিছুতেই।

স্বাধীনতার প্রথম ডাক দেন মওলানা ভাসানী

১৭ নভেম্বর ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপ্নদ্রষ্টা, আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার নির্যাতিত ও মুক্তিকামী জনগণের মুক্তিসংগ্রামে নিবেদিত মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ২৬তম মৃত্যুবার্ষিকী। আসাম মওলানা ভাসানীকে দিয়েছে সংগ্রামের চেতনা আর সে চেতনাকে শাণিত করেই মওলানা ভাসানী ঊনপঞ্চাশ সালে মুসলিম লীগের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সাহসী সংগ্রামের সূচনা করে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রথম বিরোধীদলের পত্তন করেন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন মওলানা ভাসানীকে সভাপতি, শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রথম যুগ্ম সম্পাদক করে গঠন করা হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। ১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠা করেন পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। আদর্শিক কারণে তিনি আওয়ামী লীগ ত্যাগ করেন। কারণ মওলানা ভাসানী ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী। তাঁর সংগ্রাম ছিল সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধবাজ নীতির বিরুদ্ধে যেমন তিনি সোচ্চার কণ্ঠ ছিলেন, তেমনি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে বিশ্বের দেশে-দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, সিয়াটো ও সেন্টো প্রভৃতি যুদ্ধজোটের বিরুদ্ধে তিনি সবসময় আপসহীন লড়াই করেছেন। মওলানা ভাসানী আদর্শে অটল থেকে আজীবন সাধারণ মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে লাগাতার সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁকে আমরা আসামে যেমন দেখেছি মেহনতি মানুষের ত্রাতা হিসেবে সংগ্রামের অগ্রভাগে, তেমনি পেয়েছি আমাদের মহান ভাষা আন্দোলন, মুসলিম লীগবিরোধী সংগ্রামে, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে এবং আমাদের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের সাহসী সিপাহসালার

হিসেবে। তাই তো বিশিষ্ট সাংবাদিক আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী লিখেছিলেন, 'আমাদের মিলিত সংগ্রাম মওলানা ভাসানীর নাম'।

মওলানা ভাসানী যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন সে বাংলাদেশ বর্তমানে রক্তাক্ত বাংলা, তিনি চেয়েছিলেন সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা। কিন্তু সে বাংলাদেশ বর্তমানে সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা আর মৌলবাদের কালো থাবায় ক্ষতবিক্ষত। মিথ্যা বিকৃত ইতিহাসের কবলে সত্য ইতিহাস আড়াল করে দেয়ার প্রতিযোগিতা চালানো হচ্ছে। একাত্তর সালের ঘাতক দালালচক্র ক্ষমতার অংশীদারিত্ব পেয়ে তাদের পরাজয়ের বদলা নেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। যারা ছিলেন স্বাধীনতার পথিকৃত, তাদের অবদান অস্বীকার করে মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডারকে প্রথম সারিতে তুলে এনে মহিমান্বিত করার নগ্ন প্রয়াস চালানো হচ্ছে। কতিপয় ক্রীতদাস ভাড়াটে লেখক মিথ্যাকে সত্য হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য নতুনভাবে ইতিহাস রচনা করে জাতিকে বিভ্রান্ত করছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথিকৃত যদি বলতে হয়, তা হলে বলতেই হবে স্বাধীনতা, প্রথম আহ্বান করেছিলেন মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং সেই স্বাধীনতাকে বাস্তবায়িত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথিকৃতদের পাশে গায়ের জোরে জিয়াউর রহমানের নাম যুক্ত করা পাগলামি ছাড়া অন্য কিছু নয়। রাষ্ট্রক্ষমতা জবরদখল করা যায়, কিন্তু ইতিহাস দখল করে কেউ কোনোদিন ইতিহাসে নিজের স্থান করে নিতে পারেনি, পারবেও না। একাত্তর-পূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতিতে মওলানা ভাসানী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে জনগণের মুক্তির দিশারী ছিলেন তা মীমাংসিত সত্য। কিন্তু জিয়াউর রহমান তো সেসময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন লেফটেন্যান্ট বা ক্যাপ্টেন হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধেই ছিলেন। কারণ ইতিহাসই বলে, পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ইতিহাস মানুষ দমনের, লালনের নয়। তাই শিশুপাঠ্যে জিয়াউর রহমানের জন্য ৪৪ লাইন, মওলানা ভাসানীর জন্য ৩৯ লাইন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য ৩১ লাইন বরাদ্দ করে যে বিকৃত ইতিহাস প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালানো হচ্ছে তা কোনদিন সফল হবে না। ইতিহাস বিকৃতকারীরা একদিন ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবেই। মওলানা আবদুল হামিদ খান

ভাসানীই প্রথম বাংলাদেশকে স্বাধীন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন ১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতি 'আসসালামু আলাইকুম' বলে ঘোষণা করার মাধ্যমে এবং সে ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের ৩০ নভেম্বর এক প্রচারপত্রের মাধ্যমে তিনি স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। সে ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দি হওয়ার আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, যে ঘোষণা কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে এমএ হান্নানের কণ্ঠে প্রচারিত হয়। এই একই ঘোষণা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে জিয়াউর রহমানও পাঠ করেন। মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর সে প্রচারপত্র সারা বাংলায় প্রচার করা হয়। এখানে মজলুম জননেতা ভাসানীর সেই প্রচারপত্রের বক্তব্য প্রকাশ করা হলো।

'জনগণের প্রতি মওলানা ভাসানীর ডাক : পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন

আজ আমি পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি বাংগালীকে তাদের জীবন মরণ প্রশ্নের বিষয়টি পুনর্বার এবং শেষবারের মত দলমত নির্বিশেষে ভাবিয়া দেখিতে আকুল আবেদন জানাইতেছি। বিগত ২৩টি বছরের তো বটেই, এমনকি চলতি ১৯৭০ সালটিকেই শুধু যদি আমরা যাচাই করিয়া দেখি তবে নিঃসন্দেহে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিব। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট হইতে আমাদের, পূর্ব পাকিস্তানীদের আজাদীর লড়াই নতুনতম এবং শেষ পর্যায়ের রূপলাভ করিবার অপেক্ষায় আছে মাত্র। সেই পর্যায়ে আর কোন যুক্তি ও শক্তি দ্বারা ধামাচাপা কিংবা দাবাইয়া রাখিবার প্রয়াস সহ্য করা হইবে না। মরণ কামড়ে আর গগনবিদারী হুংকারে নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। দুই যুগ ধরিয়া বৈষম্য আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে যে লড়াই শুরু করিবার প্রচার ও প্রচেষ্টা চলিতেছে তারই সফল সংগ্রামী রূপায়ণে, আমাদের জীবনের বিনিময়ে হইলেও ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। আজ হইতে ১৩ বৎসর পূর্বেই ষড়যন্ত্র, অত্যাচার, শোষণ আর বিশ্বাসঘাতকতার নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে, 'আচ্ছালামু আলাইকুম' বলিয়াছিলাম, হয়তো বঙ্গবাসী সেইদিন নাটকের

সব কয়টি অংক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। আজ আশা করি সচেতন ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কোন বাংগালীকে বুঝাইতে হইবে না যে, মানবতা বর্জিত সম্পর্কের মহড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠিয়াছে। এইবার নেমিসিসের অন্যায়ের সুমচিত শাস্তি বিধানের অপেক্ষায়ই আমরা আছি। যাহা হইবার তাহাই হইবে।

আমরা ভাবিয়াছিলাম ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ পাকিস্তানীদের নতুন পথের সন্ধান দিবে। পূর্ব পাকিস্তানের বেতার, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রগুলো সেই পথ লক্ষ্য করিয়া যাবতীয় সার্ভিস দান করিয়াছিল। সরকারও লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পুস্তক প্রকাশনা ও দেশী-বিদেশী সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের সফরের আয়োজন করিয়াছিল, কিন্তু আজ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, সরকারের সকল প্রকার প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তান, কোন ক্ষেত্রেই সমগ্র পাকিস্তান নহে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানের সব প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। যুদ্ধ তহবিলে কোটি কোটি টাকা সাহায্য, কওমী গানের আসর, সাংবাদিকের ফিচার, সাহিত্যিকের রচনা সবই ধিকৃত ও উপেক্ষিত হইয়াছে। সবচেয়ে বড় কথা হইল, বরাবরই আমরা কেন্দ্রীয় সরকার ও আমলা অফিসারদের তরফ হইতে যে আচরণ পাইয়া আসিতেছিলাম আজ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিটি রাজনৈতিক নেতা, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এক কথায় সকল মহল হইতেই সেই উপেক্ষা ও উদাসীনতা লাভ করিতেছি। ইহাতেও কি আমাদের চেতনার উদ্রেক হইবে না?

অতীতের ইতিহাস না আওড়াইয়া শুধু চলতি সালের ঘটনাবলী বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের লক্ষ্য মুক্তির সংগ্রামে না পৌঁছাইয়া পারে না। পুনঃপুন বন্যা ও ঘূর্ণিবাত্যায় পূর্ব পাকিস্তান বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং এইবার একই বৎসরে আমরা দুইটি বন্যা ও দুইটি ঘূর্ণিঝড়ে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছি। প্রথম বারের বন্যায় পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে চারশত কোটি টাকা মূল্যের ফসল, ঘরবাড়ী, গবাদিপশু পানিতে ভাসিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় দফা বন্যায় আমরা হারাইয়াছি অতি কষ্টে রোপণ করা ধান, কলাই, তরিতরকারি ইত্যাদি। গত ২৩ শে অক্টোবরের ঘূর্ণিঝড়ে পূর্ব পাকিস্তানের আটটি জেলার ঘরবাড়ি, গাছপালা নির্ণয়াতীতভাবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আর সর্বশেষে দক্ষিণাঞ্চলের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস যে ধ্বংসলীলা ও

প্রাণহানি সংঘটিত করিয়াছে এবং বন্যা ও ঘূর্ণিবাত্যার পর পুনঃপুন কলেরা মহামারীতে আক্রান্ত হইয়া সহস্র সহস্র লোক অকালে প্রাণ হারাইয়াছে ও হারাইতেছে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবর্গ, ক্ষমতালোভী নেতৃবর্গ আর উদাসীন শিল্পী সাহিত্যিক, সাংবাদিকবর্গকে তাহা নাড়া না দিলেও বিশ্বের তিনশত কোটি মানুষকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

সরকার বরাবরের মত এই ধ্বংসলীলা ধামাচাপা দিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গেলেও শেষ পর্যন্ত সত্যের বিজয় হইয়াছে। আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না যে, আমাদের এহেন দুর্দিনে সরকার কি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছে। মানুষের হৃদয় নিঃসৃত ভালবাসা আর প্রজ্ঞাপ্রসূত বিবেচনার সম্মুখে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিছুই নহে, কিন্তু এই দুইটিরই অভাব আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছি। সরকার ও পশ্চিমা পাকিস্তানীদের নিকট হইতে সেই ভালবাসা ও বিবেচনা পূর্ব পাকিস্তান পায় নাই বলিয়াই যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগটি শতগুণ আঘাত হানিয়াছে। ইহার নতিজা সরকারকে ভোগ করিতেই হইবে। একজন মন্ত্রী মারা গেলে বেতার, টেলিভিশন ও অন্যান্য সরকারি প্রচারযন্ত্র কিভাবে মাতম শুরু করে তাহা আমাদের ভালোভাবেই জানা আছে। আর পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার নিয়ন্ত্রিত বেতার ও টেলিভিশন ১২ লক্ষাধিক লোকের প্রাণহানীতে কিরূপ বিশ্বাসঘাতকতা ও ক্ষমাহীন ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছে তাহা আজ সাত কোটি বাংগালীকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। লন্ডন, পিকিং, ওয়াশিংটন, তেহরান, আম্মান, সিডনি, টোকিও ও কলিকাতার বেতার যখন বিশ্ববাসীর নিকট সর্বনাশা জলোচ্ছ্বাসের বিশদ বিবরণ তুলিয়া ধরিয়াছে, সাহায্যসামগ্রী পাঠানোর আবেদন জানাইতেছে, তখনও পাকিস্তানের বেতার, টিভি বিশ্বাসঘাতক ও চরম মিথ্যাবাদীর ভূমিকা পালন করিতেছে, তখনও তাহাদের আহ্লাদমাখা অনুষ্ঠানের কমতি হয় নাই, বার লক্ষাধিক রূহের মাগফেরাত কামনা করা হয় নাই। লক্ষ লক্ষ লাশের দান কাফনের কর্তব্যের কথা স্বীকার করা হয় নাই। এর চেয়ে আফসোসের বিষয় আর কি হইতে পারে?

আজ তাই আমাদের সম্মুখে কর্মসূচি পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করিয়াছি। অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি। অনেককে কোরবানী দিয়াছি। আজ আমাদের হাতে

যাহাই অবশিষ্ট আছে সব কিছুই উৎসর্গ করিয়া সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। এই সংগ্রাম ভাষণ বিবৃতির নয়—প্রত্যক্ষ মোকাবেলা। এই মোকাবেলা আপোষ নিষ্পত্তিকল্পে চাপ সৃষ্টি করার সংগ্রাম নয়-পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি শোষিত নির্যাতিত বাংগালীর মুক্তি সংগ্রাম। দলমত নির্বিশেষে আজ সবাই আসুন, আমরা এক ও অভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করি এবং ইহারই পরিপেক্ষিতে মিছিল ও জনসভা অনুষ্ঠান করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নিকট জরুরী আবেদন করিতেছি।

এই দিনে আপনারা আওয়াজ তুলুন : পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে এবং আজাদী রক্ষা করিতে আমরা সর্বস্ব কোরবানী দিতে সদা প্রস্তুত। সেই সাথে আপনারা বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলুন : আমরা স্বাবলম্বী, আত্ম-নির্ভরশীল এবং শৃঙ্খলমুক্ত হইতে চাই। আমরা বিশ্বাসঘাতক আমলাদের শায়েস্তা করিতে চাই।

আমি বিশ্বাস করি, মানবতার নামে আজাদীর লড়াইয়ে আমাদের সাফল্য অনিবার্য। সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া আমরা ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছিব। আশা করি বিশ্ববাসীরও ইহাই বিশ্বাস। কিন্তু এই প্রসংগে আমি একটি হুঁশিয়ারিও উচ্চারণ করিতে চাই—আমাদের দুর্যোগ ও দুর্দিনকে সম্বল করিয়া যাহারা আন্তর্জাতিক রাজনীতির কোন চাল চালাইতে চায় তাহাদিগকে আমরা বরদাস্ত করিব না। আমাদের প্রয়োজনে যাহারা সাহায্য লইয়া আগাইয়া আসিতেছেন তাহাদিগকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই, কিন্তু সেবার নামে কেহ যদি ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে আমাদিগকে আটকাইতে চায় তবে তাহাকেও তল্পী-তল্পাসহ আমরা তাড়াইতে বাধ্য হইব।

বাংগালী কোন শিকলের বন্ধনকে মানিয়ে লয় নাই আর লইবে না। বিদেশী সৈন্যই হউন, কূটনীতিকই হউন, আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া কাজ করিবেন ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

বাংগালী জাতির মুক্তি-সংগ্রামকে রুখিতে পারে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই। সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত।

পূর্ব পাকিস্তান—জিন্দাবাদ
ইংগ-মার্কিন দস্যুরা—বাংলা ছাড়
জনগণের সংগ্রামী ঐক্য—জিন্দাবাদ

দুর্গতদের জনসেবায় আত্মনিয়োগ কর
নাছরুম মিনাল্লাহে ফাতহুন কাবির
(জয় আমাদের নিকটবর্তী)

মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী
৩০-১১-১৯৭০

যুগে-যুগে আত্মত্যাগী মহান সংগ্রামের ঐতিহ্য থাকলেও বাংলাদেশের জনগণ বারবার প্রতারিত হয়েছেন, প্রত্যাশিত মুক্তি ও শান্তি থেকে গেছে লাগালের বাইরে। জনগণ কোনো পর্যায়েই ভুল করেননি, করেনও না। কিন্তু তারপরও কেন তারা বঞ্চিত ও প্রতারিত হন সে সত্য খুঁজে বের করার এখনই সময়। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বেসামরিক সন্ত্রাসের পর এখন সেনা সন্ত্রাসে লাশের তালিকা বেড়েই চলেছে। এত লাশ নিয়েও ক্ষমতাসীনরা অতৃপ্ত। এ বর্বরতা কি থামবে না? আজকের এই দুঃসময়ে শাসকশ্রেণীর এ বর্বরতার বিরুদ্ধে 'খামুশ' বলে রুখে দাঁড়াতে পারতেন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা সংগ্রামী জননেতা মওলানা ভাসানী অথবা 'আর যদি একটি গুলি চলে...' বজ্রকণ্ঠের 'পয়েটস অব পলিটিক্স' অভিধায় ভূষিত বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আমরা সেই অসীম সাহসী নেতৃত্বের প্রত্যাশায়।

লন্ডন, ২০ নভেম্বর ২০০২

জাতির পতাকা খামচে ধরেছে স্বদেশী শকুন

বাঙালি জাতির মহান বিজয়ের মাস ডিসেম্বর আবার এসেছে। একত্রিশ বছর ধরে আসছে। জানান দিয়ে যাচ্ছে আমাদের সাহসের কথা, বীরত্বের কাহিনী। কারো সাধ্য নেই বাঙালি জাতির এই গৌরবের ইতিহাস ম্লান করে দেয়ার। গোলাম আজম, নিজামীরা একাত্তরে বর্বর পাক হানাদার বাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে বাঙালি জাতির অগ্রযাত্রা রুদ্ধ করতে। গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ করেও দমাতে পারেনি বাঙালি জাতির বিজয়। বিজয়ের একত্রিশ বছর পর ক্ষমতার অংশীদারিত্ব পেয়ে একাত্তরের পরাজয়ের বদলা নেয়ার জন্য গোলাম আজম, নিজামী, মুজাহিদরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। গত দু'যুগের বেশি সময় ধরে ক্ষমতা জবরদখলকারী সামরিক সেনাশাসক কিংবা বেসামরিক লেবাসে সামরিক স্বৈরাশাসকরা ইতিহাসের ইতরিকরণে পারদর্শী ব্যক্তিদের সাহায্যে মুক্তিযুদ্ধ ও শেখ মুজিব এই দুটি শব্দকে নির্বাসনে প্রেরণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে একদল হিংস্র ঘাতকের হাতে বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার পর থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ইতরিকরণের এ প্রাদুর্ভাব শুরু হয়। কিন্তু তাদের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশের মানুষের হৃদয় থেকে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ এবং শেখ মুজিবকে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখনো আছেন বাঙালি জাতির হৃদয়ে ইতিহাসের মুকুটহীন সম্রাট হয়ে। বর্তমান বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের কৃষিমন্ত্রী একাত্তর সালের ঘাতক দালাল যুদ্ধাপরাধী মতিউর রহমান নিজামী বঙ্গবন্ধু কৃষি পদকের নাম পরিবর্তনের একটি বিল সংসদে উত্থাপন করতে গিয়ে বলেছেন 'বঙ্গবন্ধু শব্দটা সর্বজনীন নয়, দেশের অধিকাংশ মানুষ ওটা পছন্দ করে না।' এ তথ্য তিনি কিভাবে পেলেন সে ব্যাখ্যা অবশ্য দেয়ার প্রয়োজন মনে

করেননি। মতিউর রহমান নিজামী একাত্তর সালে পাক বর্বর হানাদার বাহিনীর আশ্রয়ে থেকে বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছেন। সেদিন তিনি ছিলেন চাঁদতারা পতাকার সেবক। কিন্তু আজ একত্রিশ বছর পর ত্রিশ লাখ বাঙালি আর দু'লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে যে পতাকা আমরা অর্জন করেছি, সে পতাকা বহন করার অধিকার পেয়ে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে এমন উক্তি করার সাহস পেয়েছেন। যা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যায়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের একত্রিশ বছর পূর্ণ হওয়ার এই সময়ে আমাদেরকে একাত্তরের ঘাতক দালালদের কাছ থেকে এসব বক্তব্য শুনতে হচ্ছে। একত্রিশ বছর পূর্বে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ২২ বছর বয়সে সাহসী যৌবনে বিজয়ের উল্লাস গঙ্গা যমুনার মতো বহমান ছিল প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার জীবনে। একাত্তরে আমরা গোলাম আজম, নিজামী, মুজাহিদদের খুঁজেছি। পাইনি। তাই এই সব হন্তারককে শাস্তি দেয়া সম্ভব হয়নি। যারা স্বাধীনতার নেতৃত্বের দাবিদার তারা ক্ষমতায় গিয়ে এদের বিচার না করে আজকের অবস্থানে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন বলেই এখন তারা আবার মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তচিন্তার বিনাশসাধনে তৎপর। তাই ২০০২ সালের ১৬ ডিসেম্বরে এসে সে বিজয়ের বহমান ধারা আর নেই। নানা ঘাতপ্রতিঘাতে বিজয়ের সে উল্লাস কঠিন পলির নিচে আটকে গেছে। অথচ এমন হওয়ার কথা ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যেসব দেশ স্বাধীন হয়েছে সেসব দেশের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া আর কোনো দেশে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীরা ক্ষমতাসীন হতে পারেনি। কেন আজ একাত্তরের পরাজিত শত্রুরা রাষ্ট্রক্ষমতায় এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে ফিরে যেতে হবে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্নভাবে বিভক্ত ছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে জনগণের যে বিরল ঐক্য গড়ে উঠেছিল সে ঐক্যের বিপরীতে কোনো রাজনৈতিক দলের অবস্থান নেয়া সম্ভব ছিল না। জনগণের সে বিরল ঐক্য রাজনৈতিক নেতৃত্বকেও ঐক্যের সেতুবন্ধন রচনা করতে বাধ্য করে। যার ফলে যুদ্ধাপরাধী ও তাদের সহযোগী মুসলিম লীগ এবং চরম প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মান্ধ কিছু মানুষ ছাড়া সকল রাজনৈতিক দলকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে এক মোহনায় মিলিত

হতে হয়। দেশের অল্পসংখ্যক ঘাতক দালাল ছাড়া কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র জনতা এমনকি সেনানিবাসের বিদ্রোহী সেনাসদস্য, বিডিআর, পুলিশ, আনসার সবাই যার যার অবস্থান থেকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কেউ কারো নির্দেশের অপেক্ষায় বসে থাকেননি। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মাতৃভূমিকে পাক হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করার শপথ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যারা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি তারা এগিয়ে এসেছেন জীবন বাজি রেখে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে। অর্থ, খাবার, আশ্রয় দিয়ে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থন করেছেন। দেশের সব মানুষ ভারতে আশ্রয় নিতে যেতে পারেননি। শত্রুকবলিত দেশের মধ্যে তারা অবরুদ্ধ অবস্থায় উদ্বিগ্ন আর অসহায়ভাবে দিন কাটিয়েছেন। পাক হানাদার কবলিত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মানুষের সমর্থন না পেলে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কোনো প্রকার প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। অবরুদ্ধ দেশে মানুষ একদিকে পাক বর্বর-বাহিনীর আক্রমণের ভয়ে যেমন সদা আতঙ্কিত ছিলেন, তেমনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যে আনন্দ উল্লাস করেছেন এবং অসাফল্যে মনের গহীনে বিষাদ-সিন্ধু রচনা করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেয়ার অপরাধে কত গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করেছে পাক-বাহিনী তার সীমা সংখ্যা নেই।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সে সময়ের একটি কবিতায় উল্লেখ করেছিলেন, 'কি লিখবো আমি ভিয়েতনাম নিয়ে, আমার সামনে তো আরেক ভিয়েতনাম বাংলাদেশ।' বীর বাঙালির সাহসী যুদ্ধ আর আত্মবলিদানের ফসল স্বাধীন বাংলাদেশ। পুত্রহারা পিতার শোকের আর্তনাদ, বোনের আর্ত চিৎকার, ভাইয়ের করুণ বিলাপ, মায়ের আহাজারির মধ্যেও ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের উল্লাসে জেগে ওঠে বাংলার আকাশ বাতাস। একত্রিশ বছর পর আজকের বাংলাদেশের দৃশ্যপটকে একাত্তর সালের পাক হানাদার কবলিত বাংলাদেশের সাথেই কেবল তুলনা করা যায়। বর্তমানে অপারেশন ক্লিনহার্টের নামে বাংলাদেশে যে অঘোষিত সামরিক শাসন চলছে তাতে সেনা হেফাজতে চল্লিশের অধিক বাঙালি সন্তান বাঙালি সেনাদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। পাক হানাদার বাহিনীর মতো সেনা সদস্যরা দেশের মানুষের সাথে আচরণ করছেন। এমনকি নির্বাচিত সংসদ সদস্য পর্যন্ত তাদের হাতে লাঞ্ছিত

হয়েছেন। দেশে সেনা অভিযান নিয়ে অনেক আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে। সেনা অভিযানের আইনগত বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু সরকার পক্ষ পুরো বিষয়টিকে আড়াল করে রাখছে। মুক্তিযুদ্ধবিদ্বেষী কিংবা আওয়ামী লীগের প্রতি বিরূপ অথবা সরকারের সুবিধাভোগী বা কৃপাপ্রার্থী কতিপয় কলমজীবী লাইফ সাপোর্ট মেশিনে আবদ্ধ ক্লিনিক্যালি ডেড জোট সরকারের গুণকীর্তন করতে গিয়ে সেনা অভিযানকে যেমন জায়েজ করার অপচেষ্টা করে যাচ্ছেন, তেমনি সেনা অভিযানে নির্মম মৃত্যুগুলোকেও জায়েজ করার ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে তাদের বিবেক বাধা দিচ্ছে না। অনেকে আবার অতি উৎসাহী হয়ে সেনাবাহিনীর পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে সেনাবাহিনীকে জাতির গৌরব উপাধিতে ভূষিত করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর ভূমিকা পর্যালোচনা করলে গৌরবের চেয়ে অগৌরবের তালিকাই বেশি হবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একাংশের হাতে যেমন বাংলাদেশের স্থপতি নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন, তেমনি আরেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানও নিহত হন। বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর দুজন সেনাপ্রধান অবৈধভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে সামরিক ফরমান বলে পবিত্র সংবিধানকে বারবার সংশোধন করে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত মীমাংসিত সত্যগুলোকে নির্বাসনে প্রেরণ করে পুরো মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে ধ্বংস করেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন যে বর্তমানে সন্ত্রাসী আর দুর্বৃত্তচক্রের জবরদখলে তার জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা জবর দখলকারী সেনাশাসকরাই দায়ী। আজকের রাজনৈতিক সঙ্কটের জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব দায়ী নয়, সেনাশাসক জিয়া এবং এরশাদ এই রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করেছেন এবং সে ধারাবাহিকতা এখনো চলছে। সেনাশাসক জিয়া প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন, 'আই মেক পলিটিক্স টু ক্রিটিক্যাল।' তিনি কেনাবেচার রাজনীতির ক্ষেত্র তৈরি করে দলছুট আর স্বাধীনতাবিরোধীদের নিয়ে দল সৃষ্টি করেন। এ দল, সে ধারাবাহিকতায় বর্তমানে রাষ্ট্রক্ষমতায়। সেনাবন্ধু মওদুদ সব সেনাশাসকের সাথে ছিলেন এখনও আছেন। জিয়ার আদর্শের সৈনিক অভি কি আদর্শ ধারণ করে, এ সত্য দেশবাসীর আর জানতে বাকি নেই। বুটের আওয়াজকে যারা সুমধুর সঙ্গীত মনে করেন তারাই বুটওয়ালাদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করবেন এতে কোনো সন্দেহ থাকার

কথা নয়। তবে দেশের সাধারণ মানুষের মনে সেনাবাহিনীর কোনো আস্থার জায়গা নেই। যারা বিভিন্ন সময় ক্ষমতায় ছিলেন তারা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সবসময় সেনাবাহিনীকে তোয়াজ করেছেন। রাষ্ট্রীয় বাজেটের সিংহভাগ বরাদ্দ করেছেন সেনাবাহিনীর জন্য। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বাংলাদেশে যেখানে প্রতি ১ হাজার জনে একজন সৈন্য সেখানে সাড়ে বারো হাজার জন মানুষের জন্য মাত্র একজন ডাক্তার রয়েছেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেখানে সারা জীবন সেনাশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, সেখানে স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি পাকিস্তানি আদলেই সেনাবাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহের ও জিয়া উদ্দিন সেনাবাহিনীকে জনগণের সেনাবাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একটি পরিকল্পনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে পেশ করেছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাদের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। যে কারণে তারা উভয়ই সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন। সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে, স্বাধীনতাযুদ্ধে সাহসী ভূমিকা রাখার জন্য রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মান বীরশ্রেষ্ঠ পদক সেনাসদস্য ছাড়া কোনো বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাকে দেয়া হয়নি। অথচ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে সাহসী এবং ত্যাগী। কিন্তু বঙ্গবন্ধু বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের সে অবদানকে অস্বীকার করেন। যে কারণে সেসময় থেকেই পুরো মুক্তিযুদ্ধের সব কৃতিত্ব জনৈক মেজরের বলে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বিশিষ্ট কথাশিল্পী অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছিলেন, 'সাম্প্রদায়িকতা ঠেকানো না গেলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও প্রগতি দুই-ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' একত্রিশতম বিজয় দিবসে এসে আমরা কি উচ্চকণ্ঠে বলতে পারি, সাম্প্রদায়িকতার বিনাশ ঘটেছে? না, বলতে পারি না। বরং সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা শতগুণে বিস্তার লাভ করে প্রগতির ধারাকে বিনষ্ট করা হচ্ছে। বর্তমানে সাম্প্রদায়িক শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতায় এবং এই সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রগতির ধারা চিরনির্মূল করার উদ্যোগে নিয়েছে। তাই বলা যায়, ত্রিশ লাখ শহীদের রক্ত আর দু'লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে পাওয়া 'জাতীয় পতাকা আজ খামচে ধরেছে স্বদেশী শকুন।' একত্রিশ বছর পর বিজয়ের এই দিন রক্তে আর হিল্লোল তোলে

না। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় স্মৃতি আর দেহ-মনকে উদ্বেলিত করে না। বরং বিপন্ন করে, হতাশাগ্রস্ত করে।

একত্রিশতম বিজয় দিবসে আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোকে ফিরে দেখা। মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে আমাদের যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল, সে ঐক্য বিনষ্টের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলো খুঁজে বের করা জরুরি হয়ে পড়েছে। প্রকৃত ইতিহাসের মুখোমুখি হয়ে ইতিহাস থেকেই আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে। কেননা মুক্তিযুদ্ধ ছিল আমাদের গৌরবের, শৌর্যের, ভালোবাসার, মহত্ত্বের, ত্যাগের এবং আত্মবলিদানের। এসব গুণের সামনে এনে বিজয় দিবসের মূল্যায়ন করতে হবে। নাচোলের রানীমা, সাঁওতাল বিদ্রোহের সাহসী নেত্রী ইলা মিত্রের ভাষায় আমাদেরকে সমস্বরে উচ্চারণ করতে হবে, 'আমার হৃদয়ে বাংলাদেশ জেগে থাকে প্রতিনিয়ত।' এই জাগ্রত উচ্চারণই আমাদেরকে আবার মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনের মতো এক মোহনায় মিলিত করতে সাহায্য করবে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন এবং মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। মহান মুক্তিযুদ্ধ, তার ইতিহাস এবং শিক্ষা আমাদের প্রেরণার উৎস। বাঙালিরা বারবারই বিজয়ী এ কথা প্রমাণিত সত্য। নেতাদের ঐক্য কোনো সুফল বয়ে আনে না। এই ঐক্য ক্ষমতার সিঁড়িতে আরোহণের একটি বাহন মাত্র। কিন্তু জনতার ঐক্য ইতিহাস সৃষ্টি করে। যেভাবে বাংলার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন একাত্তরে। বর্তমান অমানিশার অন্ধকার থেকে মুক্তিলাভ করতে হলে জনতার ঐক্য অবশ্যম্ভাবী। জনতার কণ্ঠ থেকেই উচ্চারিত হতে হবে আরেকটি মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল পাক বর্বর হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। এবারের মুক্তিযুদ্ধের শত্রু-মিত্র আমাদের অচেনা নয়। শত্রু চিহ্নিত। আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে একাত্তরের ঘাতক দালাল এবং গত একত্রিশ বছরে জন্ম নেয়া জনতার অধিকার হরণকারী গণদুশমন বাংলাদেশের প্রগতির বিরোধী আগাছাগুলো পরিষ্কার করার দৃপ্ত শপথ হোক এবারের বিজয় দিবসের অঙ্গীকার।

১১.১২.২০০২

আরেকটি মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের বীরসেনানী এক মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে অতি সম্প্রতি পত্রিকায় দুটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদ দুটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সচেতন জনসাধারণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য চরম অপমানজনক ও মর্মপীড়ার কারণ হলেও মুক্তিযুদ্ধের একচ্ছত্র সোল এজেন্ট বলে দাবিদার বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও নির্বিকার। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বলে দাবিদার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিষয়টি নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে অনুভূতিহীন ও প্রাণহীন জড়পদার্থের মতো নীরব ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

প্রথম সংবাদে বিএনপির প্রথম সারির নেতা সাবেক অর্থমন্ত্রী এম. সাইফুর রহমানের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে একটি মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন 'এখন মুক্তিযুদ্ধের সেই পুরনো প্রসঙ্গ টেনে এনে জাতিকে বিভক্ত করা কোনো মতেই উচিত হবে না।' আমাদের মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন তো দূরের কথা, মৌলভীবাজার জেলার রাজনৈতিক অঙ্গনে এম. সাইফুর রহমানের নাম অনুচ্চারিত ছিল। কেননা তিনি সে সময় নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নিয়ে আত্মরক্ষা ও আত্মসমর্থনের পথ বেছে নিয়েছিলেন। যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, তার পক্ষে মুক্তিযুদ্ধকে পুরনো প্রসঙ্গ বলে উপহাস করা স্বাভাবিক। মুক্তিযুদ্ধ কোনো জাতির জীবনে হাজার বছরেও আসে না। আমাদের সৌভাগ্য আমরা মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি, মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি এবং বিজয় দেখেছি। আমাদের জীবনের যা কিছু ভালো তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়। সাহস, ভালোবাসা, জীবনদানের প্রতিযোগিতা, আত্মত্যাগ, আত্মসুখ বিসর্জন, নিঃস্বার্থপরায়ণতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা এসব গুণের বহমান ধারায়

বঙালি জাতির একই মোহনায় মিলিত হওয়ার ক্ষেত্র মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং বিজয় অর্জন। তাই মুক্তিকামী মানুষের কাছে মুক্তিযুদ্ধ কখনো পুরনো হয় না। অন্যায়, অত্যাচার আর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাওয়া সুফলগুলোকে যারা সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে দিতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অনির্বাণ শিখা হয়ে জ্বলতে থাকে। আর এ কারণেই পঁচাত্তর-পরবর্তীকালে রাজনীতিতে অনুপ্রবেশকারী সুবিধাবাদী নব্যরাজনীতিবিদরা মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভীতির চোখে দেখেন। ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস আড়াল করে রাখার নগ্ন প্রচেষ্টা করেন। রাজনৈতিক অঙ্গনে যাদের পদচারণা অনুপস্থিত ছিল, তাদের কাছে রাজনৈতিক আচরণ আশা করা যায় না। মূর্খ কখনো দেশ-জাতির জন্য ভীতির কারণ হয় না। কিন্তু জ্ঞানপাপী আর রাজনীতিতে অনুপ্রবেশকারী সুবিধাবাদীরা দেশ ও জাতির জন্য চরম সর্বনাশ ডেকে আনে। অবৈধভাবে ক্ষমতাদখলকারী সামরিক সেনাশাসক জিয়া, এরশাদ এবং তাদের সহযোগীরা গত একুশ বছরে দেশ ও জাতির যে সর্বনাশ করেছে তা আরো একশো বছরে পূর্ণ হবে কি না সন্দেহ। যে এম. সাইফুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ বিরোধিতাকারী শাহ আজিজ, আব্দুল আলিম, আনোয়ার জাহিদ, আব্দুর রহমান বিশ্বাসসহ অনেক ঘাতক দালালের সাথে সহাবস্থান করে মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালন করেন এবং ঘাতক গোলাম আজম, নিজামী আর স্বৈরাচার এরশাদের সাথে জোট বেঁধে আন্দোলন করে গৌরব বোধ করেন, তার কাছে মুক্তিযুদ্ধ অর্থহীন পুরনো প্রসঙ্গ হওয়া স্বাভাবিক।

সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ও ভবনের নামকরণবিরোধী আন্দোলনে মৌলবাদী চক্রের সাথে একজোট বেঁধে তিনি বড় বড় বক্তব্য রাখেন। কিন্তু মৌলভীবাজারে এম. সাইফুর রহমান কলেজ, সাইফুর রহমান অডিটরিয়াম এবং নিজ স্ত্রীর নামে মৌলভীবাজার মহিলা কলেজ ছাত্রীবাসের নাম দূররে সামাদ নামকরণে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। তখন কিন্তু মৌলভীবাজরের ওলি আউলিয়াদের নামের প্রসঙ্গ আসে না। এম. সাইফুর রহমানের দৃষ্টিতে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ পুরনো প্রসঙ্গ হতে পারে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না, আর বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে মেজর জিয়ার যেমন রাষ্ট্রপতির পদ জবরদখল করার সুযোগ সৃষ্টি হতো না, তেমনিভাবে এম. সাইফুর রহমান 'রহমান

এন্ড রহমান' ফামের কর্ণধারই থাকতেন। মন্ত্রী হওয়ার বিলাসী স্বপ্ন দেখতেন না। কোনো এক মেজর সপক্ষত্যাগ করে মুক্তিকামী জনতার অনুরোধে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেই স্বাধীনতার ঘোষক হয়ে যান না। একাত্তরে আমাদের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে পাকিস্তান সামরিক ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য মেজর জিয়াউর রহমান কিভাবে এবং পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট কারো তা অজানা নয়। পঁচাত্তরের নৃশংস পটপরিবর্তন, ৭ নভেম্বরে জিয়ার ক্ষমতাদখল এবং তারপর সামরিক ফরমান বলে পবিত্র সংবিধানসহ একে একে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাওয়া সুফলগুলোর ধ্বংস সাধন এবং নামিদামি মুক্তিযোদ্ধাদের নিধন প্রমাণ করে জিয়ার রাজনীতির উৎস কোথায় ছিল? একজন মুক্তিযোদ্ধা চিরদিন মুক্তিযোদ্ধা থাকতে পারেন না, যদি না তিনি মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের প্রতি অবিচল থাকেন। কিন্তু একজন রাজাকার চিরদিনই রাজাকার। আদর্শের পরিবর্তন করলেও সে কালিমা মুছে যায় না। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ যে কোনো বাঙালির জন্য অবশ্যই গৌরবের এবং সৌভাগ্যের বিষয়। যিনি মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন, বিজয় দেখে উল্লাস করেছেন তারা যে কত সৌভাগ্যবান তা অন্যদের অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আর সম্ভব নয় বলেই বিষয়টি তাদের কাছে পুরনো প্রসঙ্গ। আমাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধ সাহসের ও বিজয়ের প্রতীক। কুলাঙ্গার ছেলের দৃষ্টিতে 'পিতা বাঁচলেও লাভ, মরলেও লাভ' এ উক্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কুলাঙ্গার ছেলে বলেছিল, 'বাবা বেঁচে থাকা পর্যন্ত কোন দায়দায়িত্ব নেই। আড্ডা দেব খাব এবং বাবার মুত্যুর পর জায়গা জমি বিক্রি করে আরামে জীবন কাটাব।' যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলেন, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত সেই বাংলাদেশে স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে এবং জাতীয় চার নেতাকে কারাগারে হত্যাসহ অসংখ্য বীরমুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করা হয়। যারা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন তারাই বর্তমানে বাংলাদেশের কর্ণধার এবং রাজনীতির নিয়ন্ত্রক। আর এ কারণেই তারা মুক্তিযুদ্ধকে পুরনো প্রসঙ্গ বলার সাহস করেন এবং আমরা নীরবে তা সয়ে যাচ্ছি। একাত্তরে আমরা নয় মাস প্রকৃত বাঙালি ছিলাম। তাই জয়বাংলা বলে একই মোহনায় মিলিত হতে পেরেছিলাম। আমাদের সে রক্তে গড়া মৈত্রীর সেতুবন্ধনকে

পরে অতি সুকৌশলে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে বিভক্তির বীজ বপন করা হয়। সে বিভক্তির ধারা এখনো বিরাজমান। আর তাই তো মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী শক্তি মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

অপর সংবাদটি হচ্ছে খুবই করুণ এবং মর্মান্তিক। গত ১৮ জুন পঞ্চগড়ের একজন মুক্তিযোদ্ধা সফিউদ্দিন চিকিৎসার অভাবে মারা যান। পঞ্চগড়ের যে গ্রামে সফিউদ্দিনের বাস, সে গ্রামে জামায়াতিদের একচ্ছত্র আধিপথ্য। তাই এই গ্রামের মসজিদের জামায়াত সমর্থক ইমাম মাওলানা আলতাফ হোসেন মরহুম সফিউদ্দিনের জানাজায় বাধা প্রদান করে তার লাশ কুকুর শিয়াল দিয়ে খাওয়ানোর ফতোয়া জারি করে। অবশ্য এ ফতোয়া জারির পর স্থানীয় কিছু মুক্তিযোদ্ধা একত্রিত হয়ে তাদের উদ্যোগে মরহুম সফিউদ্দিনের জানাজা ও লাশ দাফন করা হয়। স্বাধীনতার ৩০ বছর পর যখন মুক্তিযোদ্ধার একক সোল এজেন্ট বলে দাবিদার আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রক্ষমতায়, তখন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের অপরাধে একজন মুক্তিযোদ্ধার লাশের জানাজা ও দাফনে বাধা প্রদান আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী জনসাধারণের প্রত্যাশা ছিল বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের বিচারের সাথে সাথে '৭১-এর ঘাতক ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, গত চার বছরে ক্ষমতাসীন সরকার কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। বরং ক্ষমতাসীন সরকার জামায়াত ও মৌলবাদকে তুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ছাড় দিয়ে যাচ্ছে। যে কারণে ঘাতক জামায়াত ও মৌলবাদীদের ধৃষ্টতা দিনদিন বেড়েই চলেছে। তাদের হিংস্র থাবায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিও প্রায় পর্যুদস্ত। পঞ্চগড়ের এই ঘটনা প্রমাণ করে, একাত্তরের পরাজিত ঘাতকচক্র মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি কত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। একাত্তরে আমরা মার খেয়েছি, মার দিয়ে বিজয় অর্জন করেছি, স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা কি কেবল মার খাব আর অপমানিত হব একাত্তরের পরাজিত শত্রুর কাছে? এই প্রশ্নের সমাধান এখনই প্রয়োজন। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বিজয় অর্জনের পর পরাজিত শত্রুর হাতে বারবার লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়া আর সহ্য করা উচিত হবে না। তাই প্রতিরোধ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। গত ৩০ বছরে অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে আমরা হারিয়েছি।

ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়েছে অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক এবং যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন তাদের সংখ্যাও দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। তাই আমরা যারা এখনো বেঁচে আছি, তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। কোনো সরকারের উপর ভরসা করে লাভ নেই। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার গত চার বছরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য কিছুই করেনি।

দেশ আমাদের, আমরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি। আর এই দেশে একজন মুক্তিযোদ্ধার লাশ দাফন করতে বাধা দেবে ঘাতক জামায়াত-শিবির চক্র তা মেনে নেয়া যায় না। তাই সাহস চাই আরো সাহস। ঘোষণা করতে হবে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ পুরনো প্রসঙ্গ নয়, মুক্তিযুদ্ধ চলছে, চলবে। কেননা আরেকটি মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য।

১৪.০৭.২০০০

যুদ্ধদিনের স্মৃতি

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার চাইতে অনেক বেশি নিরাপদ সিদ্ধান্ত ছিল রাজাকার হয়ে যাওয়া। বেঁচে যাওয়ার নিশ্চয়তা মিলত। সম্পদশালী হওয়ার সুযোগ আসত। হুট করে বিরাট কোনো হিন্দু বাড়ি দখল করে বিনা খরচে মালিক হয়ে যাওয়া যেন। চাই কি বাড়ির সাথে হিন্দু কোন অপরূপ সুন্দরী মেয়েকে গণিমতের মাল হিসেবে কাছে রেখে দেয়া যেত। জোর করে তাকে দিয়ে কলেমা পড়ানো যেত। সীতা নামের মেয়েটি হয়ে যেত রহিমা। রায়বাড়ি হয়ে যেত খাঁ কিংবা পাঠানবাড়ি। সকল মুক্তিযোদ্ধার সামনেই এই সুযোগটা ছিল। কিন্তু আমরা সেটি গ্রহণ করিনি। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের কাছে ছিল স্বপ্নের মতো বিষয়। সেই চমৎকার স্বপ্নের কাছে বৈষয়িক চিন্তা ছিল রীতিমতো অপরাধ। আমরা তখন কেবল মনেপ্রাণে একটাই স্বপ্ন পূরণে মরিয়া ছিলাম। সেই অবাধ্য স্বপ্নটির নাম স্বাধীনতা। আহা স্বাধীনতা! স্বাধীনতার মানেটাও আমাদের কাছে তেমন খোলাসা ছিল না। যে যার মতো স্বাধীনতার সংজ্ঞা দিয়েছি। যুদ্ধের সময়ে আমরা যখন একজন অন্যজনের সাথে কথা বলতাম, তখন প্রশ্ন থাকত দেশ স্বাধীন হলে কে কী করবে? কেউই আসলে সঠিক করে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। একেকজন একেক রকম কথা বলেছে। কারো কাছে স্বাধীনতা ছিল রাতের বেলা সিনেমা দেখে ঘরে ফেরা। ফেরার পথে ইচ্ছমতো কণ্ঠ ছেড়ে গান গেয়ে উঠা। কেউ বলেছে, স্বাধীন দেশে মনের সাধ মিটিয়ে ঘুমাব। সকাল গিয়ে দুপুর গড়াবে কিন্তু বিছানার আরামদায়ক আলস্য ছেড়ে কোথাও যাব না। আসলে স্বাধীনতার স্বপ্নে আমরা এতটাই বিভোর ছিলাম, তাতে আর অন্য কোনো হিসেব কষার সুযোগ আসেনি। যুদ্ধ করে কেউ আমরা রাজা বাদশা হতে চাইনি। মাঠের কৃষক যুদ্ধজয়ের পর সেই ক্ষেতের কাজেই ফিরে যেতে ব্যাকুল ছিল। রাজপ্রাসাদের কোনো লোভ তার ছিল না। রাখাল রাখালই থাকতে

চেয়েছে, রাজপুত্তুর হতে চায়নি। তবে তার রাখালিয়ায় সে রেখে দিতে চেয়েছে স্বাধীনতা। ব্যস এতটুকুই।

আমাদের যুদ্ধজয়ের গল্পটা খুব সহজ কিছু ছিল না। অস্ত্র হাতে নিলাম। ঢিসুম ঢিমুস যুদ্ধ করলাম আর স্বাধীন হয়ে গেলাম—ব্যাপারটি তা নয়। এর গভীরে অনেক কান্নার ইতিহাস আছে, হারানোর ইতিহাস আছে। যুদ্ধের সময়ে প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার জীবনে বলার মতো অনেক গল্প তৈরি হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের পর যখন কিছুতেই আর হিসেব মেলানো সম্ভব হয়নি তখন একটা ছেলেমানুষী অভিমানে সেই সব গল্প আর বলা হয়ে ওঠেনি। আমরা বলিনি। কারণ ভেবেছি বলে কী লাভ। হ্যাঁ বলিনি বটে তবে ভুলে যাইনি। বুকের ভেতরে অভিমানে আর যতনে সেই গল্পগুলোকে লুকিয়ে রেখেছি। মাঝেমধ্যে সেই গল্পগুলোকে বলতে খুব ইচ্ছে করে। মনে হয় পাওয়ার হিসেব করে যেহেতু যুদ্ধে যাইনি, সেহেতু নিতান্ত অকারণেই হোক সেই গল্পগুলোও বলি। বলে বুকের ভার কিছুটা হালকা করি। বলি সেই সত্তর বছর বয়েসী গ্রাম্য হিন্দু রমণীর অসাধারণ এক উক্তির কথা। বলি ছমিরের গল্প। যুদ্ধে শরীক হতে তার কাঙালপণার বৃত্তান্ত। ছমির এখন কোথায় আছে জানি না। বেঁচে আছে কি? তবে নিশ্চিত জানি সেই মহিলাটি বেঁচে নেই। তিনি কবেই হারিয়ে গেছেন। কিন্তু কানে আজো তার কথা বাজে। আমি অবাক হই একজন গ্রাম্য নারী কিভাবে সেই সময়ে আজকের চাইতেও আরো অনেক বেশি আধুনিক ছিলেন, কিভাবে তিনি ধারণ করেছিলেন সেই বিশাল বোধটিকে? আজ আমি সেই মহিলার গল্প বলব। আরেকদিন ছমিরের গল্প বলা হবে। মনে হচ্ছে আমার ভেতরের কথাগুলো এবার বলে ফেলা উচিত। সেই কথা কোথায় ধাক্কা খেল কিংবা কোথায় বা হারিয়ে গেল সেটি নিয়ে আর ভাবছি না।

১৯৭১ সালের মে মাসে এক ক্লান্ত দুপুর। তার চাইতে অধিক ক্লান্ত আমরা কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার সীমান্তবর্তী পাল্লাকান্দি গ্রামের পথ ধরে দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছি । মে মানে বাংলায় জ্যৈষ্ঠ মাস। মাথার উপরে নির্দয় সূর্য। প্রথমত, সূর্যতাপে এভাবে নিরুদ্দিষ্ট হাঁটা কথাটা কষ্টকর সেটি ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। এদিকে প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। শেষ খাবার খেয়েছি আমি নজিব আলী আর সহযোদ্ধারা গত রাতে। তাও আধপেটা ভাত। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমাদের

কত কিছুরই না অভাব ছিল। এই দীর্ঘ নয় মাসে একজন মুক্তিযোদ্ধাও সম্ভবত বলতে পারবে না সে যুদ্ধচলাকালীন কোনোদিন পেট ভরে খেতে পেয়েছে, তৃপ্তি মিটিয়ে ঘুমাতে পেরেছে। এতটা অভাব নিয়ে অন্য কোনো জাতি যুদ্ধ করেছে কিনা আমি জানি না। কিছুই ছিল না আমাদের। না খাদ্য, না আহত হওয়ার পর চিকিৎসার বন্দোবস্ত। তবুও যুদ্ধদিনে আমরা হতাশ হইনি। সবটুকু মনোবল একত্রিত করে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়েছি শত্রুর নিশানায়। যেদিনের কথা বলছিলাম সেদিন অন্য একটা মিশনের উদ্দেশ্যে আমরা নিজেদের ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়েছিলাম। ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমরা আর হাঁটতে পারছিলাম না। গ্রামের মেঠোপথ। বাড়িঘর খুব একটা নেই। যেসব বাড়িঘর আছে তাতে মানুষজন নেই। খাঁ খাঁ করছে চারপাশ। যুদ্ধের ভয়ে পালিয়েছে মানুষেরা। কোথায় যাবে তারা। পুরোটা বাংলাদেশ যুদ্ধকে ধারণ করে বেঁচে আছে। তুব একটু নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে মানুষজন এখান থেকে ছুটছে ওখানে। যেখানে যাচ্ছে সেখানেই তাদের তাড়া করছে মৃত্যু।

আমরা হেঁটে হেঁটে একটা বাড়ির দরজায় থামি। বাড়ি বলতে একটি ভাঙাচুরা ঘর। ভেতরে কোনো সাড়াশব্দ নেই। কেউ কি আছেন? আমাদের এই প্রশ্নের উত্তরে বাড়ির সদর দরজাটা একটু ফাঁক হয়। ঘরের ভেতর থেকে একজন বৃদ্ধা মহিলা চোখ তুলে তাকান। তার সেই চোখেমুখে তীব্র ভয়। আস্তে আস্তে দরজাটা পুরোপুরি খুলে যায়। আমরা সেই বৃদ্ধাকে দেখি। বয়সের ভারে নত হয়ে যাওয়া শরীর। দুর্বল স্বাস্থ্য, হাত পায়ের কাঁপুনি কিছুতেই আড়াল করতে পারছেন না।

আমাদের একজন সহযোদ্ধা সালাম দিলে বৃদ্ধা নমস্কারের মাধ্যমে তার উত্তর দিলে বুঝে নিতে পারি একটি হিন্দু বাড়িতে এসেছি। এতক্ষণ চোখে পড়েনি। ভাড়া ঘরে উঠোনে ঠিকই একটি তুলসির গাছ। বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যুদ্ধের এই ঢামাঢোলে বৃদ্ধাকে একা রেখে তার স্বজনরা হয়তো পাড়ি দিয়েছে সীমানা। বৃদ্ধা সম্ভবত তার চিরচেনা ভিটে, স্বামীর সংসার ফেলে অন্যদেশে যেতে রাজি হননি। হয়তো বলেছেন, মরি যদি এখানেই মরব, এই মাটিতে মিশে যাবে আমার শরীর। অথবা কে জানে বয়েসী মহিলাকে সঙ্গী করার সাহস কারো হয়নি। সবাই নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। কেবল থেকে গেছেন এই বৃদ্ধা। প্রতিরাতেই নিশ্চয়ই তার ঘুম ভেঙে যায়। একটু শব্দ শুনলেই হয়তো ভাবেন এই এলো বুঝি মিলিটারি।

এই বুঝি প্রাণ যায়! ভয়ে রামকে স্মরণ করেন তিনি। রাম নাম জপতে জপতে আবার ঘুমিয়ে পড়েন। আবার ঘুম ভাঙে। আবার সেই ভয়। মৃত্যুকে হাতে নিয়ে একা এই বাড়িতে বেঁচে আছেন সত্তরোর্ধ্ব এই বৃদ্ধা।

আমরা প্রথমে তার কাছে একটু পানি খেতে চাই। তিনি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন। কে জানে আমাদের পরিচয় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সম্ভবত তিনি আমাদের পানি নাও খেতে দিতে পারেন। আমিই বলি, আমরা মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধা শব্দটি উচ্চারণ করা মাত্র বৃদ্ধার চেহারা থেকে সরে যায় কালো মেঘ। মুহূর্তেই যেন তার বয়েসী ত্বকে খেলা করে যায় রোদ। মনে হয় কতদিন তিনি এমন আনন্দের সন্ধান লাভ করেননি। এই প্রথম তার কণ্ঠে ভাষা খেলা করে। তিনি আমাদের বসতে বলেন। প্রথমে আমরা বাড়ির বারান্দায় বসি। তিনি বলেন, তোমাদের জন্য খাবার তৈরি দেই বাবারা। এইরকম একটি প্রস্তাবের জন্য আমরা অপেক্ষায় ছিলাম। তাকে বলে দিতে হয়নি। তবুও তিনি বুঝে নিতে পারেন এই মূহূর্তে খাবারটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে জরুরি। আমরা বুঝতে পারি প্রত্যেক নারীই মায়ের প্রতিচ্ছবি। সন্তানের চেহারা দেখে তারা বুঝে নিতে পারেন। এইসব মায়ের জন্যই আমরা আজ যুদ্ধের ময়দানে। দেশকে তো আমরা মা হিসেবেই ভাবি। দেশ আমার মা। মা আমার দেশ। সেই মাকে হানাদারদের হাত থেকে রক্ষা করাব বলেই আজ আমাদের কাঁধে ঝুলছে স্টেনগান। বেশ কিছু সময় বয়ে যায়। আমরা বাইরে বসে থাকি। বৃদ্ধা নিজের সাধ্যমতো আয়োজন করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এর ফাঁকে আমাদের কাছে খাবার পানি চলে এসেছে। পানি খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করি। ক্লান্তিতে চোখের পাতায় ঘুম নামে। আমরা উঠোনে একটি গাছের ছায়ায় বসেছিলাম। যুদ্ধদিনের দুর্লভ স্বস্তির সন্ধান পাই। তবে আমাদের চোখ-কান খোলা। যে কোনো সময় যে কোনো দিক থেকে বিপদ নেমে আসতে পারে। তাই চোখের পাতায় ক্লান্তি ভর করলেও ঘুমানোর বিলাসিতার উপায় ছিল না।

এভাবে কিছু সময় যায়। রান্না শেষ হয়ে আসে। সেই বৃদ্ধা আদুরে স্বরে বলেন, আসো বাবারা। আমরা উঠে দাঁড়াই। তিনি অতি যত্ন করে আমাদের তার ঘরে নিয়ে যান। ঘরে ঢুকেই আমরা চমকে উঠি। ঘর বলতে তিনি তার সবচেয়ে সেরা রুমটাতে আমাদের বসতে দেন। পরিপাটি চারপাশ। ঘরের অযত্নটুকু এখানে নেই। মনে হচ্ছে প্রতিদিন এই ঘরটিকে যত্ন করে সাজিয়ে

রাখে কেউ। তবে ঘরের পরিপাটি ভাব দেখে আমরা চমকে উঠিনি। চমকে উঠার কারণটি একদম ভিন্ন। বৃদ্ধ আমাদের বসতে দিয়েছেন ঠাকুর ঘরে। অন্তত সেই সময়ে এটি বিস্মৃত হবার মতো একটি বিষয়। হিন্দু পরিবারের সাথে আমাদের সবারই যথেষ্ট যোগাযোগ আছে। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে সেই সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল উল্লেখ করার বিষয়। হিন্দু-মুসলমানে আসলে তেমন কোনো বিভেদ ছিল না। তবে দুটি ক্ষেত্রে সেই সময়ে হিন্দু পরিবাররা যথেষ্ট রক্ষণশীল ছিলেন। তাদের বাড়ির রান্নাঘরে কিংবা ঠাকুরঘরে কোনো মুসলমানের প্রবেশাধিকার ছিল না। এই নিয়মটি যত্ন করেই মানতো প্রতিটি হিন্দু পরিবার। আমরাও তাদের এই সংস্কারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলাম। তাই এই নিয়ে কখনো কোনো প্রশ্ন উদয় হয়নি। আজ যুদ্ধের সময়ে এই বৃদ্ধার ঠাকুরঘরে ঢুকে আমরা প্রত্যেকেই যথেষ্ট অস্বস্তিবোধ করি। মনে মনে ভাবি, বেচারি বোধহয় নেহায়েত বাধ্য হয়ে এখানে বসতে দিয়েছেন। ভাঙাচুরা এই গৃহে অতিথিকে বসানোর মতো উপযুক্ত স্থানের যথেষ্ট অভাব। তাই ঠাকুরঘরেই ভিনধর্মের অতিথিকে তিনি বরণ করে নিলেন। শুনেছি, এতে নাকি দেবতারা অসন্তুষ্ট হন। আমাদের আপ্যায়ন করতে গিয়ে এই বৃদ্ধা তার দেবতাকে অসম্মান করবেন এর কোনো মানে নেই। আমরা তাই প্রত্যেকেই এক সাথে বলি, মাসীমা আমরা উঠোনে বসেই খাবার খাব। ভয় নেই মিলিটারিরা আসবে না।

এই বলে আমরা ঠাকুরঘর ছেড়ে বাইরে বেরুতে চাই। আমাদের থমকে দেয় বৃদ্ধার দৃঢ় কণ্ঠস্বর। তিনি বলেন, তোমরা মুসলমান। তাই বুঝি ঠাকুরঘরে বসতে চাইছো না? তারপর তিনি বলেন, এই ঠাকুরঘরে আমার দেবীরা থাকেন। দেবী মানে মা। মায়ের কাছে সব সন্তানই সমান। সে হিন্দু নাকি মুসলমান তাতে মায়ের কিছু যায় আসে না। তোমরা এখানেই বসে খাবার খাবে।

একজন গ্রাম্য বৃদ্ধ মহিলার এমন উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের মুগ্ধ করে। কী অসাধারণ উক্তি। মায়ের ঘরে সব সন্তানই সমান। এমন মায়ের জন্য আমরা যুদ্ধ করছি। ধন্য সেই যুদ্ধ।

২০ মার্চ ২০০৭

এবার শুরু হোক কুকুর নিধন অভিযান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের ঊনত্রিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। ২৯ বছর পূর্বে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ২২ বছর বয়সে সাহসী যৌবনে বিজয়ের উল্লাস গঙ্গা-যমুনার মতো বহমান ছিল প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার জীবনে। ২০০০ সালের ১৬ ডিসেম্বরে এসে সে বিজয়ের বহমান ধারা আর নেই। নানা ঘাত-প্রতিঘাত বিজয়ের সে উল্লাস কঠিন পলির নিচে আটকে গেছে। বাঙালি জাতির দুর্ভাগ্য যে, মুক্তিযুদ্ধের সে গৌরব আর বিজয় ইতিহাসকে নিয়ে আজো বির্তকের অবসান হয়নি। রাজনীতির প্রয়োজনে যে যার মতো এই বিতর্ক চালিয়ে যাচ্ছেন। যে যার মতো করে বিজয় দেখেছেন এবং সে দেখার মধ্যে নিজের কৃতিত্বের ভাগই বেশি থাকছে। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধের একটি প্রকৃত ইতিহাস এখনো রচিত হয়নি, যা রচিত হয়েছে তা খণ্ডিত ইতিহাস। যার যার রাজনৈতিক প্রয়োজনে তা রচিত হয়েছে। সে ইতিহাসে জনগণকে অতি কৌশলে দূরে রেখে ব্যক্তির অবদানকে মুখ্য করে তোলা হয়েছে। অথচ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে জনগণের যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল তা ছিল ইতিহাসের বিরল ঘটনা। কিন্তু জনগণের সে ঐক্যের গৌরবগাথাকে বারবার অস্বীকার করা হয়েছে। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে চলেছে বিভ্রান্তির প্রতিযোগিতা।

কেন জনগণের বিরল ঐক্য আর ত্যাগের এই মহান মুক্তিযুদ্ধে আর গৌরবময় বিজয় নিয়ে বিভ্রান্তি আর বিতর্কের প্রতিযোগিতা, ঊনত্রিশ বছর পর এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে ফিরে যেতে হবে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্নভাবে বিভক্ত ছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে জনগণের যে বিরল ঐক্য গড়ে উঠেছিল, সে ঐক্যের বিপরীতে কোনো রাজনৈতিক দলের অবস্থান নেয়া সম্ভব ছিল না। তাই জনগণের সে বিরল ঐক্য রাজনৈতিক নেতৃত্বকেও ঐক্যের সেতুবন্ধন রচনা করতে বাধ্য করে। যার ফলে যুদ্ধাপরাধী জামায়াত ও তাদের

সহযোগী মুসলিম লীগ ও চরম প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মান্ধ কিছু গোষ্ঠী ছাড়া সকল রাজনৈতিক দলকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে এক মোহনায় মিলিত হতে হয়। এ কথাও অসত্য নয়, প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোর অনেক সাধারণ কর্মীসমর্থক স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। গুটিকয়েক ঘাতক দালাল ছাড়া কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র জনতা এমনকি সেনানিবাসের বিদ্রোহী সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার সবাই যার যার অবস্থান থেকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কেউ কারো নির্দেশের অপেক্ষায় বসে থাকেননি। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মাতৃভূমিকে পাক হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করার শপথ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যারা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তারা এগিয়ে এসেছেন জীবনবাজি রেখে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে। অর্থ, খাবার, আশ্রয় দিয়ে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থন করেছেন। দেশের সব মানুষ ভারতে আশ্রয় নিতে যেতে পারেননি। শত্রুকবলিত দেশের মধ্যে তারা অবরুদ্ধ অবস্থায় উদ্বিগ্ন আর অসহায়ভাবে দিন কাটিয়েছেন। পাক হানাদারকবলিত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মানুষের সমর্থন না পেলে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কোনোপ্রকার প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। অবরুদ্ধ দেশে মানুষ একদিকে পাক বর্বর-বাহিনীর আক্রমণের ভয়ে যেমন সদা আতংকিত ছিলেন, তেমনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যে আনন্দে উল্লাস করেছেন এবং অসাফল্যে মনের গহীনে বিষাদ-সিন্ধু রচনা করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেয়ার অপরাধে কত গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করেছে পাক-বাহিনী তার সীমাসংখ্যা নেই। একই অপরাধে পাক বর্বর-বাহিনী মেয়েদের ধরে নিয়ে গেছে, কত মানুষকে হত্যা করেছে তার হিসেব নেই।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সে সময়ের একটি কবিতায় উল্লেখ করেছেলেন, 'কি লিখবো আমি ভিয়েতনাম নিয়ে, আমার সামনে তো আরেক ভিয়েতনাম—বাংলাদেশ।' বীর বাঙালির সাহসী যুদ্ধ আর আত্মবলিদানের ফসল স্বাধীন বাংলাদেশ। পুত্রহারা পিতার শোকের আর্তনাদ, বোনের আর্তচিৎকার, ভাইয়ের করুণ বিলাপ, মায়ের আহাজারির মধ্যেও ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের উল্লাসে জেগে ওঠে বাংলার আকাশ বাতাস। কিন্তু বাংলার মানুষের যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল তাতে বিভক্তির বীজ বপণ করা হলো। জনতার বিরল ঐক্যের ফলে যে স্বাধীন

বাংলাদেশের সৃষ্টি, সে দেশেটি চলে গেল নতুন একটি গোষ্ঠীর দখলে। জনতার এই ঐক্য বিনষ্টের মধ্য দিয়েই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাসের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠার পরিবর্তে বারবার নিচের দিকে ধাবিত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশকে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব দিয়ে দলীয় রাজনীতির বলয়ের আবর্তে আবদ্ধ করে রাখা হয়। বৃহত্তর অংশকে যে যার কাজে ছিলেন সে কাজে চলে যাবার উপদেশ দেয়া হয়। ফলে জানবাজি রেখে যে মুক্তিযোদ্ধারা একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন, সেই মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেই বিভক্তির বীজ স্থায়ীভাবে দানা বেঁধে ওঠে। সে বিভক্তির বিষবৃক্ষ জনগণের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। যতদিন মুক্তিযুদ্ধ ছিল ততদিন জনতার ঐক্য ছিল। মানুষ একে অন্যের সুখদুঃখের সাথী ছিলেন। কিন্তু বিভক্তির ফলে সে ভালোবাসার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। যার ফলে একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের কাছে পর হয়ে গেলেন। ভালোবাসার এই দূরত্ব একাত্তরের রণাঙ্গনের সাথীদের এভাবেই পর করে দেয়। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের স্মৃতি একে অন্যের কাছে অস্পষ্ট হতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধা তথা মুক্তিকামী মানুষের এই বিভক্তির সুযোগ নিয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার শত্রুরা। শত্রুরা এই বিভেদের সুযোগ নিয়ে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে বিভ্রান্তি আর বিতর্কের কালোছাপ এঁকে দিতে পেরেছে। যুদ্ধাপরাধী মতিউর রহমান নিজামী, দেলওয়ার হোসেন সাঈদীসহ অনেক ঘাতক-দালাল পবিত্র সংসদে বসার সুযোগ পেয়েছে। রাজাকার শাহ আজিজ প্রধানমন্ত্রী এবং আব্দুর রহমান বিশ্বাস রাষ্ট্রপতির গদিতে বসতে পেরেছে।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রশ্নে জনগণের ঐক্য গড়ে উঠলেও অতি কৌশলে কিছু সমস্যা সৃষ্টি করে রাখা হয়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশের নেতৃত্বের আসনে বসার সুযোগ করে দেয়। ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্র যখন এই নির্বাচনী বিজয় অস্বীকার করে তাদের শাসন শোষণ অব্যাহত রাখতে চেয়েছে তখন অন্যরা কেউ চুপ করে বসে থাকেননি। এ কথা সত্য, ১৯৭০-এর নির্বাচনকে অস্বীকার করার পরিণতিতেই অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণ মুক্তিযুদ্ধের দিকে এগিয়ে গেছেন। তাই বলে এ কথা বলা যায় না, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুধু ৭০-এর সাধারণ নির্বাচন কিংবা ৭১-এর অসহযোগ

আন্দোলনের চূড়ান্তরূপ ছিল। পাকিস্তানি শাসন শোষণের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের দীর্ঘ চব্বিশ বছরের সংগ্রামের শেষ পরিণতি ছিল মহান মুক্তিযুদ্ধ। বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ একই স্রোতধারায় একই মোহনায় মিলিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর স্বাধীন বাংলাদেশে জনগণের সে ঐক্যের প্রতিফলন ঘটবে এবং দেশ পরিচালনায় মুক্তিকামী জনতার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে—এ প্রত্যাশা সবার ছিল। পৃথিবীর যেসব দেশ মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করেছে সেসব দেশে জনতার ঐক্যকে অটুট রেখে দেশ পরিচালনা করা হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জনতার সে ঐক্যকে সূচনা থেকেই বিভক্ত করার প্রয়াস চালানো হয়। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিজয়ী দল, একথা বলে আওয়ামী লীগ এককভাবে প্রবাসী সরকার গঠন করে। মুক্তিযুদ্ধে যেখানে পাকিস্তানি কাঠামোর সব আইনকে অস্বীকার করা হয়েছে, সেখানে পাকিস্তানি কাঠামোর নির্বাচনকে ভিত্তি করে এককভাবে প্রবাসী সরকার গঠন কতটুকু যুক্তিসঙ্গত সে প্রশ্ন যে কেউ তুলতে পারতেন। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্ন সবার কাছে এতই জরুরি ছিল যে, সে প্রশ্ন কেউ তোলেননি। এ প্রশ্ন না তোলার কারণে দুর্ভাগ্যবশত মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বের সঙ্কীর্ণতা চরম আকার ধারণ করে এবং অন্যদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা প্রদানের পথেও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মুক্তিযুদ্ধের উপর তৎকালীন ভারত সরকার এবং প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকারের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্যদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখার জন্য সদা তৎপর ছিলেন। বিশেষ করে বামপন্থী নেতাকর্মীরা যাতে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে না পারেন, সে ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষ খুবই সতর্ক ছিলেন। বিশেষ করে বামপন্থীদের মধ্যে 'চীনপন্থী' বলে যারা পরিচিত ছিলেন, তারা যাতে কোনোভাবেই মুক্তিযুদ্ধের কোনো কর্মকাণ্ডে প্রবেশ করতে না পারেন, সে ব্যাপারে প্রবাসী আওয়ামী নেতৃত্ব ও ভারত সরকার বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। এ ধরনের সংগঠনের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে ক্যাম্প থেকে বের করে দেয়া হয়। অনেককে হত্যা করা হয়। অনেককে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। 'লাল বই' সাথে থাকার কারণে আমাকে গ্রেফতার করে কারাগারে

প্রেরণ করা হয়। আমার এলাকার সংসদ সদস্য কিংবা কোনো নেতা আমার মুক্তির ব্যাপারে সামান্য কোনো ভূমিকাই রাখেননি। বাম ও ত্যাগী নেতা নবাব আলী সফদার খান রাজা সাহেবের প্রচেষ্টায় একমাস সতরো দিন পর মুক্তিলাভ সম্ভব হয়। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের তৎকালীন সিপিএম নেতা দশরত দেব বর্মণসহ অন্যান্য বাম নেতার সহযোগিতা না পেলে বামপন্থীদের ভারতে অবস্থান সম্ভব ছিল না।

মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতে অবস্থানকালে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কম হয়নি। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত মুক্তিযুদ্ধ সমন্বয় কমিটির একটি প্রতিনিধি দল প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের সাথে সাক্ষাৎ করে ওই সব প্রতিবন্ধকতা দূর করার এবং প্রতিকার দাবি করেন। তিনি তখন তাঁর অসহায়ত্বের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। এত প্রতিকূল পরিবেশেও বাম সংগঠনের নেতাকর্মীরা নীরবে বসে থাকেননি। অন্যরা যখন কলকাতা শিলং আগরতলায় বিলাসী জীবন কাটিয়েছেন এবং রেডিও টিভিতে সাক্ষৎকার প্রদান করে মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব শেষ করেছেন, তখন বামপন্থী নেতাকর্মীরা দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন এলাকায় ঘাঁটি গড়ে তুলে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। এ কথা অবশ্য সত্য বামপন্থীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ 'হক-তোহা' গ্রুপ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল এবং এখনো তারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করেন না। এই ক্ষুদ্র অংশের বিরোধিতার পুরো দায়ভাগ বামপন্থীদের উপর ঠেলে দিয়ে আওয়ামী বুদ্ধিজীবী তথা কলমজীবীরা এখন পর্যন্ত মিথ্যে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। মুক্তিযুদ্ধের এই ঐক্যের সমস্যা কেবল ভিন্নমতের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। আওয়ামী লীগের নিজের মধ্যেও তা প্রবল ছিল। আওয়ামী লীগের তরুণ নেতৃত্বকে দিয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আলাদা বাহিনী এম. এফ গড়ে তোলা হয়। এই বাহিনীকে (এফ.এফ) মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের বিরুদ্ধে স্থাপন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে এর পরিণতি ভয়াবহ আকার ধারণ করত। এম.এফ বাহিনীকে কেন্দ্র করে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যেই সংঘাত সংঘর্ষ দানা বেঁধে উঠেছিল। বাংলাদেশে পরবর্তীকালে বিভিন্নক্ষেত্রে তার প্রতিফলন দেখা গেছে। এসব সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ে আওয়ামী বুদ্ধিজীবীরা অতীতে যেমন নীরব ছিলেন, বর্তমানেও সে নীরবতা অব্যাহত আছে।

প্রবাসী সরকারের মধ্যে যে চরম অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল, সেসব ব্যাপারেও এই সব বুদ্ধিজীবী নীরবতা পালন করে চলেছেন। সংসদ সদস্য চিত্তরঞ্জন সূতারের নেতৃত্বে যে ৪২ জন আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ নেতা প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে ভারত সরকারকে কোনো প্রকার সহায়তা না করার আবেদন করেছিলেন, কিংবা খন্দকার মোশতাকের সরাসরি ওয়াশিংটন ও ইসলামাবাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন অথবা মিজানুর রহমান চৌধুরী ও শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনকে পদত্যাগের চাপসহ প্রবাসী সরকারের বিরুদ্ধবাদীদের কথা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক ঘটনার আগে এসব বুদ্ধিজীবীর কলম থেকে বের হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বিশিষ্ট কথাশিল্পী অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছিলেন 'সাম্প্রদায়িকতা ঠেকানো না গেলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও প্রগতি দুই-ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' ২৯তম বিজয় দিবসে এসে আমরা কি উচ্চকণ্ঠে বলতে পারি সাম্প্রদায়িকতার বিনাশ ঘটেছে? না। বলতে পারি না। বরং সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা শতগুণে বিস্তার লাভ করে প্রগতির ধারাকে চরমভাবে বিনষ্ট করেছে। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বের দাবিদার যে সরকার বর্তমানে ক্ষমতায় সে সরকারই কেবল ক্ষমতার জন্য ধর্মান্ধতার পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত। এই সরকারের মন্ত্রিসভায় দুজন রাজাকার সগৌরবে অবস্থান করছেন। মুক্তিযুদ্ধের যে মূল চারস্তম্ভ—বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র সামরিক আইনে পবিত্র সংবিধান থেকে নির্বাসনে প্রেরণ করা হয়েছিল সেগুলো সংবিধানের সাথে এখনো যুক্ত করা হয়নি। বাতিল করা হয়নি অষ্টম সংশোধনীর মতো প্রগতিবিরোধী কালো ধারা। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিল প্রগতির পক্ষে এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলার দৃঢ় অঙ্গীকার। সে অঙ্গীকার রক্ষা হয়নি বলেই ৩০ লাখ শহীদের রক্ত আর ২ লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে পাওয়া 'জাতীয় পতাকা আজ খামচে ধরেছে বিদেশী শকুন।' জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে লেখা হচ্ছে প্যারোডি।

ঊনত্রিশ বছর পর বিজয়ের এই দিনে রক্তে আর হিল্লোল জাগে না। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় স্মৃতি আর দেহ-মনকে উদ্বেলিত করে না বরং বিপন্ন করে, হতাশাগ্রস্ত করে। কেননা মুক্তিযুদ্ধের সহযোদ্ধা আব্দুস সোবহানকে

বিনা চিকিৎসায় অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছি। ময়না মিয়া, মনু মিয়া, নজিব উল্লাহসহ অনেক সাথী বীরমুক্তিযোদ্ধাকে অনাহার আর দরিদ্রতার সাথে প্রতিদিন যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে দেখেছি। মুক্তিযুদ্ধের বীর সংগঠক এম.এ. গফুরের নির্যাতন ভোগের দৃশ্য নিজ চোখে দেখেছি। শহীদকে যারা পাকবাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে নিজেরা নিরাপদ থাকতে চেয়েছিল, স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের গৌরবময় অবস্থান হৃদয়ে রক্তক্ষরণের মতো কষ্ট দেয়। প্রবাসে এসে দেখলাম, একাত্তরের ঘাতক-দালাল যারা বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের ঘর থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করেছিল তারা যুক্তরাজ্যে সংগঠিত এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। পাকিস্তানিদের জারজ কিছু বাঙালি সন্তান বাংলাদেশকে পুনরায় পাকিস্তান বানানোর দিবাস্বপ্ন দেখছে এবং প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। তখন বিজয় দিবসের আনন্দ ম্লান হয়ে যায়। প্রতিপক্ষ যখন রণহুংকার ছাড়ছে, তখন স্বাধীনতার পক্ষের দাবিদার মানুষগুলো সংবর্ধনা আর দেশ থেকে যুক্তরাজ্য সফরে আসা নেতা নেত্রীদের কৃপাদৃষ্টি লাভের প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ঊনত্রিশতম বিজয় দিবসে আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোকে ফিরে দেখা। মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে আমাদের যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল সে ঐক্য বিনষ্টের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলো খুঁজে বের করা জরুরি হয়ে পড়েছে। প্রকৃত ইতিহাসের মুখোমুখি হয়ে ইতিহাস থেকেই আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে। কেননা মুক্তিযুদ্ধ ছিল আমাদের গৌরবের, শৌর্যের, ভালোবাসার, মহত্ত্বের, ত্যাগের এবং আত্মবলিদানের। এসব গুণের সামনে এনে বিজয় দিবসের মূল্যায়ন করতে হবে। নাচোলের রানীমা, সাঁওতাল বিদ্রোহের সাহসী নেত্রী ইলা মিত্রের ভাষায় আমাদেরকে সমস্বরে উচ্চারণ করতে হবে 'আমার হৃদয়ে বাংলাদেশ জেগে থাকে প্রতিনিয়ত'। এই জাগ্রত উচ্চারণই আমারদেরকে আবার মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনের মতো এক মোহনায় মিলিত করতে সাহায্য করবে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন এবং মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠসময়। মহান মুক্তিযুদ্ধ, তার ইতিহাস এবং শিক্ষা আমাদের প্রেরণার উৎস। বাঙালিরা বারবারই বিজয়ী এ কথা প্রমাণিত সত্য। নেতাদের ঐক্য কোনো সুফল বয়ে আনে না। এই ঐক্য

ক্ষমতার সিঁড়িতে আরোহণের একটি বাহন মাত্র। কিন্তু জনতার ঐক্য ইতিহাস সৃষ্টি করে। যেভাবে বাংলার মানুষ একাত্তরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, এই অমানিশার অন্ধকার থেকে মুক্তিলাভ করতে হলে জনতার ঐক্য অবশ্যম্ভাবী। জনতার কণ্ঠ থেকেই উচ্চারিত হতে হবে আরেকটি মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল পাক বর্বর হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। এবারের মুক্তিযুদ্ধের শত্রু-মিত্র আমাদের অচেনা নয়। শত্রুচিহ্নিত। আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে একাত্তর সালের ঘাতক-দালাল এবং গত ২৯ বছরে জন্ম নেয়া জনতার অধিকার হরণকারী গণদুশমন বাংলাদেশের প্রগতির বিরোধী আগাছাগুলো পরিষ্কার করার দৃপ্ত শপথ হোক এবারের বিজয় দিবসের অঙ্গীকার। গণমানুষের কবি দিলওয়ারের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তাই ২৯তম বিজয় দিবসে সমস্বরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোক 'রাজধানীতে কুকুরের উৎপাত বেড়েছে, এবার শুরু হোক কুকুর নিধন অভিযান।'

১৩.১২.২০০০

পাকিস্তানি পতাকা জ্বালানোর ঘটনাটি শমসেরনগরেই ঘটে

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু বাঙালি জাতির দুর্ভাগ্য যে, মুক্তিযুদ্ধের গৌরব আর ইতিহাস নিয়ে বিতর্কের অবসান আজো ঘটেনি। রাজনীতির প্রয়োজনে যেমন এই বিতর্ক বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে, তেমনি এমন অনেক লোক আছেন যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন, তারা এখন দেশে-বিদেশে ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে অথবা নিজেরাই নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের নায়ক হিসেবে পরিচিত করে ফায়দা লোটার জন্য মুক্তিযুদ্ধের রূপকথা রচনা করে সে বিতর্ক আরো প্রসারিত করছে। ফলে যে যার সুবিধামতো বিজয় দেখেছেন, আর এই দেখার মধ্যে নিজের কৃতিত্বের ভাগই বেশি তুলে ধরে ইতিহাসে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছে। কালের পাতার অনেক লেখাই মুছে যায়। আর এমন বহু লেখা আছে যা কোনোদিনই মুছে যায় না। কাহিনীর পর কাহিনী লেখা হয় এবং ইতিহাস গড়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধের সেসব লেখা ইতিহাসে সুকীর্তির কাহিনী খুব কম। মুক্তিযুদ্ধের লিখিত ইতিহাসে সুকীর্তির কাহিনীর তুলনায় দুষ্কৃতির কাহিনী অনেক বেশি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখতে গিয়ে অনেকেই শঠতা ও স্বার্থপরতার আবর্ত থেকে মুক্ত হতে পারেননি বলেই সুকীর্তির কাহিনীর সংখ্যা কম। অনেক ক্ষেত্রে সুকীর্তির কাহিনী বা ঘটনা অসত্য-মনগড়া, বানোয়াট রূপকথার কল্প-কাহিনীর ভিড়ে হারিয়ে গেছে। যেমন হারিয়ে গেছে তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী আবদুর রহিম ও নারায়ণচন্দ্র দেবনাথের মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার শমসেরনগর পুলিশ ফাঁড়িতে পাকিস্তানি পতাকা জ্বালিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের নজিরবিহীন ঘটনার ইতিহাস।

১৯৭০ সালের ৫ মার্চ বিক্ষুব্ধ ছাত্রজনতার মিছিল শেষে শমসেরনগর চৌমুহনীতে অবস্থান নিয়ে আবদুর রহিম ও নারায়ণচন্দ্র পুলিশ ফাঁড়িতে প্রবেশ করে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে সে পতাকা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে সেখানে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করার ঘটনা শুধু মৌলভীবাজার নয়, তৎকালীন সময়ে সারা পাকিস্তানের মধ্যে এক বিরল এবং একমাত্র ঘটনা হিসেবে স্বীকৃত। এই পতাকা জ্বালানোর অভিযোগে ১৯৭০ সালের ৬ মার্চ ভোররাতে আবদুর রহিম ও নারায়ণকে গ্রেফতার করে প্রথমে শমসেরনগর পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী রহিম ও ছাত্রলীগ কর্মী নারায়ণকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে, এ খবর প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে ছাত্রজনতা পুলিশ ফাঁড়িতে ভিড় জমাতে থাকলে মৌলভীবাজারের সার্কেল ইন্সপেক্টর তাদেরকে তড়িঘড়ি করে মৌলভীবাজার থানা হাজতে নিয়ে যান। সেখানে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদেরকে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়। ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী আবদুর রহিম দুদ মিয়া ও ছাত্রলীগ কর্মী সত্যেন্দ্র দেবনাথ নারায়ণকে গ্রেফতারের ঘটনায় শমসেরনগর এলাকা প্রতিদিনই বিক্ষোভ সমাবেশ আর প্রতিবাদসভায় মুখরিত হয়ে ওঠে। অবশেষে রহিম ও নারায়ণের মুক্তির দাবিতে মৌলভীবাজার মহকুমা হাকিমের অফিস ঘেরাও করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯৭০ সালের ১২ মার্চ সকালে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের এক বিরাট মিছিল তৎকালীন কমলগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক এম.এ. গফুর (এলাকার মানুষের কাছে যিনি নেতা গফুর হিসেবে সুপরিচিত) ও জননেতা মোহাম্মদ ইলিয়াসের নেতৃত্বে সকালে রওনা হয়ে পায়ে হেঁটে ১২ মাইল রাস্তা অতিক্রম করে বিকেল তিনটায় মৌলভীবাজার মহকুমা হাকিমের কার্যালয় প্রাঙ্গণে অবস্থান গ্রহণ করে। সেখানে জননেতা আজিজুর রহমান ও তোয়াবুর রহিমের নেতৃত্বে মৌলভীবাজার জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অপর একটি মিছিল মিলিত হয়ে রহিম ও নারায়ণের মুক্তির দাবিতে স্লোগান উচ্চারিত হতে থাকে। মৌলভীবাজারের এসডিও'র দায়িত্বে ছিলেন মি. নাসিম ওয়াকার নামের এক পাঞ্জাবি অফিসার। রহিম ও নারায়ণের মুক্তি না দিলে জনতা এসডিও'র কার্যালয় প্রাঙ্গণ ত্যাগ করবে না এই ঘোষণা দেয়ার পর তিনি রহিম ও নারায়ণকে মুক্তির দাবি

মেনে নেন। এরপর জনতা এসডিও'র কার্যালয় প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে মিছিল সহকারে আবার শমসেরনগর ফিরে আসে।

মৌলভীবাজার মহকুমা হাকিমের অঙ্গীকার অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ১৩ মার্চ রহিম ও নারায়ণকে মুক্তি দেয়া হয়। ১৯৭০ সালের ১৪ মার্চ সদ্য কারামুক্ত আবদুর রহিম দুদ মিয়া ও সত্যেন্দ্র দেবনাথ নারায়ণকে নিয়ে শমসেরনগর বাজারে এক বিরাট লাঠিমিছিল ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কমলগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি গুলজার আহমদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য তোয়াবুর রহিম, মোঃ জামাল, মোহাম্মদ আলী, এম.এ. গফুর প্রমুখ। তারপর প্রতিদিনই মিছিল আর জনসভায় মুখরিত হয়ে উঠে শমসেরনগর। মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র যুদ্ধের সূত্রপাত হয় এই শমসেরনগর থেকেই। ২৫ মার্চ গণহত্যা শুরুর পূর্বমূহূর্তে মেজর খালেদ মোশাররফকে শমসেরনগর বিমানঘাঁটিতে প্রেরণ করা হয়। এ সময় ১০ম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একদল সৈন্য ক্যাপ্টেন গোলাম রসুলের নেতৃত্বে মৌলভীবাজার জেলা সদরে অবস্থান করছিল। ২৬ মার্চ গণহত্যার সংবাদ পেয়ে মেজর খালেদ মোশাররফ পাকবাহিনীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে জনতার সাথে মিলিত হন। পাক বর্বর-বাহিনীর গণহত্যার প্রতিবাদে ২৭ মার্চ প্রায় বিভিন্ন গ্রামে থেকে জনতা লাঠিমিছিল করে শমসেরনগর এসে বিক্ষোভ সমাবেশে মিলিত হয়। ক্যাপ্টেন গোলাম রসুল এই খবর পেয়ে শমসেরনগর আসে এবং মিছিলের উপর গুলি বর্ষণ করলে সিরাজুল ইসলাম নিহত হন। এই হত্যার ঘটনায় এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ২৮ মার্চ প্রায় ১০ হাজার বিক্ষুব্ধ জনতার জমায়েত ঘটে শমসেরনগরে। বিভিন্ন সীমান্ত ফাঁড়ি থেকে বাঙালি ইপিআর সেনা জনতার সাথে মিলিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। বিকাল ৪টায় ক্যাপ্টেন গোলাম রসুলের নেতৃত্বে একদল পাকসেনা জনতার প্রতিরোধ থেকে শমসেরনগর মুক্ত করার জন্য আক্রমণ চালায়। জনতার প্রতিরোধের মুখে গোলাম রসুলসহ ৯ জন পাকসেনা নিহত হয় এবং ৩ জন পালাতে গিয়ে জনতার হাতে ধরা পড়ে প্রাণ হারায়। ২৯ মার্চ পাক-বাহিনী শমসেরনগর এলাকায় জঙ্গি বিমান থেকে ব্যাপক বোমা বর্ষণ করে। এই বোমাবর্ষণে অনেক বেসামরিক লোক প্রাণ হারান। এরপর পাক-বাহিনী শমসেরনগর

জবরদখল করে নির্বিচারে নির্যাতন, হত্যা-ধর্ষণ আর অগ্নিসংযোগ করে ধ্বংসলীলা চালাতে থাকে। পাক বর্বরবাহিনীর এই বর্বরতা চলে পুরো নয় মাস। শমসেরনগর বিমানবন্দর বধ্যভূমি এখনো সে বর্বরতার সাক্ষী হয়ে রয়েছে। পাক বর্বর-বাহিনীর অত্যাচারে জননেতা এম.এ. গফুরসহ প্রতিরোধযুদ্ধের সবাই বাধ্য হয়ে ভারত চলে যান। রহিম এবং নারায়ণও ভারত চলে যেতে বাধ্য হন।

শমসেরনগরে পাকিস্তানি পতাকা জ্বালানোর এই সংবাদ ঢাকা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক পাকিস্তান*, *দৈনিক আজাদ*সহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও আঞ্চলিক পত্রিকায় গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকার ১৯৭১ সালের ৪ নভেম্বর সংখ্যায় তৃতীয় পৃষ্ঠায় 'সামরিক আদালতে হাজিরের নির্দেশ' শীর্ষক এক সংবাদ-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, মৌলভীবাজার ৪নং সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতের প্রেসিডেন্ট এমএলআর ১৬ এর অধীনে ৬ মার্চ কমলগঞ্জ থানার ১ নং মামলার দুজন আত্মগোপনকারী অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ১০ দিনের মধ্যে তার সামনে হাজির হয়ে তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের জবাব দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় তাদের এমএলআর ৪০ মোতাবেক বিচার করা হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন: (১) নারায়ণচন্দ্র দেবনাথ ওরফে সত্যেন্দ্র দেবনাথ, পিতা মৃত বৃন্দাবনচন্দ্র দেবনাথ, শমসেরনগর, থানা– কমলগঞ্জ, জেলা সিলেট এবং (২) আবদুর রহিম ওরফে দুদ মিয়া, পিতা কনা মিয়া ওরফে খলিলুর রহমান, শমসেরনগর, থানা কমলগঞ্জ, জেলা সিলেট।' এই বিজ্ঞপ্তি যখন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন রহিম আর নারায়ণ বাংলাদেশকে হানাদারমুক্ত করার জন্য জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করে চলেছেন। রহিমকে না পেয়ে পাকবাহিনী তার পিতা খলিলুর রহমানকে ধরে নিয়ে যায় এবং ৭ দিন আটক রেখে অমানুষিক নির্যাতন করে ছেড়ে দেয়। জননেতা এম. এ. গফুরের পিতা এবং দুভাইকে পাকবাহিনী ধরে নিয়ে হত্যা করে।

মৌলভীবাজার তথা সিলেট বিভাগে পাকিস্তানি পতাকা জ্বালানোর দ্বিতীয় কোনো নজির না থাকলেও নব্য কিছু ইতিহাস রচয়িতা নগদ নারায়ণীর বিনিময়ে ইতিহাসের নামে নতুন নতুন পাকিস্তানি পতাকা জ্বালানোর রূপকথার কাহিনী রচনা করে ব্যক্তিবিশেষকে ইতিহাসের

দেয়ালের নিচ দিয়ে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে অনুপ্রবেশের ব্যর্থ চেষ্টা করছেন এবং পাকিস্তানি পতাকা জ্বালানোর আসল নায়ক, যারা কর্মের মাধ্যমে নিজেরাই ইতিহাসের অংশ হয়ে আছেন সেই রহিম ও নারায়ণের নাম উল্লেখ করতে চরম কার্পণ্য প্রদর্শন করেছেন। তাদের লেখা যে প্রকৃত ইতিহাস নয়, গোয়েবলসীয় প্রচারণা মাত্র এতে কোনো সন্দেহ নেই। কেউ যদি নীরবে পাকিস্তানি পতাকা জ্বালানোর নাটক করে ইতিহাসে নিজের স্থান করে নিতে চায়, তা হবে হাস্যকর এবং এমন হাস্যকর ঘটনাকে ফলাও করে লেখা হয়েছে। লন্ডনে বসে এই সব হাস্যকর ঘটনাকে যারা ইতিহাস হিসেবে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন, তারা কিন্তু পতাকা জ্বালানোর মূল ইতিহাসের নায়ক আবদুর রহিম দুদ মিয়াকে খুঁজে বের করার কোনো প্রয়োজন মনে করেননি। অথচ আবদুর রহিম দীর্ঘদিন ধরে লন্ডনেই বসবাস করেছেন। অনেক খোঁজাখুজির পর আবদুর রহিমের সাথে আলাপ হয় এবং তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, পাকিস্তানি পতাকা জ্বালানোর ঘটনা বাংলাদেশে একটিই ঘটে, আর সে ঘটনার নায়ক তিনি ও নারায়ণ। এই ঘটনায় পাকিস্তান সামরিক আদালতে একটি মামলাও হয়েছিল। সে মামলার আসামি হিসেবে আদালতে হাজির হওয়ার বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৭০ সালে আবদুর রহিমের বয়স ছিল ১৮ বছর। এখন তিনি ৪৯ বছরের প্রৌঢ়। একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনি এখনো গর্ববোধ করেন। আর নায়ায়ণ দেশে ফিরে আসলেও স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে বসবাস করতে পারেননি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার হাত বদল হওয়ার পর তাকে নিরাপত্তার জন্য ভারত চলে যেতে হয়।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের বর্তমান চেয়ারম্যান আব্দুল আহাদ চৌধুরী মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার বাসিন্দা হলেও তার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাজীবনসহ যৌবনের অধিকাংশ সময় ছিলেন শমসেরনগরের বাসিন্দা। মুক্তিযোদ্ধা এই পরিচয়ে শমসেরনগর, ঢাকা এবং কানাডায় বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদের অধিকারী তিনি। কিন্তু এলাকার গরিব মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তার কোনোদিন কোনো দায়বদ্ধতা যেমন ছিল না, এখনো নেই। শমসেরনগরের সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ময়না মিয়া কপর্দকশূন্য অবস্থায় মারা গেছেন, আব্দুস সোবহান বিনা চিকিৎসায় মারা

গেছেন। নজিব আলী, মনু মিয়া চরম দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে অনাহারে অর্ধাহারে ধুঁকে ধুঁকে মরছেন। তাদের দেখার কেউ নেই। পত্রিকায় সাহায্যের আবেদন নিয়ে যখন কন্যাদায়গ্রস্ত অসহায় মুক্তিযোদ্ধার চিঠি প্রকাশিত হয়, তখন মুক্তিযোদ্ধা নামধারী আমলা কিংবা বিত্তবানদের হৃদয়ে কোনো সাড়া জাগে না। কিন্তু যারা স্বৈরাচারী এরশাদকে কেবল মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নেতৃত্বে টিকে থাকার জন্য রণবীর উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, তাদের সাহায্যার্থে প্রবাসে আপিল ফান্ড গঠন করে যখন চাঁদা তোলা হয় এবং সে চাঁদা আদায়ের জন্য রাষ্ট্রদূত নামের আমলার মুখে সুবচন বর্ষিত হয়, তখন তাকে কেবল ক্রীতদাসের হাসির সাথেই তুলনা করা যায়। পঙ্গু বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশাররফ, হায়দার, কর্নেল জামিলকে, ১২ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়েছে, আরো কত নাম না-জানা মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নেতাদের কোনো প্রকার প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি। যে নেতা না জন্মালে মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত হতো না, সেই মহান নেতা স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পরও আমরা নীরব থেকেছি, প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারিনি। সেখানে আবদুর রহিম আর নারায়ণের অবদানকে অস্বীকার করা স্বাভাবিক। তাই ড. মুনতাসীর মামুনের ভাষায় বলতে হয়, 'একজন মুক্তিযোদ্ধা চিরদিন মুক্তিযোদ্ধা থাকতে পারে না যদি তিনি মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে না অটল থাকেন।' মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ থেকে বিচ্যুত মুক্তিযোদ্ধা রাজাকার থেকেও যে ঘৃণিত এ সত্য বারবার প্রমাণিত হয়েছে।

২১.০৫.২০০১

স্বাধীনতার শত্রু-মিত্র

বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। ছাব্বিশ মার্চ ২০০১ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৩০তম বার্ষিকী উদযাপিত হলো সরকারি বেসরকারি আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে। সাহসী যৌবনের অধিকারী যে সকল তরুণ মুক্তিযোদ্ধা দেশকে হানাদারমুক্ত করার জন্য আত্মত্যাগ, আত্মউৎসর্গ আর আত্মবলিদানের প্রতিযোগিতায় জীবন দান করেছেন তাদের অনেকেই আজ বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেছেন। আর যারা সেদিনের স্মৃতি ধারণ করে এখনো জীবিত আছেন তারা পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রৌঢ়। আজ অবাক বিস্ময়ে সেসব মুক্তিযোদ্ধা দেখেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিপক্ষ ঘাতক-দালাল-জল্লাদ গোলাম আজম, নিজামী, মান্নান, খালেক, মুজাহিদ, কামারুজ্জামানরা স্বাধীনতার চেতনার কথা বলে বাংলাদেশকে তালেবানী রাষ্ট্র বানানোর ঘোষণা দেয়। অথচ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যাশা ছিল এইসব নরঘাতকের বিচার হবে বাংলার মাটিতে। কিন্তু কেউ কথা রাখেননি। 'ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল' কিংবা 'টোকিও ট্রায়াল'-এর মতো বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার জন্য ১৯৭৩ সালের ১৯ জুলাই জাতীয় সংসদে 'আন্তর্জাতিক ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট ১৯৭৩' পাস হয়, যা অ্যাক্ট ১৯ হিসেবে পরিচিত। এই অ্যাক্টের আওতায় ঘাতক-দালালদের বিচারের জন্য দালাল আইন তৈরি করা হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু নিজেই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার ফলে দালাল আইনের বিলুপ্তি ঘটে। তবে যুদ্ধাপরাধ অ্যাক্ট ১৯ বাতিল করেননি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাই বলে তিনি গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, নারী নির্যাতনসহ যুদ্ধাপরাধকে ক্ষমা করেননি। বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমতার অংশদারিত্ব দিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত করেন সেনাশাসক জিয়াউর রহমান ও জেনারেল এরশাদ। ১৯৭৫ সালের ১৫

আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে পরিবর্তন সূচিত হয়, সেসব ঘটনার নেপথ্য ভূমিকায় যে জিয়া ও এরশাদের কালো হাতের ইঙ্গিত ছিল, তা এখন আর কোনো গোপন বিষয় নয়। জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদ ১৫ আগস্টের ঘটনার সবচেয়ে বড়ে বেনিফিসিয়ারি। তাই এই দুই সেনাশাসক ১৫ আগস্টের ঘাতকদের সরকারি উচ্চপদ দিয়ে কর্নেল তাহেরসহ অগণন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে যেমন নিধন করেন, তেমনি বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানকে সামরিক অধ্যাদেশ বলে বারবার ছুরিকাঘাত করে ক্ষতবিক্ষত করে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা কায়েম করেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে কেবল ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জেনারেল জিয়া আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, তার সাথে কেবল মীর জাফর, মার্শাল পেঁতা আর কুইসলিংয়ের বিশ্বাসঘাতকতার তুলনা চলে। আর জেনারেল এইচ এম এরশাদ, যিনি ভণ্ড, প্রতারক এবং বিশ্ববেহায়া হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত তার কাছে সুবচন প্রত্যাশা করা বোকামি ছাড়া আর কী হতে পারে? ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই দুই সেনাশাসক তাদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা থেকে একে-একে মুক্তিযুদ্ধের সব আদর্শ নির্বাসনে প্রেরণ করেন এবং বাংলাদেশে একাত্তরের ঘাতক-দালালদের রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করেন। রাষ্ট্রীয় আনুকল্য পেয়ে বাংলাদেশ হয়ে ওঠে ঘাতক-দালালদের অভয়ারণ্য।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের জনগণ দ্বিতীয় বিজয় অর্জন করেন। এই বিজয়ের মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশা ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বৈরাচারের চিরপতন হবে এবং মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার আর্দশ আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বেগম খালেদা জিয়া কিংবা শেখ হাসিনা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দেন।

শহীদ জননী জাহানারা ইমাম বাংলাদেশের নেতা-নেত্রীদের আপসকামিতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে একাত্তরের ঘাতক-দালালদের বিরুদ্ধে

রীতিমতো বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাসী জনতা অন্ধকারে আলোর সন্ধান খুঁজে পান। মুক্তিকামী জনতা দলমত ভুলে গিয়ে শহীদ জননীর নেতৃত্বে আস্থা প্রকাশ করে গণজাগরণ গড়ে তোলেন। রাষ্ট্র যা করতে সাহস করেনি, শহীদ জননী একাই জনগণকে সাথে নিয়ে গণআদালত গঠন করে একাত্তরের ঘাতক-দালালদের বিচার করে রায় ঘোষণা করেন। কিন্তু কালব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ফলে শহীদ জননী ঘাতকদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, সে যুদ্ধ শেষ করে যেতে পারেননি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পর যে মহান নেত্রী স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রশ্নে বাঙালি জনতাকে ঘাতক দালালদের বিরুদ্ধে রখে দাঁড়ানোর সাহস জুগিয়েছিলেন এবং একমঞ্চে সমবেত করেছিলেন, তাঁর প্রস্থানের পর সে গণজাগরণ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো কোনো সাহসী নেতা-নেত্রীর আবির্ভাব হয়নি। বেগম জিয়া তখন ক্ষমতায় থাকলেও তিনি তাঁর স্বামী জেনারেল জিয়ার আদর্শ অনুসরণ করে শহীদ জননীর আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে গোলাম আজমসহ একাত্তরের ঘাতক-দালালদের পক্ষে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন এবং শহীদ জননীসহ অন্যদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দায়ের করেন। সে মামলা মাথায় নিয়ে শহীদ জননীকে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়। শেখ হাসিনা শহীদ জননীর সে আন্দোলন প্রথমে পূর্ণ সমর্থন করেন এবং এর ফলে আন্দোলনে বেগবান ধারা সৃষ্টি হয়। কিন্তু শহীদ জননীর মৃত্যুর পর সে বেগবান ধারা আর অটুট থাকেনি। কেবল ক্ষমতার জন্য শেখ হাসিনা গোলাম আজমকে কুরআন শরীফ উপহার দিয়ে আপসরফা করেন এবং জামায়াতকে সঙ্গে নিয়ে সব নীতি আদর্শ বিসর্জন দিয়ে বেগম খালেদা জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে পড়েন। জামায়াত একাত্তরে তাদের গায়ে লেগে থাকা ঘাতক-দালালের দগদগে ঘা নিরাময়ের জন্য শেখ হাসিনার ছায়াতলে আশ্রয় নিতে কোনো কুণ্ঠাবোধ করেনি। যেভাবে বর্তমানে বেগম খালেদা জিয়ার আশ্রয়ে শেখ হাসিনা সরকরের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে তাদের শরমলজ্জার কোনো বালাই নেই। বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার আশ্রয়-প্রশ্রয়ে জামায়াত এবং তাদের সহযোগীরা শক্তি সঞ্চয় করে বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা করে চলেছে।

কিন্তু কেন ঘাতক-দালালদের এই হুংকার? এর উত্তরে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতার শত্রু চিহ্নিত করতে পারলেও আমরা তাদেরকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারিনি। আমরা তাদের বিচার না করে দুধকলা দিয়ে কেউটে সাপ পুষেছি। তাই ধর্মীয় লেবাসে ধর্মকে পুঁজি করে বেঁচে থাকা এসব বিষধর সাপ প্রতিনিয়ত ছোবল মারার চেষ্টা করছে। খনার বচন—সাপুড়ে নিজের পোষা সাপের ছোবলে মারা যায়, কোড়া শিকারি বাঘের খাদ্য হয় আর হাতির মাহুতকে তার নিজের পোষা হাতির শুঁড়ের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে প্রাণ দিতে হয়। খনার এই মর্মান্তিক সত্য বচন থেকে শিক্ষা না নেয়ার কারণে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে এরূপ ঘটনা হরহামেশাই ঘটে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাবিরোধীদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন তার মহানুভবতার কারণে। কিন্তু তাঁর মর্মান্তিক হত্যার পর ক্ষমাপ্রাপ্ত এসব ঘাতক-দালাল বেশি উল্লাস প্রকাশ করেছিল এবং এখনো তাদের সে উল্লাস প্রকাশে ভাটা পড়েনি। জিয়া হত্যার জন্য তারা দুঃখ প্রকাশ করেনি এবং কোনদিন জিয়া হত্যার বিচার দাবি করেনি। বেগম জিয়া ও শেখ হাসিনা যদি এই দুটি ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করেন, তা হলে তাদের একদিন এজন্য খেসারত দিতে হবে—এ সত্য যেন তারা ভুলে না যান। তাই বলব, স্বাধীনতার এই ত্রিশ বছরে প্রাপ্তির চেয়ে আমাদের রিক্ত ও নিঃস্ব হওয়ার তালিকা অনেক দীর্ঘ। আর এজন্য দায়ী আমাদের আপসকামী ও সুবিধাবাদী নেতৃত্ব। আমাদের এই নেতৃত্বের শূন্যতার যে শোকসভা লাগাতারভাবে চলছে, তার অবসান না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এই অনিশ্চিত যাত্রার শেষ হবে না। বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনতা এখন ছিনতাই হয়ে যাওয়া বিমানের যাত্রী, কিন্তু মুক্তিপণ দেয়ার কেউ নেই। মওলানা ভাসানী কিংবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো যদি বজ্রহুংকারে উচ্চারিত হয় 'খামোশ' অথবা 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম' তা হলে মুক্তি আসতে পারে। নতুবা ছিনতাইকারীদের হাতে নিজেদের জীবন দেয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনতার বিরল ঐক্যের ফসল। সে ঐক্য ধরে রাখা যায়নি বলেই আজকের এই পরিণতি। তাই বাংলাদেশের রাজনীতিতে বর্তমানে 'রাজনীতির' বড় অভাব। এই যে কপট অবস্থান

এবং রাজনীতিকে অরাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টার, ফলে অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানসমূহ। তারা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রতিও হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। এর কারণ কী? কারণ এ দেশের সব আন্দোলনের নেতা নিয়ন্ত্রক শিক্ষিত সমাজ। ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষিতরাই সুফল ভোগকারী। আমাদের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে এই শিক্ষিতরাই ছিলেন অগ্রবাহিনী। যে কারণে স্বাধীনতা লাভের পর এই শিক্ষিত সমাজ তথা ছাত্র, রাজনৈতিক নেতা আর বুদ্ধিজীবীরা হয়ে যান স্বাধীনতার নায়ক নায়িকা ভিলেন সবকিছু। বুদ্ধিজীবীরা রণাঙ্গনে গিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, কিন্তু নিরাপদ দূরত্বে থেকে বিজয় দেখেছেন। লিখেছেন ব্যক্তিস্মৃতিতে ভরপুর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। এভাবে নিজেদের প্রকাশের জন্য নিজের কথা লেখা হয়েছে অনেক। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ আর মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে কেউ ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেননি। মুক্তিযুদ্ধে কৃষক, ক্ষেতমজুর এবং শ্রমিকদের যুদ্ধের ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য জেনারেল জিয়ার পরিবার ঢাকার দুটি অভিজাত এলাকায় প্রায় ১০ কোটি টাকার দুটি বাড়ি পান। কিন্তু সোবহান, মনু, শংকর, পবন তাঁতী, ময়না মিয়া, নজিব আলীরা গৃহহারা, অন্নহীন। তাদের খবর কেউ রাখার প্রয়োজন বোধ করেন না। আহাদ চৌধুরী মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন বলে গাড়ি বাড়ি মার্কেটসহ কোটিপতি হলেন। কিন্তু ময়না মিয়া আর সোবহানরা বিনা চিকিৎসায় মারা যান; আহাদ চৌধুরীরা একবার ফিরেও তাকান না। অথচ এরাই একদিন তার রণাঙ্গনের সাথী ছিলেন। ত্রিশ বছর চলে গেছে; আরো ত্রিশ বছর পর এ দেশে আর কোনো মুক্তিযোদ্ধা খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাদের কথা কেউ আর মনে রাখবেন না। মনে রাখার প্রয়োজনও হবে না। আমরা যেখানে মুক্তিযুদ্ধের শত্রুকে নিয়ে সহাবস্থানের ব্যাপারে লজ্জিত নই, সেখানে মুক্তিযুদ্ধের মিত্র যারা ছিলেন তাদের স্মরণ রাখার দায়ভার থাকার কথা নয়। আমরা এখন আর ভারতের সাহায্য-সহযোগিতার কথা ভুলেও উচ্চারণ করি না; স্মরণ করি না ভারতের মহীয়সী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কিংবা শরণ সিংহের কথা।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রায় সাড়ে চার হাজার সৈন্য যে বাংলার মাটিতে প্রাণ দিয়েছেন হানাদার পাক বর্বর-বাহিনীকে পরাজিত করতে সে

কথা নতুন প্রজন্মের কয়জন জানে? সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো প্রয়োগ না করলে আমরা কি অতিসহজে আমাদের স্বাধীনতা পেতাম? আমাদের স্বাধীনতার আরো অনেক মিত্র ছিলেন, কিন্তু তারা আজ আমাদের হৃদয়ে নেই। আমাদের মিত্রদের দূরে ঠেলে দিয়ে একাত্তরে যারা আমাদের স্বাধীনতাকে রুখার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল আজ তারাই আমাদের মিত্র। হায় ত্রিশ বছরের স্বাধীনতা, হায় দুর্ভাগা দেশ আর দুর্ভাগা জনতা। তাই বলতে চাই 'লেট দেয়ার বি লাইট'—আলো চাই আরো আলো। অন্ধকার থেকে ভোরের সূর্যোদয়, যে সূর্যের উদয় হয়েছিল ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর সকালে।

২৮.০৩.২০০১

শ্রদ্ধাঞ্জলি : স্যার এডওয়ার্ড হিথ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সহযোদ্ধা সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার এডওয়ার্ড হিথ ২০০৫ সালের ১৭ জুলাই ৮৯ বছর বয়সে মারা গেছেন। তিনি ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। স্যার এডওয়ার্ড হিথের মৃত্যুতে ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছেন, একজন মহান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে সবার কাছে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বিরোধীদলীয় নেতা মাইকেল হাওয়ার্ড বলেছেন, বিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধেক সময়ের জন্য স্যার এডওয়ার্ড হিথ ছিলেন একজন রাজনৈতিক মহামানব। সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার বলেছেন, আমরা সবাই তার কাছে ঋণী। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় স্যার এডওয়ার্ড হিথ যে সাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন সেজন্য আমরা বাঙালি জাতিও তাঁর কাছে ঋণী। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সে ঋণ স্বীকারের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যে নেত্রী পাকিস্তানের একজন জেনারেলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে পুষ্পস্তবক প্রেরণ করেন, সে নেত্রীর কাছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অবদানের জন্য স্যার এডওয়ার্ড হিথের ঋণ স্বীকারের প্রশ্ন আসে না, আসতে পারে না। অবশ্য বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা স্যার এডওয়ার্ড হিথের মৃত্যুতে একাত্তরে তাঁর ভূমিকার ঋণ স্বীকার করে আমাদের দীনতা কিছুটা হলেও লাঘব করেছেন।

স্যার এডওয়ার্ড হিথের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হওয়ার পরই স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। বাঙালি জাতির এক সুবর্ণ সময়। এমন সময় হাজার বছরেও আসে না। আমরা যারা একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি কিংবা একাত্তর দেখেছি, আমাদের স্মৃতিতে তো স্যার এডওয়ার্ড হিথের নাম অমর হয়ে আছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বসভায় আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। একাত্তরে

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বে আমরা বীরের জাতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছি। তাই একাত্তর আমাদের সাহসের প্রতীক, এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার চৌত্রিশ বছর পরও দারুণভাবে ইচ্ছে করে ফিরে যেতে সেই দিনগুলোতে। ফিরে যেতে সেখানে, যেখানে ছিল যুদ্ধের সাথে প্রতিদিন বসবাস। যেখানে ছিল নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা, বিভীষিকা আর বীভৎসতা। ছিল হত্যা, মৃত্যু আর রক্তের হোলিখেলা। বড় মন খারাপ করা সময় ছিল একাত্তরের দিনগুলো। সেইসব দিনে সংবাদপত্র, বেতার অথবা টেলিভিশনে বিশ্বনেতৃবৃন্দের মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নি, প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন, বিশ্বের মহান ব্যক্তিদের অন্যতম আঁদ্রে মালরোসহ আরো অনেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি যখন সমর্থন ব্যক্ত করতেন, তখন আমাদের সাহস বেড়ে যেত। আমরা মৃত্যুভয় উপক্ষা করে সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। তাঁরা তখন ছিলেন আমাদের প্রেরণার উৎস, সাহসের হাতিয়ার। সাহসী যৌবনের যেসব তরুণ মুক্তিযোদ্ধা বর্তমানে প্রৌঢ়ত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তাদেরকে, মুক্তিযুদ্ধের মহানায়কদের, একে একে ঘাতকের হাতে নিহত হতে দেখতে হয়েছে। আজ চৌত্রিশ বছর পর 'এই মৃত্যু-উপত্যকা' আমার স্বদেশ নয়। আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম? না, চাইনি। একাত্তরের বর্বর পাক হানাদার ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম, সেই স্বাধীন দেশে প্রত্যাবর্তন করবে পরাজিত হায়েনার দোসররা, তা আমরা ভাবতে পারিনি। পরাজিত সেই শক্তির অবাধ চারণভূমি আজ বাংলাদেশ। শুভবোধ, মুক্তচিন্তা আর সামনে চালার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে তারা। এসব দেখে একাত্তরের সেই যুদ্ধের দিনগুলোতে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে; ইচ্ছে করে রণাঙ্গনের যেসব সহযোদ্ধা এখনো বেঁচে আছেন তাদেরকে নিয়ে আবার দ্রোহী হতে। কিন্তু পারি না। কারণ একদিকে আমরা এখন শতধারায় বিভক্ত। অন্যদিকে বিশ্ব এখন জর্জ ডব্লিউ বুশ আর টনি ব্লেয়ারের নিয়ন্ত্রণে। তাদের কাছে সত্য, সুন্দর আর নৈতিকতা নির্বাসিত। একাত্তরের দুঃসময়ের দিনগুলোতে বিশ্বের রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নিকোলাই

পদগর্নি, প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডালাসহিউম, বিরোধীদলীয় নেতা হেরাল্ড উইলসন বাঙালি জাতির মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন প্রদান করে অমর হয়ে আছেন। বাংলাদেশের পক্ষে ব্রিটেনের সুদৃঢ় অবস্থান নেয়ার কথা অনেক শুনেছি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ২০০২ সালের প্রথম দিকে ব্রিটিশ সরকার ১৯৭১ সালের বিভিন্ন সরকারি নথিপত্র জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ সরকারের সাহসী ভূমিকার কথা বিস্তারিত জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ১৯৭১ সালে ক্ষমতাসীন রক্ষণশীল দলের প্রধানমন্ত্রী হয়েও এডওয়ার্ড হিথ বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন দিয়েছেন। তাঁর নিজ দলের এমপিরা পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলেছেন। কিন্তু বিরোধী লেবার পার্টির এমপিরা সম্মিলিতভাবেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে রাস্তার নেমেছেন, পার্লামেন্টে সোচ্চার হয়েছেন। এ কথা ভাবলে এখন গা শিউরে ওঠে; ১৯৭১ না হয়ে আশি অথবা নব্বইয়ের দশকে যদি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হতো? ১৯৭১ সালে এডওয়ার্ড হিথ ও স্যার ডগলাস হিউম পাকিস্তানের কাছে অস্ত্র বিক্রির সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছিলেন। জাতিসংঘে ভেটো দানে বিরত থেকে সপ্তম নৌবহরের গতিপথে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ব্রিটেনে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীও ব্রিটিশ সরকারের সর্বাত্মক সহযোগিতা লাভ করেন। পাকিস্তানের চরম বিরোধিতার মুখেও বিচারপতি চৌধুরীকে লন্ডনে 'স্বাধীন বাংলাদেশের দূতাবাস' খোলার পরোক্ষ অনুমতি দেয়া হয়।

১৯৭১ সালের ২৭ আগস্ট নটিংহিল এলাকাস্থ বাংলাদেশ সেন্টারে খোলা হয় বাংলাদেশ মিশন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক এন্থনি ম্যাসকারেনহাস, সায়মন ড্রিংসহ তিন শতাধিক বাঙালি। এ খবর পেয়ে যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার সালমান আলী প্রতিবাদ জানাতে ছুটে গিয়েছিলেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দফতরে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সালমান আলীকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন, আমরা দুঃখিত যে বাংলাদেশের পক্ষে এমন একটি কাজ আজ লন্ডনে হচ্ছে। কিন্তু তারা তো

আমাদের কোনো আইন লঙ্ঘন করছে না। পাকিস্তানের হাইকমিশনার সালমান আলীকে এ কথা শুনে ক্ষোভে-দুঃখে বিফল হয়ে ফিরে আসতে হয়। ১৯৭১ সালের ২৭ আগস্ট আর ২০০৫ সালের ১৭ জুন ব্যবধান প্রায় ৩৪ বছর। একটি মানবাধিকার সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ব্রিটেনে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এবং তার সহযোগীরা যে আচরণ করলেন, তার তুলনায় একাত্তরের সালমান আলীর আচরণও হার মানিয়েছে।

মূলত একাত্তরে যুক্তরাজ্য বৃহত্তম কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিদেশে পাকিস্তান মিশনে যে সব বাঙালি কর্মকর্তা কর্মরত ছিলেন, তাদের মধ্যে যারা মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে চাকরি ছেড়েছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই লন্ডনে এসে আশ্রয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে কাজ করেছেন। প্রকাশিত নথিপত্রে দেখা যায়, মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয় মাস প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাসহিউম পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানের উপর বিভিন্ন ধরনের চাপ অব্যাহত রেখেছিলেন। তারা উভয়েই রাজনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধান করার জন্য ইয়াহিয়া খানকে বলেছেন। শুধু এখানেই শেষ নয়, বাংলাদেশ পরিস্থিতির ওপর দুদিন আলোচনা হয় হাউস অব কমন্সে। প্রথম আলোচনা হয় ১৯৭১ সালের ১৪ মে এবং দ্বিতীয় আলোচনা হয় বিরোধীদল লেবার পার্টির দাবিতে ১৯৭১ সালের ১০ জুন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর কার্যত বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও প্রকৃতপক্ষে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন অসম্পূর্ণ থেকে যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি ভোরে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে এসে পৌঁছেন। ব্রিটেন তখনও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। তবুও বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানাতে হিথ্রো বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ ফরেন এন্ড কমনওয়েলথ অফিসের দক্ষিণ এশীয় বিভাগের প্রধান ইয়ান সাদারল্যান্ড। ব্রিটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানে বঙ্গবন্ধুকে বিখ্যাত ক্ল্যারিজেস হোটেলের ১১১ নম্বর ভিভিআইপি সুইটে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী এডওয়র্ড হিথ সেসময় বঙ্গবন্ধুকে যে মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করেছিলেন, তা এখনো ব্যক্তিক্রমী এক ইতিহাস হয়ে আছে। উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধু যেদিন লন্ডন পৌঁছেন তার আগের দিন শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী অবকাশ

যাপনের জন্য চেকার্সে ছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর খবর পেয়ে তিনি সব কর্মসূচি বাতিল ঘোষণা করে ফিরে আসেন দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের সরকারি বাসভবনে। ৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে প্রায় একঘণ্টার অধিক সময় আলোচনা করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ড. কামাল হোসেন। বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধুর সাথে ক্ল্যারিজেস হোটেলে বিরোধীদলীয় নেতা হ্যারাল্ড উইলসন সাক্ষাৎ করেন।

ব্রিটিশ সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি। স্বীকৃতিদাতা দেশ হিসেবে যুক্তরাজ্যের ক্রমিক নম্বর হচ্ছে ২৫। বহির্বিশ্বে প্রথম সরকারিভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয় লন্ডনে। ভারত স্বীকৃতি দেয় ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর, ভুটান ৭ ডিসেম্বর। সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭২ সালের ২৫ জানুয়ারি। আরব দেশসমূহের মধ্যে ইরাক ১৯৭২ সালের ৮ জুলাই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ বঙ্গবন্ধুর দেশে ফেরার জন্য রয়েল এয়ারফোর্সের একটি কমেট জেট বিমানের ব্যবস্থা করেন। সে বিমানে করেই ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু তেজগাঁও বিমানবন্দরে নামলেন সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে।

চিরকুমার এডওয়ার্ড হিথ মারা গেলেন ৮৯ বছর বয়সে। হাউস অব কমন্সের সদস্য ছিলেন ৫১ বছর। স্যার এডওয়ার্ড হিথ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেছিলেন, তাই তিনি আমাদের ইতিহাসের অংশ। বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনতার পক্ষ থেকে স্যার এডওয়ার্ড হিথকে জানাই অভিবাদন এবং প্রাণঢালা শ্রদ্ধাঞ্জলি।

০২.০৮.২০০৫

জল্লাদ এক রাষ্ট্রপতি

জিয়াউর রহমান মেজর থেকে মেজর জেনারেল, সামরিক আইন প্রশাসক থেকে রাষ্ট্রপতি। সামরিক ও বেসামরিক একনায়ক হিসেবে দেশ শাসন করেছেন প্রায় ছয় বছর। জিয়াউর রহমানের এই ছয় বছরের শাসনকাল ছিল একটি অন্ধকারময় অধ্যায়। এই সময়ে নিজের ক্ষমতার ভিত পাকাপোক্ত রাখার জন্য তিনি জল্লাদের ভূমিকা পালন করে হাজার হাজার সেনাসদস্য হত্যা করেন। জিয়াউর রহমানের এই হত্যাযজ্ঞের সাথে হিটলার, মুসোলিনি ও পিনোচের হত্যালীলার তুলনা করা যায়। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর অনুগত থেকে বাঙালি নিধনের জন্য অস্ত্রবোঝাই জাহাজ 'সোয়াত' চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে এসে ভিড়ে। ডক শ্রমিকরা সে জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাস করতে অস্বীকার করেন। তখন পাক বর্বর-বাহিনীর নির্দেশে মেজর জিয়াউর রহমান সেখানে গিয়ে সে জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসের সব প্রতিবন্ধকতা দূর করেন। তারপর কি জন্য যে পটিয়া চলে গেলেন সে রহস্য এখনও অজানা। পটিয়ায় জিয়াউর রহমান অবস্থান করছেন এই খবর পেয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক বেলাল মোহাম্মদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের আহ্বান জানিয়ে জিয়াউর রহমানকে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে নিয়ে যান। বঙ্গবন্ধুর সে ঘোষণা পাঠ করে জিয়াউর রহমান যেমন পরিচিতি লাভ করেন, তেমনি এই ঘোষণা পাঠের সুযোগ পেয়ে তিনি তার লালিত স্বপ্ন অর্থাৎ ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণের কূটকৌশল নিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় জিয়াউর রহমানের বিভিন্ন আচরণে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এম এ জি ওসমানী এবং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং বিভিন্ন সময় শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য তাকে সাবধান করে দেয়া হয়।

জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী সরকারের কাছ থেকে মাসিক ৪০০ টাকা বেতনও নিয়েছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান পদ দখলের জন্য তিনি মরিয়া হয়ে ওঠেন। জিয়াউর রহমানের উচ্চাবিলাসী আচরণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অজানা ছিল না। জেনারেল এম এ জি ওসমানীও তার প্রতি সদয় ছিলেন না। ফলে সেনাবাহিনী প্রধানের পদ পেয়ে যান মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ এবং জিয়াউর রহমানকে ডেপুটি চিফ অব স্টাফ করা হয়। এই নিয়োগ জিয়াউর রহমান কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি। জিয়াউর রহমান নিজেই জানতেন তার বিশ্বস্ততা নিয়ে সরকারের বিভিন্ন মহলে নানা প্রশ্ন রয়েছে। তাই তাকে সেনাবাহিনী প্রধান পদে কখনো নিয়োগ দেয়া হবে না। এ সময় তাকে পূর্ব জার্মানিতে রাষ্ট্রদূত করে পাঠিয়ে দেয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কৌশলী জিয়াউর রহমান সে সময় তোফায়েল আহমদ ও আব্দুর রাজ্জাককে ধরে শেষ মুহূর্তে সেই সিভিল পোস্টিং চাপা দেয়ার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া শফিউল্লাহ ও খালেদ মোশাররফ ছিলেন বঙ্গবন্ধুর খুব কাছের লোক। এদিকে সেনাপ্রধান হিসেবে মেজর জেনারেল শফিউল্লাহর মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ১৯৭৫ সালের মে মাসে আরো তিন বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি তার মেয়াদ বাড়িয়ে দেন। এতে জিয়াউর রহমান খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে বিভিন্ন মহলে দেন দরবার শুরু করেন। জিয়াউর রহমানের এসব বিক্ষুব্ধ আচরণ বঙ্গবন্ধুর কানে গেলে তিনি তাকে রিজাইন করার পরামর্শ দেন এবং ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময় দেয়া হয়। কিন্তু জিয়াউর রহমানকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি। এর আগেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড এবং রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তন সব সমস্যার সমাধান করে দেয়। শুরু হয় জিয়াউর রহমানের ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা। সে যাত্রাপথে জিয়াউর রহমান যাকেই মনে করেছেন প্রতিদ্বন্দ্বী, তাকেই নির্মমভাবে হত্যা করে নিজের যাত্রাপথকে কাঁটামুক্ত করেছেন। সহগোত্রীয়দের রক্ত নিয়ে রক্তের এই হোলিখেলায় 'বাংলাদেশে গণহত্যার কসাই' বলে খ্যাত টিক্কা খানের নৃশংসতাকেও ম্লান করে দেন জিয়াউর রহমান।

সেনাছাউনি থেকে মার্চপাস্ট করে একদল ঘাতক ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে রাষ্ট্রক্ষমতা জবরদখলের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করে। ঘাতকচক্রের বুটের নিচে পিষ্ট হয় ত্রিশ লাখ বাঙালির আত্মবলিদান আর দু'লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের মীমাংসিত সত্য, সুন্দর আর আদর্শের পতাকা। জাতির জনকের রক্তের দাগ শুকানোর আগেই বঙ্গবন্ধু সরকারের মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্য মোশতাকের নেতৃত্বে গঠিত নতুন সরকারে যোগদান করেন। ফলে দেশের জনগণ নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়েন। যে কারণে এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ যেমন গড়ে ওঠেনি, তেমনি ঘাতকচক্র আর বিশ্বাসঘাতকদের ক্ষমতা দখলকেও জনগণ সমর্থন করেননি। দেশের এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগে সেনাছাউনিতে সেনানায়ক জিয়াউর রহমান অতি কৌশলে চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকেন। কালো সানগ্লাসের আড়ালে নিজের হিংস্রতার প্রতীক রক্তপিপাসু চোখ আড়াল করে কীভাবে ক্ষমতার শীর্ষ আরোহণ করা যায় সে ছক আঁকতে থাকেন। পনেরো আগস্টের হত্যাকাণ্ডের সাথে এই চতুর ও কুটিল চরিত্রের অধিকারী সেনানায়ক জিয়াউর রহমান প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও পরোক্ষভাবে যে জড়িত ছিলেন সে তথ্য দেশে-বিদেশে প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি জিয়াউর রহমানের একান্ত ঘনিষ্ঠজন লে. কর্নেল (অব.) এমএ হামিদ পিএসসি'র লেখা 'তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা' গ্রন্থে বর্তমান মহিলা ও শিশুবিষয়কমন্ত্রীর বাসায় অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা প্রণয়নকল্পে অনুষ্ঠিত অনেক গোপনসভায় জিয়াউর রহমান উপস্থিত ছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ঘাতকচক্রের রাষ্ট্রক্ষমতা জবরদখল ছিল সেসব গোপন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। পনেরো আগস্টের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমানের ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণের প্রথম ধাপ অতিক্রম হয় মাত্র। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক মুক্তিযুদ্ধের চারজন সংগঠক ও প্রবাসী সরকারের মন্ত্রী জাতীয় চার নেতা তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও কামারুজ্জামানকে সেনাবাহিনীর একটি ঘাতকদল হত্যা করে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ইতিহাসে এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা এক কলঙ্কময় অধ্যায়। পনেরো আগস্টের হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে

যারা রাষ্ট্রক্ষমতা জবরদখল করে, তাদের স্বার্থ কায়েম ও রাজনৈতিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্যই জেলে চার জাতীয় নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। যাতে সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক কোনোভাবেই পঁচাত্তর পূর্ববর্তী রাজনীতি ও শাসনের প্রত্যাবর্তন না ঘটতে পারে। ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের নায়ক খালেদ মোশাররফ ও শাফায়াত জামিল যাতে কোনোভাবেই সরকার গঠন করতে না পারে সে পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়। পরবর্তী সময়ে জেলহত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় কমিশনের কোনো বৈঠক অনুষ্ঠিত না হওয়ায় সে সত্যই প্রমাণিত হয়েছে। জেল হত্যার মাধ্যমে জিয়াউর রহমান ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণের দ্বিতীয় ধাপ অতিক্রম করেন।

বাংলাদেশে অভ্যুত্থান ও হত্যার রাজনীতির ইতিহাসে ৭ নভেম্বর ও কর্নেল তাহেরের ফাঁসি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে, ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান ৩ নভেম্বরের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী হটাতে সফল হলেও এই অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ও নেতৃত্ব কাঠামোর সাংগঠনিক দুর্বলতা ও আপসকামিতার জন্য এই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয় এবং জিয়াউর রহমান ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণের তৃতীয় ধাপ অতিক্রম করে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। এই অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমানের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী খালেদ মোশাররফ, হায়দারসহ সেনাবাহিনীর বেশ কিছু অফিসার নিহত হন। ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের নেতা কর্নেল তাহের বন্দিদশা থেকে জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে জীবন বাঁচানোর পুরস্কার পেয়েছিলেন ফাঁসির রজ্জু। জল্লাদ জিয়াউর রহমান কেবল কর্নেল তাহেরের বিচারের জন্য তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সায়েমকে দিয়ে 'স্পেশাল মার্শাল ল' ট্রাইব্যুনাল রেজুলেশন ১৯৭৬' জারি করিয়েছিলেন। এই সামরিক অধ্যাদেশ জারির সাথে সাথেই পাকিস্তান ফেরত এক কর্নেলকে দিয়ে সামরিক আদালত গঠন করে কর্নেল তাহেরের বিচার করা হয়। এই বিচারকার্যে সাধারণ বিচার প্রক্রিয়া দূরে থাক, সেনাবাহিনীর আইনও অনুসরণ করা হয়নি। ১৯৭৬ সালের ২১ জুলাই ভোর চারটায় কর্নেল তাহেরকে ফাঁসিতে হত্যা করা হয়। কর্নেল তাহেরের এই হত্যার ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে এক কবি লেখেন, 'যে নদীতে ভেসে ওঠে তাহেরের ছায়া/ চশমায় ঢাকে চোখ প্রেসিডেন্ট জিয়া।'

সেনাবাহিনীর জেনারেল একনায়ক হবেন সেটাই স্বাভাবিক। জিয়াউর রহমানের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়নি। সামরিক একনায়করা সবসময়ই কিছু কৌশলের আশ্রয় নেয়। এই কৌশলের অংশ হিসেবেই জিয়াউর রহমান প্রবর্তন করলেন বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নামের এক আজব গণতন্ত্র প্রক্রিয়া। নিজের ক্ষমতার ভিত পাকাপোক্ত করার জন্য 'হ্যাঁ' 'না' নির্বাচন করলেন। যে নির্বাচনের সাথে জনগণের কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। অথচ বাক্স ভরে গেল 'হ্যাঁ' ভোট। এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে জিয়াউর রহমান গণতন্ত্রের প্রকৃত সংজ্ঞাই বদল করে দিলেন। রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করে জিয়াউর রহমান ঘোষণা করলেন, 'মানি ইজ নো প্রবলেম এবং 'আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট।' জিয়াউর রহমানের এই অভিনব রাজনৈতিক তত্ত্বে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলতে আর কিছু বাকি থাকল না। বিভিন্ন মতের ক্ষমতালোভী অসৎ রাজনৈতিক নেতারা জিয়ার পা ছুঁয়ে সালাম করে যোগ দিলেন তার সাথে। সেনাছাউনিতে বসেই গঠন করলেন রাজনৈতিক দল বিএনপি। জিয়াউর রহমান নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা দাবি করলেও রাজাকার শাহ আজিজসহ আমাদের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতাকারী ঘাতক দালালদের তিনি কাছে টেনে নিলেন। অর্থ এবং ক্ষমতা দিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র কলুষিত করে উপস্থাপন করলেন জনগণের সামনে। ফলে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা সহজ হয় তার জন্য। জিয়াউর রহমান সত্যিকার অর্থেই কঠিন করে দিলেন রাজনৈতিক অঙ্গনকে। ফলে রাজনীতিতে আদর্শ বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনে একনায়কতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি একাত্তরের ঘাতক দালাল জামায়াতকে নিয়ে এলেন রাজনীতিতে। দাঁড় করালেন মুক্তিযুদ্ধের বিপরীতে।

জিয়াউর রহমানের একনায়কতন্ত্রের সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যায় সেনাবাহিনীর প্রতি বিরূপ আচরণ থেকে। সেসময় আওয়ামী লীগ সাংগঠনিকভাবে ছিল খুবই দুর্বল। মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের দলগুলোকে তিনি কাছে টেনে নিয়েছিলেন। ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্য থেকে খুব বড় কোনো বিপক্ষ শক্তির মোকাবিলা তাকে করতে হয়নি। তার তখন প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় সেনাবাহিনী। জিয়াউর রহমান কূটকৌশল ও

নির্মমতা দিয়ে রাজনীতি ও সেনাবাহিনীতে তার প্রতিপক্ষের ক্ষমতা খর্ব করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জিয়াউর রহমান দেশ শাসন করেছেন প্রায় ছয় বছর। এ সময়ে সেনাবাহিনীর ভেতর থেকে রেকর্ডসংখ্যক ক্যু'র প্রচেষ্টা হয়েছে। এর মধ্যে উনিশ অথবা একুশটি ক্যু'র কথা জানা যায়। এর বাইরেও অসংখ্য ক্যু'র চেষ্টা হয়েছে জিয়ার বিরুদ্ধে। প্রতিটি ক্যু জিয়া দমন করেছেন নৃশংস কঠোরতার মাধ্যমে। কোর্ট মার্শালে শতশত সেনাসদস্যকে হত্যা করেন জিয়া। সেনাবাহিনীর এসব সদস্যের প্রায় সবাই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। জিয়াউর রহমানের চরিত্রের আসল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি সবকিছুই মোকাবিলা করতে চাইতেন কঠোর শাসনের মধ্য দিয়ে। সেখানে ভিন্নমতের কোনো স্থান ছিল না। জল্লাদ জিয়াকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে ছোটবড় যে একুশটি সেনা বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, সেগুলোর মধ্যে ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর বিমানসেনা বিদ্রোহ এবং ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে সেনাবিদ্রোহ ছিল খুবই ভয়াবহ। বগুড়া সেনানিবাসে বিদ্রোহের প্রধান নায়ক ফারুক ও রশিদের কিছু হয়নি। কিন্তু সাধারণ সৈনিকদের ভাগ্যে জুটেছে জেল, জুলুম আর ফাঁসি। ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর ঢাকায় যে বিমানসেনা বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, সে বিদ্রোহ জল্লাদ জিয়া নিষ্ঠুর ও নৃশংসভাবে দমন করেন। এই বিদ্রোহের সাথে জড়িত বিমানসেনাদের বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুনালের গোপন বিচারে শতশত সৈনিক ও নন-কমিশন্ড অফিসারকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়। অভিযোগ পাওয়া যায়, ফায়ারিং স্কোয়াডেও বিনা বিচারে বহু সেনাসদস্যকে হত্যা করা হয়। বিচারে দণ্ডিতদের সংখ্যা, তাদের অপরাধ, দণ্ড এবং ফাঁসিতে যাদের হত্যা করা হয়েছে তাদের নাম কখনো প্রকাশ করা হয়নি। লাশও ফেরত দেয়া হয়নি স্বজনদের কাছে। জানা যায়, ফাঁসিতে যাদের হত্যা করা হয়, রাতের অন্ধকারে কার্ফ্যু'র মধ্যে তাদের লাশ অতি গোপনে নামাজে জানাজা ছাড়াই দাফন করা হয়েছে। এমনকি এক কবরে একাধিক লাশ মাটিচাপা দেয়া হয় বলে জানা যায়। বিমানসেনা বিদ্রোহের কারণে মোট কতজন সেনা নিহত হয়েছিলেন এবং কতজনকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয় তা প্রকাশ করা হয়নি। সরকারি হিসাব মতে শুধু দু'মাসে ফাঁসিতে হত্যা করা হয় ১১৪৩ জন সৈনিককে। এর মধ্যে বিমানসেনা ছিলেন ৫৬১ জন। ১৯৯৭ সালে দৈনিক ভোরের কাগজে

প্রকাশিত একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবরের বিমানসেনা বিদ্রোহের পর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ২১ দিনে ১২১ জনকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়। এছাড়াও কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে ৭২ জন এবং বগুড়া কারাগারে ১৬ জনকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়।

জিয়াউর রহমান ক্ষমতার মসনদে টিকে থাকার জন্য জল্লাদের ভূমিকা পালন করে হাজার হাজার সৈনিক হত্যা করেও শেষ পর্যন্ত নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি। একুশতম সেনা বিদ্রোহে জিয়া সেনাবাহিনীর সদস্যদের হাতে ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে নির্মমভাবে নিহত হন। জিয়া হত্যার পেছনে যে রাজনীতি সক্রিয় ছিল সে রাজনীতি আগের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডগুলোর মতোই অজ্ঞাত থেকে যায়। জিয়া হত্যার পেছনের রাজনীতি যাতে উদঘাটিত হতে না পারে, তার জন্য চট্টগ্রাম সেনাবিদ্রোহের নায়ক জেনারেল মঞ্জুরকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়। কথিত আছে যে, ঢাকা থেকেই ফোনে মঞ্জুরকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়। একই সাথে কোর্ট মার্শাল বসিয়ে মঞ্জুরের সহযোগী অফিসারদের তড়িঘড়ি বিচার করে ১২ জন মুক্তিযোদ্ধা অফিসারকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়। তৎকালীন বিএনপি নেতৃত্ব জিয়া হত্যার ব্যাপারে রহস্যজনক নীরবতা পালন করে। যে কারণে জিয়া হত্যার রহস্য উদঘাটিত হয়নি। জিয়ার হাতেগড়া দল বিএনপি অতীতে ক্ষমতায় ছিল এবং বর্তমানেও ক্ষমতার মসনদে। কিন্তু জিয়া হত্যার রহস্য উদঘাটনে অতীতের মতোই বিএনপি নীরবতা পালন করে যাচ্ছে। অবশ্য জিয়া হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটনে বিএনপি'র কোনো আগ্রহ না থাকলেও বর্তমান জোট সরকার এবং সরকারের সুবিধাভোগী কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী জল্লাদ জিয়াউর রহমানকে বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাল্টা হিসেবে দাঁড় করানোর ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এবং তাদের পক্ষের বুদ্ধিজীবীরা অলসভাবে এ ঘৃণ্য প্রচেষ্টার প্রতিবাদ করে যাচ্ছেন। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দীর্ঘ পাঁচ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার নিয়েই তাদের তর্জন গর্জন চলেছে। কিন্তু বিচার শেষ করা সম্ভব হয়নি। জেলহত্যা ও মঞ্জু হত্যার বিচার মাঝপথে আটক আছে। ইতোমধ্যে জেলহত্যার আসামিরা জামিনে

মুক্তি পেয়ে বের হয়ে এসেছে এবং সংসদে বসার সুযোগ লাভ করেছে। ২ অক্টোবরের বিমানসেনা বিদ্রোহের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে যাদের ফাঁসি হয়েছে তাদের পরিবার-পরিজনের পক্ষ থেকে এবং যারা ২০/২৫ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন, তারা বেরিয়ে এসে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছিলেন। কিন্তু তাদের সে আবেদনে তিনি সাড়া দেননি। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সংঘটিত একুশটি সেনাবিদ্রোহের প্রত্যেকটির যদি বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে আসল রহস্য উদঘাটন করা হতো, তাহলে জিয়াউর রহমানের আসল স্বরূপ জনগণের কাছে প্রকাশ হয়ে যেত। কিন্তু আওয়ামী লীগ তা করেনি বলেই আজ ভিলেন জল্লাদ জিয়াউর রহমানকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাল্টা হিসেবে দাঁড় করানোর ঘৃণ্য অপতৎপরতা চালানো হচ্ছে।

০৩.০৪.২০০২

তথ্যসূত্র :

তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা : লেখক, লে. কর্নেল (অব.) এমএ হামিদ। দৈনিক ভোরের কাগজ : ০২.১০.১৯৯৭, ০৩.১০.১৯৯৭, ০৪.১০.১৯৯৭, ০৫.১০.১৯৯৭, ০৬.১০.১৯৯৭।

ভাঙা স্যুটকেস নিয়ে আর কত ডুগডুগি বাজাবেন?

কর্নেল তাহেরসহ হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার হত্যাকারী, একাত্তরের ঘাতক দালাল যুদ্ধাপরাধীদের রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত করা ও রাজনৈতিক অঙ্গনকে কেনাবেচার হাটে পরিণত করার রূপকার, সাবেক সেনাশাসক জিয়াউর রহমানের ২২তম মৃত্যুবার্ষিকী ছিল ৩০ মে ২০০৩। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জবরদখলকারী বিভিন্ন সেনাশাসক অতীতে নিজেদের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য সেনাশাসনকে বেসামরিকীরণের অংশ হিসেবে যেমন রাজনৈতিক দল গঠনের কৌশল গ্রহণ করেছিলেন, সেনাশাসক জিয়াউর রহমানও সে কৌশল অবলম্বন করে সেনাছাউনিতে বসে বিএনপি নামের রাজনৈতিক দল গঠন করেন। জিয়াউর রহমানের হাতে গড়া সে রাজনৈতিক দলটি একাত্তর সালের যুদ্ধাপরাধী জামায়াতকে সাথে নিয়ে বর্তমানে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন। আর এ কারণেই এবার জিয়াউর রহমানের মহিমা কীর্তন করে সচিত্র ক্রোড়পত্র প্রকাশ এবং আলোচনা সভার আয়োজনসহ বেতার ও টিভিতে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। মুখচেনা বক্তারা অসত্য ও চাটুকারিতায় পরিপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। সেনাশাসক জিয়াউর রহমানকে মহানায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি মুখচেনা মহল ধারাবাহিকভাবে মিথ্যাচার প্রচার করে যাচ্ছে। অথচ বাস্তবতা হলো, ঘাতক জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের যে পরিমাণ ক্ষতি করেছেন তার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। অনেকে বলে থাকেন, জনগণ জিয়াউর রহমানকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বীরমুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহের জিয়াউর রহমানকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করেছিলেন। কর্নেল তাহের তাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে প্রাণরক্ষা করেছিলেন। জিয়াউর রহমান নিজের প্রাণরক্ষার পুরস্কার হিসেবে কর্নেল তাহেরকে ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলিয়ে হত্যা করেন। এর চেয়ে নিষ্ঠুরতা আর বর্বরতা কি হতে পারে? এছাড়াও হাজার মুক্তিযোদ্ধা হত্যার অভিযোগে

অভিযুক্ত জিয়াউর রহমান। এসব হত্যার ধারাবাহিকতায় ১৯৮১ সালের ৩০ মে জিয়াউর রহমান স্বগোত্রীয়দের হাতে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে নিহত হন। জিয়ার অনুসারীরা বলে থাকেন, কতিপয় বিপথগামী সেনাসদস্যের হাতে তিনি নিহত হয়েছেন এবং এজন্য তারা জিয়ার নামের আগে 'শহীদ' তক্‌মা অতি উৎসাহের সাথে যেমন ব্যবহার করেন, তেমনি তোতাপাখির বুলির মতো উচ্চারণ করেও থাকেন। কিন্তু কেন এই 'শহীদ' শব্দের অপব্যবহার করা হচ্ছে, সে উত্তর কারো জানা নেই। কেননা জিয়াউর রহমান কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হননি। নিজের ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার জন্য সেনাবাহিনীতে কর্মরত মুক্তিযোদ্ধা নিধনের যে ভয়াবহ নিধনযজ্ঞ শুরু করেছিলেন সে প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তিনি নিজেই ১৯৮১ সালের ৩০ মে নিহত হয়েছেন। সাপুড়ে যেমন সাপের ছোবলে মারা যায়, কুড়া শিকারিকে যেমন বাঘে খায়, তেমনি ঘাতকের শেষ পরিণতি হচ্ছে ঘাতকের হাতে মৃত্যু। জিয়াউর রহমান সে ধারাবাহিকতারই শিকার হয়ে নিহত হয়েছেন।

বাংলাদেশে দুজন রাষ্ট্রপতি ঘাতকের হাতে নিহত হয়েছেন এবং উভয়েরই ঘাতক হচ্ছে জলপাই রঙয়ের উর্দিপরা লোক। দেশের সাধারণ মানুষ এই দুই হত্যাকাণ্ডের সাথে কোনোভাবেই জড়িত ছিলেন না। বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কারণে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে ঘাতকদের গুলিতে সপরিবারে নিহত হন। জিয়াউর রহমান তখন সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার খবর শুনে দায়িত্ব পালনের কথা থাকলেও সে দায়িত্ব পালন না করে এই মর্মান্তিক হত্যার ঘটনাকে হালকাভাবে দেখে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, 'প্রেসিডেন্ট মারা গেছেন তাতে কি হয়েছে, ভাইস প্রেসিডেন্ট তো জীবিত আছেন।' এই হচ্ছেন জিয়াউর রহমান, যিনি কালো চশমার আড়ালে রাষ্ট্র ক্ষমতা জবরদখলের চিন্তা তখন থেকেই শুরু করেছিলেন। অবশ্য তার উচ্চাভিলাষী আকাঙ্ক্ষার অনেক প্রমাণ একাত্তরের রণাঙ্গনে পাওয়া যায়। সেসময় কোনো ব্যবস্থা না নেয়ায় তিনি গোপনে গোপনে অনেক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে ধীরে ধীরে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার ঘটনায় তার নেপথ্য সমর্থন যে ছিল, সে সত্যও এখন আর গোপন নয়। বঙ্গবন্ধু হত্যার খুনিদের বিচার সীমিত পরিসরে হয়েছে। ব্যাপক অর্থে

পূর্ণাঙ্গ বিচার এখনও হয়নি। সে আংশিক বিচার প্রক্রিয়াকেও বর্তমানে জোট সরকার ফাইলবন্দি করে রেখেছে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, সেনা শাসক জিয়াউর রহমান যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির জনক—সে দল দু'বার রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলেও জিয়া হত্যার রহস্য আজও উদঘাটিত হয়নি। জিয়া হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটনে গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট সুদীর্ঘ ২২ বছরেও প্রকাশ করা হয়নি। হত্যাকাণ্ডের পর দায়ের করা মামলাটিও চলে গেছে হিমাগারে। গায়েব হয়ে গেছে মামলার গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রও। কিন্তু কেন, এ প্রশ্ন আজ সর্বমহলে উচ্চারিত হচ্ছে।

তিন সদস্যের তদন্ত কমিশনের অন্যতম সদস্য ও আইন কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান বিচারপতি এটিএম আফজাল সম্প্রতি বলেছেন, কমিটি যথাসময়ে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সাত্তারের কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন এবং রিপোর্টটি ছিল একটি সুদীর্ঘ রিপোর্ট। তিনি আরো বলেন, তিন চারটি বিষয়ে কমিটির কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল এবং তারা সবগুলো বিষয় রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন। রিপোর্টটি কখনো প্রকাশিত হয়েছিল কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, অন্য অনেক তদন্ত কমিটির রিপোর্টের মতো এই রিপোর্টও কখনো আলোর মুখ দেখেনি। বিভিন্ন সময় অনেক ব্যক্তি ও দল জিয়া হত্যা তদন্তের জন্য গঠিত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের দাবি জানালেও সরকারের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। আর এ কারণেই বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সেনাশাসক জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড নিয়ে জনমনে যে রহস্য ছিল সে রহস্য থেকেই গেছে। একাধিকবার ক্ষমতায় এসেও বিএনপি সে রহস্য উদঘাটনে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে এক রক্তাক্ত অভ্যুত্থানে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সাথে সেদিন নিহত হন রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষী কর্নেল আহসান, ক্যাপ্টেন হাফিজ, গার্ড রেজিমেন্টের চার সদস্য, সিএমপি'র একজন কনস্টেবল, একজন চিকিৎসক, পিডব্লিউডি'র একজন কর্মচারী ও একজন গাড়িচালকসহ মোট ১০ জন। জিয়া হত্যার দুদিন পর সিএমপি'র গোয়েন্দা শাখার তৎকালীন সহকারী কমিশনার মোঃ মোকাররম বাদী হয়ে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের সে সময়কার জিওসি মেজর

জেনারেল এমএ মঞ্জুরকে প্রধান আসামি করে ১০ জন সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধ থানায় একটি এজাহার দায়ের করেন। অন্যান্য আসামি হলেন, কর্নেল দেলোয়ার হোসেন, লে. কর্নেল ফজলে হোসেন, মেজর মনির, মেজর দোস্ত মোহাম্মদ, মেজর মোজাফফর, মেজর রেজাউল করিম, ক্যাপ্টেন রফিকুল হাসান খান, ক্যাপ্টেন ইলিয়াস ও ক্যাপ্টেন জামিল হক। মামলা দায়েরের কিছুদিন পর ১৯৮১ এর ৭ জুন জিয়া হত্যা মামলা তদন্তে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রুহুল ইসলামের নেতৃত্বে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির অন্য দুজন সদস্য ছিলেন বিচারপতি এটিএম আফজাল ও খুলনার সেশন জজ সৈয়দ সিরাজুল আহমদ। বিচার বিভাগীয় তদন্তে ষড়যন্ত্রকারী কারা ও তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল তা জানতে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আর প্রকাশিত হয়নি। তদন্ত কমিটির রিপোর্টে জিয়াউর রহমানের অনেক ঘনিষ্ঠজনকেও হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য নায়ক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল বলেই রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়নি বলে ধারণা করা যায়। মূল হত্যাকারী ও ষড়যন্ত্রকারীদের নিরাপদ রাখার জন্যই ১২ জন মুক্তিযোদ্ধা সেনাকর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করে সামরিক আইনে কোর্ট মার্শাল করে বিচারের নামে প্রহসনের মাধ্যেমে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়। এই ১২ জন মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তার প্রাণরক্ষার জন্য তৎকালীন ১৫ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের সাথে বঙ্গভবনে দেখা করার অনেক আবেদন নিবেদন করে ব্যর্থ হয়ে পরবর্তীকালে জেনারেল এমএজি ওসমানীর হস্তক্ষেপ এবং সাহায্য কামনা করেন। কিন্তু তিনি সেনাবাহিনীর চেন অব কমান্ড রক্ষার অজুহাত তুলে প্রতিনিধিদলের সাথে বঙ্গভবনে যেতে অস্বীকার করেন। পরদিনই তড়িঘড়ি করে ১২ জন মুক্তিযোদ্ধার ফাঁসির রায় কার্যকর করা হয়।

১৯৮১ সালে বিএনপি সরকারের আমলে ২৪ জুন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক নির্দেশে জিয়াউর রহমান হত্যা মামলাটির যাবতীয় কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়। দীর্ঘদিন পর আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হয় এবং ১৯৯৭ সালের ২৬ নভেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মামলার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। আবার প্রাণ ফিরে পায় দেশের ইতিহাসে চাঞ্চল্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ এ মামলাটি। এ পর্যায়ে চট্টগ্রামের চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটি

তদন্তের দায়িত্ব দেন সিআইডির একজন এসপিকে। মামলাটিতে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীসহ মোট ৩৬ জন সাক্ষী ছিলেন। আদালতের বারবার তাগাদা সত্ত্বেও তাদের বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী আদালতে সাক্ষ্য দিতে হাজির হননি। এই সময় মামলাটি চলাকালে প্রায় ১৬৮ বার সময় মঞ্জুর করা হয় সাক্ষীদের গাফিলতির কারণে। ২০০১ সালের ১ অক্টোবরে নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পরই মামলাটি আবার খারিজ করে দেয়া হয়।

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পাশাপাশি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে জিয়া হত্যার বিচার হওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমান বিএনপি সরকারই তাদের দলের প্রতিষ্ঠাতার বিচার চায় না। আর এ কারণেই বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ফাইলবন্দি করে রাখা হয়েছে। আদালতে বিচার প্রক্রিয়াকে বারবার বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে। জিয়া হত্যা মামলা পুনরুজ্জীবিত করার কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই। এবারের মৃত্যুবার্ষিকী পালনের আলোচনাসভায় ও তথাকথিত কলমজীবীদের লেখায় একটি বারের জন্যও জিয়া হত্যার বিচারের দাবি উত্থাপিত হয়নি। তাই তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, সত্য আড়াল করে জিয়ার ভাঙা স্যুটকেস নিয়ে আর কত ডুগডুগি বাজাবেন?

০৪.০৬.২০০৬

ভাষা আন্দোলনে সিলেট

মায়ের মুখের ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙালির জীবনদানের গৌরবগাথা বর্তমানে বিশ্বসভায় স্বীকৃত। ইউনেস্কো গত বছর থেকে শহীদের রক্তরঞ্জিত ভাষা দিবস একুশে ফেব্রুয়ারিকে সারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। এ বছর অমর একুশে শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশে মর্যাদার সাথে পালিত হবে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিশ্বায়নের নামে ভাষা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার এবং দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে প্রতিক্রিয়াশীল পরজীবীগোষ্ঠীর বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত রুখে দাঁড়াবার নতুন ক্ষেত্রে তৈরি করেছে। বাংলা ভাষাভাষী মানুষ এখন আর একা নয়, পৃথিবীর সকল ভাষার মানুষের সাথে মিলে ভাষার অধিকার তথা গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার নতুন প্রত্যয়ে এগিয়ে যাবেন। কেননা মাতৃভাষার অধিকার সে তো গণমানুষেরই অধিকার। একুশের ভাষা আন্দোলন শুধু বাঙালির ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ছিল না। সকল শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্য, আধিপত্য, সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও শোষণমুক্তির লক্ষ্যে এই সংগ্রামের বিকাশ ঘটেছিল। নতুন শতাব্দীতে বাংলাদেশ একইভাবে নিষ্ঠুর লুটপাট, দুর্নীতি, দারিদ্র্য ও বৈষম্যের ক্রমবিস্তৃতি, গণতন্ত্রহীনতা ও অপরাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে তাতে বাংলা ভাষা বিশেষ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। অমর একুশে বায়ান্ন থেকে প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে সাহস জুগিয়েছে, দৃঢ় প্রত্যয়ী করেছে। বিশ্ব মাতৃভাষা দিবসের নবতর প্রেক্ষিতে একুশ তথা ভাষা দিবস নতুন এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাঙালিকে সাহসী করবে, দুর্জয় ও অপ্রতিরোধ্য করবে।

ভাষা আন্দোলনকে যেমন বাঙালির স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বলা হয়ে থাকে, তেমনি এই আন্দোলনকে স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত্তি বলা যায়। একুশের

ভাষার লড়াই এবং সে আন্দোলনে বাঙালির বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটে। যে জাগরণের শেষ পরিণতি স্বাধীন বাংলাদেশ। বাঙালি জাতির নিজস্ব আবাসভূমি একুশের ভাষার এই আন্দোলনে সিলেটবাসী ছিলেন প্রথম কাতারে। দেশের অন্যান্য অনেক জেলায় ভাষা আন্দোলন প্রসারিত হতে সময় লাগলেও জাতীয় পর্যায়ে আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকে সিলেটে আন্দোলনের ব্যাপক তৎপরতা ছড়িয়ে পড়ে। সিলেটে সাহসী আন্দোলনের বেগবান ধারা নেতৃত্বের সাংগঠনিক তৎপরতার কারণে সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ভাষার দাবিতে আন্দোলন পরিচালনা করা তখন খুবই কঠিন কাজ ছিল। কারণ শরিফ-খান্দানি সিলেটিদের একাংশ নিজেদের ইরানি-তুরকি-ইয়েমেনি-আফগানি খান্দানি ভেবে খুশি হতেন এবং এখনও অনেককে সে খান্দানি জোশ প্রকাশ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে দেখা যায়। সে সময় যে এলিট শ্রেণী রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পক্ষে আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছিলেন, তাদেরই উত্তরসূরি হিসেবে দাবিদার কিছু এলিট আবার বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নেমেছেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সে সময় রাষ্ট্রের ৬ কোটি ৯০ লাখ অধিবাসীর মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লাখ লোকের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৪ ভাগ লোকই বাংলায় কথা বলতেন। অন্যান্য ৭টিরও বেশি ভাষায় কথা বলতেন শতকরা ৩৬ ভাগ লোক। তারপরও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কেবল বাঙালিদের দাবিয়ে রাখার জন্য একমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়। প্রথমে এই ঘোষণার বিরুদ্ধে জাতীয়ভাবে কলমযুদ্ধ শুরু করেন আব্দুল হক, মাহবুব জামাল জাহেদী, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কাশেম ও ড. এনামুল হক। জ্ঞানতাপশ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষার দাবিতে একাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে বাঙালি জাগরণে অগ্রসৈনিকের ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশের ভেতরে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবি জানিয়ে পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হয়েও মুহম্মদ মুসলিম চৌধুরী 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেন। সে ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি নুরুল হক সম্পাদিত *আল ইসলাহ* পত্রিকায় ১৯৪৭ সালের আগস্ট সংখ্যায়

প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে তমদ্দুন মজলিস 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' নামে একটি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করে। মুহম্মদ মুসলিম চৌধুরীর লেখা প্রবন্ধটির উপর *আল ইসলাহ* পত্রিকায় একটি সাহসী সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন পত্রিকার সম্পাদক নুরুল হক। ১৯৪৭ সালের ৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মাসিক সাহিত্য সভায় মুহম্মদ মুসলিম চৌধুরী 'বাংলা ভাষার দাবি উচ্চারিত' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। সংসদ বিষয়টি অতি গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে এবং সংসদের সাধারণ সম্পাদক ও *আল ইসলাহ* সম্পাদক মুহম্মদ নুরুল হক বিষয়টিকে সর্বমহলে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ অংশ হিসেবে ১৯৪৭ সালের ৩০ নভেম্বর মাদ্রাসা হলে বাংলা ভাষার দাবিতে এক সুধীসমাবেশ আহ্বান করা হয়। এই সুধীসমাবেশে মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বহুভাষাবিদ মৌলভীবাজারের গৌরব ড. সৈয়দ মুজতবা আলী। আলোচনার বিষয় ছিল 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা না উর্দু হওয়া উচিত'। সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত রসসাহিত্যিক-অনুবাদক মতিন-উদ-দীন আহমদ। হলভরা লোকজন। সৈয়দ মুজতবা আলী যখন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছিলেন তখন বাংলা ভাষার বিরোধীরা হলে হামলা চালিয়ে সমাবেশ পণ্ড করে দেয়। সৈয়দ মুজতবা আলীর অর্ধপ্রদত্ত ভাষণ পরে *আল ইসলাহ* এবং কলকাতার *চতুরঙ্গ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে এই ভাষণ চট্টগ্রাম থেকে 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে এই সমাবেশই ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম প্রতিবাদ সমাবেশ। কিন্তু ভাষার দাবিতে ব্যাপক জনগণকে যুক্ত করে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের কোনো উদ্যোগ ছিল না। ভাষার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সভা হয় ১৯৪৭ সালের ৬ ডিসেম্বর। তমদ্দুন মজলিসের মুখপত্র 'সৈনিক' ও সাপ্তাহিক 'নওবেলাল' শুরু থেকেই রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে সাহসী ভূমিকা রাখে স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী বর্তমানে পাকিস্তানে অবস্থানকারী সিলেটের মাহমুদ আলী রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনসহ তৎকালীন সময়ে সিলেট নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা এবং আদর্শহীনতার কারণে মাহমুদ আলী বর্তমানে বাংলাদেশ তথা সিলেটের জনগণের কাছে এক ঘৃণ্য যুদ্ধাপরাধী। বাঙালির মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে

মুহম্মদ নুরুল হকের কোনো বিতর্কিত ভূমিকা না থাকলেও মুহম্মদ মুসলিম চৌধুরীর ভূমিকা বাঙালির অনুকূলে ছিল না।

১৯৪৮ সালের ১১ জানুয়ারি পাকিস্তানের পরিবহন ও যোগাযোগমন্ত্রী আব্দুর রব নিশতার সিলেট সফরে এলে বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে সিলেট মুসলিম লীগ সিলেট জেলা শাখার সভানেত্রী বেগম জোবেদা খাতুন চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি মহিলা প্রতিনিধিদল পৃথক পৃথকভাবে মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি জানান। একই বছর জোবেদা খাতুন চৌধুরী, সৈয়দা শাহেরা বানু, সৈয়দা লুৎফুন্নেসা খাতুন, সৈয়দা নাজবুন নেসা ও রাবেয়া খাতুন স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন বরাবরে প্রেরণ করা হয়। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তান গণপরিষদে সরকারি ভাষারূপে ইংরেজি ও উর্দুর নাম প্রস্তাব করা হয়। কুমিল্লার মন্ত্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি-উর্দুর সাথে বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব করেন। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং দুদিন পর পূর্ববাংলার সব মুসলিম সদস্যসহ পশ্চিম পাকিস্তানের সব সদস্য একজোট হয়ে সে প্রস্তাব বাতিল করেন।

সিলেটের গণভোটকালে দুটি স্রোত প্রবাহিত ছিল। পাকিস্তান আর ভারত কমিউনিস্ট পার্টি সুরমা উপত্যকা প্রদেশের স্লোগান তুলে তৃতীয় স্রোত তৈরির প্রয়াস চালালেও তা পাত্তা পায়নি। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে প্রভাবশালীদের দৃঢ় অবস্থান ও রাষ্ট্রযন্ত্রের জঘন্য অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বামধারার প্রগতিশীল ছাত্রনেতৃত্ব ও মহিলারা মাতৃভাষার সম্মান রক্ষা ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে আন্দোলনের বেগবান ধারা তৈরি করেন। ১৯৪৮ সালের ৮ মার্চ পীর হাবিবুর রহমান, মকসুদ আহমদ ও বর্তমানে যুক্তরাজ্য প্রবাসী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাসাদ্দুক আহমদ সিলেট শহরের গোবিন্দ চরণ পার্কে বাংলা ভাষার দাবিতে এক সভা আহ্বান করেন। বাংলা ভাষার দাবিতে আয়োজিত এই সভায় মুসলিম লীগের গুণ্ডারা হামলা চালিয়ে সভামঞ্চ দখল করে নেয় এবং সভার আয়োজনকারী নেতাকর্মীদের বেপরোয়া প্রহার করে। তাদের হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হন মকসুদ আহমদ। এই সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন মাহমুদ আলী। এই হামলার

প্রতিবাদে সিলেট জেলা মুসলিম মহিলা লীগ ১০ মার্চ একই স্থানে প্রতিবাদ সভা আহ্বান করলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২ মাসের জন্য সিলেট শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে সভাসমাবেশ করার অধিকার কেড়ে নেয়।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর সুনামগঞ্জ ও ময়মনসিংহের পাহাড়ি অঞ্চলে হাজং কৃষকদের লড়াই এবং সিলেট অঞ্চলে নানকার আন্দোলনের বেগবান ধারা রুদ্ধ করার জন্য কমিউনিস্ট নেতাকর্মীদের উপর সরকারি নির্যাতনের ফলে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। ১৯৫০ সালের মে মাসে সুনামগঞ্জের কমিউনিস্ট নেতা রবি দাস আনসার বাহিনীর নৃশংস হামলায় নিহত হন। সিলেট শহরের শান্তি ভট্টাচার্যের বাড়ি ছিল আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট নেতাকর্মীদের যোগাযোগ রক্ষার একমাত্র মাধ্যম। কমিউনিস্ট নেতা বারীন্দ্র দত্ত ও হেনা দাসের নেতৃত্বে ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বেশ কিছু প্রগতিশীল মুসলিম কর্মী ও নেতা কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত হন। এ সময় আখলাকুর রহমান, তাসাদ্দুক আহমদ, মকসুদ আহমদ যেমন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন, তেমনি তাদের পথ অনুসরণ করে এগিয়ে আসেন পীর হাবিবুর রহমান, আসদ্দর আলী, নূরুর রহমানসহ আরো অনেকে। ভাষার দাবিতে ১৯৪৮ সালের শুরু থেকে সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কুলাউড়া, কমলগঞ্জ ও শ্রীমঙ্গলে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির অনেক আগ থেকেই সরকার সিলেট শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রাখে। কিন্তু ঢাকায় গুলি হওয়ার সংবাদ সিলেট এসে পৌঁছার পরপরই রাস্তায় নামে জনস্রোত। প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন সিলেটের মানুষ। স্কুল কলেজে একটানা ১৫ দিন চলে ধর্মঘট। এ ধর্মঘট শুধু সিলেট শহরে নয়, ছড়িয়ে পড়ে থানায় থানায় গ্রামে গ্রামে। এই গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন মাহমুদ আলী, সরে কওম এ. জেড আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহিম (লাল বারী) ও মতসির আলী। অপরদিকে মুসলিম নেতৃত্বের প্রভাবশালীদের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী আব্দুল হামিদ, দেওয়ান আবদুল বাসিত, দেওয়ান তৈমুর রাজা, দেওয়ান আবদুর রব চৌধুরী, মঈন উদ্দিন চৌধুরী, আজমল আলী চৌধুরী, মুদব্বির হোসেন চৌধুরী, রজিউর রহমান চৌধুরী, ডা. আবদুল মজিদ প্রমুখ উর্দুর পক্ষে জোরালো অবস্থান গ্রহণ করেন। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে অবস্থান

গ্রহণকারী এসব ব্যক্তি আমাদের মহান স্বাধীনতার বিপক্ষেও অবস্থান নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে দুজন—আজমল আলী চৌধুরী ও ডা. আবদুল মজিদ মুক্তিযুদ্ধের বিজয়লগ্নে বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে নিহত হন।

সিলেটে ১৯৫২ সালে যারা ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন তারা হচ্ছেন পীর হাবিবুর রহমান, তাসাদ্দুক আহমদ, মনির উদ্দিন আহমদ, আবদুল হামিদ, আসদ্দর আলী, তারা মিয়া, এ.এইচ. সা'আদত খান, সৈয়দ মোতাহির আলী, নুরুর রহমান, মাহমুদ আলী, দবির উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, এডভোকেট আব্দুল্লাহ, মাওলানা সখাওতুল আম্বিয়া, এ.জেড. আব্দুল্লাহ, আবদুর রহিম, মতসির আলী। ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী এই নেতৃবৃন্দের মধ্যে একমাত্র মাহমুদ আলী আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং অন্যরা সবাই নিজ নিজ আদর্শ ও বিশ্বাসে অটল থেকেছেন। ভাষা আন্দোলনে সিলেটে মহিলাদের মধ্যে যারা নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন তারা হচ্ছেন, জোবেদা খাতুন চৌধুরী, হাজেরা মাহমুদ, লুৎফুন্নেসা খাতুন, সৈয়দা নজিবুন্নেসা খাতুন প্রমুখ। ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে নূরুল ইসলাম, সাফাত আহমদ চৌধুরী, আবুল মাল আবদুল মুহিত, রেজাউল করিম, নাসির উদ্দিন আহমদ, খন্দকার রুহুল কুদ্দুস প্রমুখ ছিলেন অগ্রণী ভূমিকায়। এছাড়া কুলাউড়ায় সৈয়দ আকমল হোসেন, আব্দুল মজিদ, কমলগঞ্জে মোহাম্মদ ইলিয়াস, মফিজ আলী, সৈয়দ মতিউর রহমান, শ্রীমঙ্গলে রাসেন্দ্র দত্ত, সৈয়দ মুজিবুর রহমান, মৌলভীবাজারে তারা মিয়া, আবদুল মুঈদ চৌধুরী, বানিয়াচংয়ে হাজী আব্দুল ওয়াহেদ খান, সুনামগঞ্জে প্রসুনকান্তি রায় (বরুণ রায়), অনন্ত দেব, অনিমেষ ভট্টাচার্য নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন।

ভাষা আন্দোলনে তাসাদ্দুক আহমদের ভূমিকা সম্পর্কে এই আন্দোলনের প্রধান সংগঠক পীর হাবিবুর রহমান বলেন, 'পাকিস্তানের প্রথম যুগে মুসলিম লীগের রুদ্রমূর্তি দেখে তছদ্দুক মিয়া সিলেট ছেড়ে ঢাকা চলে যায়। এই সময় আসদ্দর আলী, তারা মিয়া, নাছির উদ্দিন চৌধুরীসহ আমরা যখন একটি অসাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করি তখন তছদ্দুক মিয়া গোপনে সিলেট এসে আমার সাথে আমার গোপন আস্তানায় দেখা করে এবং আমরা যে ছাত্র সংগঠন গঠন করছি সেটির নাম ছাত্র ইউনিয়ন রাখার প্রস্তাব দেয়। আমরা সে প্রস্তাব গ্রহণ

করি। এরপর সে ঢাকা চলে যায় এবং সেখান থেকে দেশ ত্যাগ করে বিলেত চলে যায়। সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জে মাওলানা সামছুল হকের মোনাজাতের মাধ্যমে সিলেট জেলা ছাত্র ইউনিয়নের কমিটি গঠন করা হয়। পাকিস্তানের প্রথম বামধারার ছাত্র সংগঠন সিলেট থেকে জন্ম নেয়। ১৯৫২ সালের ২৬ এপ্রিল ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন নামে সে সংগঠনটি গঠিত হয় সে সংগঠনটি ছিল সিলেট জেলা ছাত্র ইউনিয়নের পরিবর্তিত রূপ। কেন্দ্রীয়ভাবে ছাত্র ইউনিয়ন গঠিত হওয়ার পর সিলেট জেলা ছাত্র ইউনিয়ন স্থানীয় ইউনিট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা রূপ লাভ করে সে ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবেই ছাত্র ইউনিয়নের জন্ম। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পর বহুদিন পর্যন্ত সিলেটের জনগণ ছিলেন বিক্ষুব্ধ। সিলেটে নুরুল আমিন এলে তাকে কালো পতাকা প্রদর্শন করেন সিলেটের বিক্ষুব্ধ জনতা। জনসভার আয়োজন করা হলে জনতা তাও বানচাল করে দেন। হবিগঞ্জ, বিয়ানীবাজার ও কুলাউড়ায় একই ধরনের ঘটনা ঘটে। এভাবেই সিলেটের সংগ্রামী জনতা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সাহসী ভূমিকা পালন করেন।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অসাম্প্রদায়িক চেতনার বেগবান ধারাকে আরো প্রসারিত করার লক্ষ্যে ষাটের দশকে গণমানুষের কবি দিলওয়ারের নেতৃত্বে সিলেটে সমস্বর লেখক ও শিল্পী সংস্থা গঠন করা হয়। এই সংগঠনের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা হয়। সমস্বরের প্রগতির ধারার আন্দোলনের বিরুদ্ধে কবি আফজাল চৌধুরীর নেতৃত্বে গড়ে তোলা হয় সংলাপ সাহিত্য ও সংস্কৃতি ফ্রন্ট। সিলেট তথা বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী মাহমুদ আলীর সাথেও তাদের যোগসূত্র গড়ে উঠে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে।

একুশ আমাদের অহংকার, একুশ আমাদের পরিচয়ের ভিত্তি। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এবারের একুশে আমাদের সুদীপ্ত ঘোষণা—ভাষা শহীদরা অমর হোক, মাতৃভাষার অধিকার গণমানুষের অধিকার, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধবাদীরা নিপাত যাক, ধ্বংস হোক।

১৪.০২.২০০১

সাহস চাই, সাহস, আরো সাহস

বিশ্ববিখ্যাত জার্মান নাট্যকার ব্রেখট লিখেছিলেন, 'যখন নেতারা শান্তির বাণী ছড়ায়, সাধারণ মানুষ মাত্রই জানে যুদ্ধ আসন্ন। যখন নেতারা যুদ্ধকে অভিশপ্ত করে, যুদ্ধ প্রস্তুতির আদেশ ইতোমধ্যেই প্রচারিত হয়েছে।' এই লেখার মাধ্যমে ব্রেখট একশ্রেণীর ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতিকের শঠতা, প্রবঞ্চনা আর মিথ্যাচারের স্বরূপ তুলে ধরেছিলেন। ব্রেখটের লেখার এই মর্মকথা বর্তমান বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সাংসদদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জোট সরকারের রাজনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে জনগণের সাথে প্রতারণা, শঠতা, বেঈমানী আর বিশ্বাসঘাতকতার এক সমাহার। রাজনীতিতে অনুপ্রবেশকারী সামারিক-বেসামরিক আমলা, সন্ত্রাসী এবং লুটেরা মাফিয়াচক্র নিয়ে তিন সালসার নীলনকশার নির্বাচনের পর ক্ষমতাসীন হয়েই তারা সংখ্যালঘুদের উপর সীমাহীন অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু করে। সাথে সাথে শুরু করা হয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে নির্মূল অভিযান। সরকারের এই দমনপীড়নের বিরুদ্ধে যারাই প্রতিবাদ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে হামলা-মামলা চালিয়ে দেশে এক ভীতির রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। সংখ্যালঘু নির্যাতন, একের পর এক বোমা ও গ্রেনেড হামলা, চট্টগ্রামে দশ ট্রাক অস্ত্রের চালান আটক, সাংবাদিক হত্যা, জঙ্গি মৌলবাদীদের সন্ত্রাসী তৎপরতা এসব বিষয় কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে ঘটছে না। কিন্তু এসব বিষয়ে জোট সরকারের আচরণ রহস্যময়। এসব ঘটনার নেপথ্য রহস্য উদঘাটিত হোক সরকার তা চায় না। বহির্বিশ্বে এখন বাংলাদেশ বোমা-গ্রেনেডের দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সাংসদ, নেতা-পাতিনেতা সবাই সমস্বরে বলছেন, দেশে ইসলামী জঙ্গি সংগঠনের কোনো তৎপরতা নেই। অন্যদিকে সরকারের

পুলিশের হাতে ইসলামী সংগঠনের নেতা ও ক্যাডাররা গ্রেফতার হচ্ছে। এতদিন সাম্প্রদায়িক জঙ্গি সন্ত্রাসীদের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করে আসলেও জোট সরকারের থলের বিড়াল এখন বের হয়ে পড়েছে। দুটি জঙ্গি ইসলামী সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং জঙ্গি ইসলামী সন্ত্রাসীদের নেতা ড. গালিবসহ শতাধিক সন্ত্রাসীকে গ্রেফতাদের মাধ্যমে এ সত্যই প্রমাণিত হয়েছে যে, জোট সরকারের সাথে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব পেয়ে একাত্তরের পরাজিত ঘাতকরা বদলা নেয়ার জন্য বাংলাদেশের শ্যামল মাটি একের পর একজন মুক্তিযোদ্ধার রক্তে রক্তাক্ত করে চলেছে। এতদিন পর্যন্ত বোমা-গ্রেনেড বিস্ফোরণের কোনো কূলকিনারা না পেলেও এখন আমাদের বুঝতে বাকি নেই, রক্তাক্ত একুশে আগস্টের হত্যার নেপথ্য নায়ক কারা, তাদের পরিচয় এখন কারো অজানা নয়। এই চক্র ১৯৫২ সালে আমাদের মহান ভাষার সংগ্রামের বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু বাঙালি জাতির ঐক্যের কাছে তাদেরকে পরাজয় বরণ করতে হয়। আবার এই ঘাতকবাহিনী একাত্তরে বাঙালির স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে পাক বর্বর-বাহিনীর সহযোগী হয়ে হত্যার তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে।

জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবৃক্ষকে কবর দিয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশ। আবার আমরা বিজয়ী হলাম। কিন্তু বিজয়ের পর স্বাধীন বাংলাদেশের ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত হলেন, শ্রেণীগত অবস্থানের কারণে তারা হাজার হাজার পুত্রহারা পিতার, স্বামীহারা মায়ের, ইজ্জত হারানো বোনের অশ্রুধারার জন্য যারা দায়ী, সেসব ঘাতকের বিচার করেননি। দালাল আইন নামে একটি অতি দুর্বল আইন প্রণয়ন করে কতিপয় ঘাতক দালালকে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। এই কারাবাস ছিল ঘাতকদের জন্য নিরাপত্তা হেফাজতের নামান্তর। তাই দেখা যায়, দালাল আইনে এক চিকন আলী ছাড়া কুখ্যাত কোনো ঘাতকের বিচার হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে যারা ক্ষমতা জবরদখল করে, তারা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সুফলগুলোকে একে একে নির্বাসনে প্রেরণ শুরু করে। আমরা তখন নীরবে সেসব পরিবর্তন লক্ষ্য করে গেছি, কিন্তু প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ গড়ে তোলার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করিনি। তারপর ক্যু পাল্টা ক্যুর

মাধ্যমে আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যার তাণ্ডবলীলা চলতে থাকে। সে ধারাবাহিকতা এখনো চলছে। আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলি, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাঙালি সংস্কৃতি, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কথা বলি, বলি গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থার কথা—আমরা কিন্তু ঐক্যবদ্ধভাবে সমস্বরে এসব কথা বলতে পারি না। আর এই দুর্বলতার সুযোগে একাত্তরের ঘাতকরা ঐক্যের সেতুবন্ধন গড়ে তুলে শক্তি সঞ্চয় করে বর্তমানে রাষ্ট্রক্ষমতায়। আমরা এখন নিজগৃহে পরবাসী। যারা একাত্তরে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল, তারাই আজ আমাদেরকে স্বাধীনতার বিরোধী বলে সার্টিফিকেট দিচ্ছে।

আমরা একাত্তরে মৌলবাদী ঘাতক জামায়াত-শিবিরের স্বরূপ দেখেছি। ধর্মের নামে ইসলামের নামে পাক বর্বর-বাহিনী এবং তাদের সহযোগী রাজাকার, আলবদর, আলশামস ঘাতক বাহিনী কর্তৃক বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানসহ ত্রিশ লাখ বীর বাঙালিকে হত্যা এবং দু'লাখ মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠনের কাহিনী এখনো ম্লান হয়ে যায়নি। স্বাধীন বাংলাদেশে তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সরকারের এই ঘোষণা অবশ্যই একটি সাহসী পদক্ষেপ ছিল। কিন্তু গর্তে ইঁদুর রেখে গর্তের মুখ বন্ধ করে দিলেই যেমন ইঁদুর নির্মূল হয় না, তেমনি একাত্তরের ঘাতকদের বিচার না করে কেবল সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে তাদের নির্মূল করা সম্ভব নয়। আজকের বাংলাদেশ সে প্রমাণ বহন করে। তারা তো নির্মূল হয়নি, বরং দিনে দিনে শক্তি সঞ্চয় করে বর্তমানে রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদারিত্ব পেয়ে আমাদের নির্মূল করার জন্য রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা করে হত্যার তাণ্ডবলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। একদিন যে বাংলাদেশকে তারা অস্বীকার করেছিল, বর্তমানে সে বাংলাদেশকে মিনি পাকিস্তানে পরিণত করে একাত্তরের বদলা নিচ্ছে তারা। আমরা সমস্বরে বলতে পারছি না, তুই রাজাকার বাংলা ছাড়। বলতে পারছি না, এ বাংলা আমাদের শেকড়। এ বাংলার জমিনে এখনো মাটি খুঁড়লে বের হয়ে আসে শহীদ মুক্তিযোদ্ধার হাড়। সংবাদপত্রে দেখা যায়, স্বাধীনতাযুদ্ধের বীরসেনানী জীবনরক্ষার জন্য ভিক্ষা করছেন। মুক্তিযুদ্ধের বীরসেনানী যারা সেনাবাহিনীতে ছিলেন, তাদের অনেককে একে একে হত্যা করা হয়েছে।

যাদের হত্যা করা যায়নি, তাদেরকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করে সেনাবাহিনী থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। চাকরিতে মেয়াদ ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাদের পদোন্নতি দেয়া হয়নি। কিন্তু ঘাতক সর্দার গোলাম আজম কিংবা বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রধান নায়ক মতিউর রহমান নিজামীর পুত্রদের বছর বছর পদোন্নতি হয়। বিশ্বের মেহনতি মানুষের মহান নেতা কমরেড মাও সেতুং বলেছিলেন, 'রাজনীতিতে ক্ষমার কোনো স্থান নেই।' অথচ আমরা গত চৌত্রিশ বছর ধরেই একাত্তরের ঘাতক দালালদের ক্ষমা করে আসছি, প্রতিহিংসার আগুনে একবারও আমরা জ্বলে উঠিনি। কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ ঘাতক দালালদের প্রতিহিংসার দাবানল একদিনের জন্যও থামেনি। তাই তারা দিনে দিনে সংখ্যায় বাড়ছে, আর আমরা কমতে কমতে শূন্যের কোঠার দিকে এগিয়ে চলেছি। এখনো যদি আমাদের সুমতি না হয়, এখনো যদি আমরা সাবধান না হই, তাহলে ইতিহাসে আমাদের এ পরাজয়ের জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী হব।

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় মসজিদের ভেতর পুলিশের কনস্টেবল হত্যা, প্রকাশ্যে ফতোয়াবাজির বিরুদ্ধে রায় প্রদানকারী হাইকোর্টের দুই বিচারপতিকে 'মুরতাদ' ঘোষণা করে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান এবং একের পর এক সাম্প্রদায়িক উস্কানি সৃষ্টির পরও সরকার সাহসী হয়ে কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ না করে কেবল ভোটের জন্য আপসের পথ অনুসরণ করে। ২০০১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যে সহিংস তাণ্ডব চালানো হয়, তা ছিল মৌলবাদীদের প্রাথমিক রিহার্সেল মাত্র। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার কেবল ভোটের জন্য এসব তাণ্ডবলীলা দেখেও না দেখার ভান করতে থাকে। কবি দাউদ হায়দারের একটি কবিতার জন্য গর্তে আশ্রয় নেয়া একাত্তরের ঘাতক দালালরা সুযোগ পেয়ে গর্ত থেকে বের হয়ে বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে তাঁর ফাঁসির দাবিতে সরব হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সরকার তখন মৌলবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে কবি দাউদ হায়দারকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ না দিয়ে দেশ থেকে বহিষ্কার করে। সরকারের এই আত্মসমর্পণের ফলেই মৌলবাদীদের প্রথম বিজয় সূচিত হয়। একই ধারায় শেখ হাসিনা সরকার মৌলবাদীদের ছাড় দিতে দিতে তাদেরকে শক্তি সঞ্চয় করতে সহায়তা করেন। শেখ হাসিনার এই

আপসকামিতা শেষ পর্যন্ত বুমেরাং হয়। অক্টোবরের বিতর্কিত নির্বাচনের পর ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়েও আওয়ামী লীগ তথা শেখ হাসিনার কোনো শিক্ষা হয়েছে বলে মনে হয় না। রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করতে বিএনপি চরম সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থান গ্রহণ করেছে। বিএনপি নেত্রী নিজে ও তার সহকর্মীরা ধর্মাচারণে বিশেষ অভ্যস্ত না হলেও ধর্মের জন্য এখন প্রতিদিন জান কবুল করে চলেছেন। অপরদিকে আওয়ামী লীগ যে জায়গা থেকে বিরোধিতা করেছে তাও পরিষ্কার নয়। বিএনপি ও জামায়াত জোটের বিরোধিতা করতে গিয়ে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ নেতারা এটা প্রমাণ করতে চান যে, তারা খুব ধর্মপ্রাণ এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে সবার চেয়ে এগিয়ে আছেন। তারা যে ভালো মুসলমান তা প্রমাণ করতে তারা যারপরনাই তৎপর। তাই তো দেখা যায়, অন্যান্য সভা-সমাবেশের কথা নাইবা উল্লেখ করা গেল, বাঙালি জাতির আপন সংস্কৃতির যে দিন—সে শহীদ দিবসের আলোচনাসভায় তারা দোয়ার মাহফিল যুক্ত করে রাখেন।

দেশ আজ বিপন্ন। বিপন্ন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষ। দেশটি কি মৌলবাদীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে? প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ কি আলবেনিয়া হবে? এই দুঃসহ পরিস্থিতিতে স্বাধীনতার নেতৃত্বদানকারী বৃহত্তর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী ছোটবড় সব প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের একই মোহনায় মিলিত হওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। বিপন্ন দেশকে রক্ষা ও স্বাধীনতার পতাকাকে হিংস্র শকুনদের কালো থাবা থেকে রক্ষার একমাত্র পথ হচ্ছে ঐকবদ্ধ আন্দোলন। আর এই আন্দোলনের জন্য চাই সাহস, আরো সাহস। সাথে-সাথে আন্দোলনের কর্মসূচি প্রণয়নেও আমাদের রাজনৈতিক অবস্থান পরিষ্কার করতে হবে। জোট সরকারকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার আন্দোলন ভাবলে আবার চরম ভুল করা হবে। তা হলে আন্দোলন ক্ষমতার আবর্তেই আটকে যাবে। আন্দোলন হতে হবে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিভিত্তিক। প্রথমেই ঘোষণা করতে হবে, ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার। এই স্লোগানের ভিত্তিতে বাহাত্তরের মূল সংবিধানে ফিরে যাওয়ার অঙ্গীকার করতে হবে। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণাসহ একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার করার

অঙ্গীকার করতে হবে। 'কাপুরুষ মরে বারবার, সাহসী মরে একবার' মনীষীর এই সাহসী উচ্চারণের সাথে সমস্বরে কণ্ঠ মিলিয়ে আমাদেরও অঙ্গীকার ঘোষণা করতে হবে, আর কাপুরুষের মতো মরতে চাই না। বিপন্ন বাংলাদেশকে ঘাতকমুক্ত করার জন্য আবার চাই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ। একাত্তরে আমাদের রাজনৈতিক অবস্থান পরিষ্কার ছিল বলেই আমরা বিজয়ী হয়েছিলাম। এবারও যদি সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করে আবার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ি, তাহলে আমাদের অগ্রযাত্রা হবে অপ্রতিরোধ্য। বিজয় হবে সুনিশ্চিত।

০২.০৩.২০০৫

অষ্টম সংশোধনী এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

ক্ষমতায় যারা আছেন এবং ক্ষমতার বাইরে থেকে যারা আন্দোলনের নামে জনগণকে জিম্মি করে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন তাদেরকে একটি প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই দিতে হবে। দেশটা কারা শাসন করবে? জনগণ, নাকি একাত্তরের ঘাতক দালাল, পতিত স্বৈরাচার, অব. উপাধিধারী সামরিক কর্মকর্তা, সম্পদ লুণ্ঠনকারী ধনিক বণিক চক্র, না সন্ত্রাসী খুনি মাফিয়া বাহিনী? অতি উৎসাহী বুর্জোয়া পত্রিকাগুলো তাদের হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদের ৩০০ আসন দুই বুর্জোয়া দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে ভাগাভাগি করে দিয়ে দিচ্ছে। জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতকে একেবারে মাইনাস না করে কোনো কোনো আসন দেয়া হচ্ছে। এই মিডিয়া মোগলদের কাছেও জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন নেই। দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যারা সমাজের বিবেক বলে বিবেচিত, যারা রাষ্ট্র ও সমাজকে আলোর পথ দেখাতে পারেন তারাও বর্তমানে দুই শিবিরে বিভক্ত। একদল বিএনপি দলীয় জাতীয়তাবাদী ধারায় আর অন্যদল আওয়ামী লীগের দলীয় মুখপাত্র হিসেবে নিজেদের বিলীন করে দিয়েছেন। ক্ষুদ্র একটি অংশ 'না ঘরকা না ঘাটকা' অবস্থায় গ্রাম্য মালজোড়া গানের কবির লড়াইয়ের মতো তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিজেদের অসারতা এবং জ্ঞানের দরিদ্রতা প্রকাশ করে যাচ্ছে। তাই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছেও জনগণের মৌলিক নাগরিক অধিকার হরণের বিষয়টি অনুচ্চারিত। অথচ এই আম জনগণ বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ছয় দফার আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের প্রধান সৈনিক ছিলেন। জনগণের পক্ষে কথা বলার অঙ্গীকার করে যারা জনগণের ভোটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, তারা সংসদে অনুপস্থিত থেকে বেতন ভাতাসহ বিলাসী বিদেশভ্রমণ করছেন। কিন্তু জনগণের পক্ষে কথা বলার

অঙ্গীকার রক্ষা করার দায়বোধ তাদের নেই। আগামী নির্বাচন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও বিরোধীদল বিএনপির দ্বিপক্ষীয় ব্যাপার নয়। তাই ক্ষমতা হস্তান্তর নাকি পদত্যাগ, এসব বিতর্ক অবান্তর। এই অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করে নির্বাচন সম্পর্কে জনমনে অবিশ্বাস ও সন্দেহের জন্ম দেয়া হচ্ছে। জনগণকে অন্ধকারে রেখে গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব নয় এই সত্য আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা এবং বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যত তাড়াতাড়ি অনুধাবন করতে পারবেন, দেশ ও জাতির জন্য তা মঙ্গলজনক হবে।

১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। এইদিনে সামরিক শাসক এরশাদ অবৈধভাবে দখলকৃত ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং বিচারপতি আব্দুস সাত্তার দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু বিচারপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব লাভের পর চার মাসও পেরোয়নি। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল এরশাদ সামরিক শাসন জারি করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। ২৪ মার্চের এই ক্ষমতা দখলকে জনগণ প্রথম থেকেই মেনে নিতে পারেননি। তাই প্রতিবাদের ঝড় উঠতে শুরু করে সর্বত্র। ১৯৮৩ সালের ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রথম সামরিক শাসন অগ্রাহ্য করে রাস্তায় মিছিল বের করলে বর্বরোচিত হামলা চালিয়ে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়, যা নজিরবিহীন ঘটনা হিসেবে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলো এর আগে কোনো আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করতে পারেনি। ছাত্রদের এই সাহসী আন্দোলনের পথ ধরেই রাজনৈতিক দলগুলো যেমন ঐক্যবদ্ধ হয়, তেমনি শ্রমিক-কর্মচারীরাও বলিষ্ঠভাবে মাঠের আন্দোলনে নেমে পড়েন। তাদের সাথে যোগ দেন আইনজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক, কৃষিবিদ, প্রকৌশলী, চিকিৎসকসহ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ। স্থবির রাজনৈতিক অঙ্গন সচল হয়ে ওঠে। একবছর পর ১৯৮৩ সালের ৭ এপ্রিল আওয়ামী লীগ, জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, বাসদ ও ন্যাপসহ ১৫টি রাজনৈতিক দল জোট গড়ে তোলে ৯ এপ্রিল দাবি দিবস পালনের মাধ্যেমে ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ

আন্দোলনের সূচনা করে ১৫ দলীয় জোট। ১৫ দলীয় জোটের ১১ দফা দাবিনামায় ৪ নম্বর দাবি ছিল ৪র্থ সংশোধনী পূর্ববর্তী ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও তার ভিত্তিতে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তাই যারা বলেন বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার কোনো আন্দোলন বা দাবি রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে উচ্চারিত হয়নি সে বক্তব্য সঠিক নয়।

বামধারার রাজনৈতিক দলগুলো এখনো এ দাবিতে অটল আছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গিয়ে কেন এ দাবির বাস্তবায়নে কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেনি, সে প্রশ্নের উত্তর তারাই দিতে পারবেন যারা আওয়ামী লীগের প্রতি দারুণভাবে আশাবাদী এবং বামপন্থীদের প্রতি চরম বৈরিভাবাপন্ন। স্বৈরাচারী এরশাদবিরোধী আন্দোলনে ১৫ দলীয় জোট মাঠে চলে আসার পর বিধ্বস্ত বিএনপি বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে উঠতে শুরু করে এবং ইউপিপি, কমিউনিস্ট লীগসহ কতিপয় দলের সাথে ৭ দলীয় ঐক্য জোট গড়ে তোলে। বিভিন্ন ভাবে নয়, ঐক্যবদ্ধভাবে এরশাদ সামরিক সরকারকে মোকাবিলা করার লক্ষ্যে বৃহত্তর ঐক্যের রাজনীতির সূচনা হয়। অনেক তর্কবিতর্কের পর ১৯৮৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ১৫ দল ও ৭ দলীয় জোট ৫ দফা কর্মসূচিতে স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে ২২ দলের যুগপৎ আন্দোলনের ধারার সূচনা হয় এবং ১৯৮৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর দাবি দিবস পালনের মধ্য দিয়ে ২২ দলীয় জোট আন্দোলনের পথে একসাথে যাত্রা শুরু করে। সামরিক শাসনবিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে ৫ দফা কর্মসূচি ছিল একটি সাহসী পদক্ষেপ।

সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ জনগণের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে ৫ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। যে কর্মসূচির মূল কথা হচ্ছে সামরিক শাসনের অবসান, নিরপেক্ষ সরকার গঠন এবং সার্বভৌম সংসদ নির্বাচন, যা শাসনতান্ত্রিক বিতর্ক নিরসন করবে। ৫ দফার মূল কথা নির্বাচন নয়, মূল কথা হচ্ছে সামরিক স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির কালো হাতকে চিরতরে রুখে দেয়া। এজন্যই দেশে নির্বাচনী প্রক্রিয়া চালু করার পূর্বে সামরিক শাসনের অবসানের দাবি জানানো হয়েছিল। কারণ আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী নেতৃবৃন্দের অজানা ছিল না, এ দাবিকে পাশ কাটিয়ে যদি সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় যে কোনো নির্বাচন দলীয়ভাবে হোক অথবা

নির্দলীয়ভাবে হোক তা সামরিক স্বৈরতান্ত্রিক শক্তিকেই টিকে থাকতে সাহায্য করবে এবং আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনব্যবস্থাকে নবজীবন দেবে। কেননা নির্বাচন মানেই যেমন গণতন্ত্র নয়, তেমনি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা নয় এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাও যে নয়, তা এরশাদের আমলে যেমন প্রমাণিত হয়েছে তেমনি বেগম খালেদা জিয়ার সরকার এবং বর্তমান ক্ষমতাসীন শেখ হাসিনার সরকার তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এরশাদের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন সারা দেশব্যাপী দানা বেঁধে ওঠে। এই সব আন্দোলনের প্রত্যেকটিতেই পুলিশ-মিলিটারির গুলিতে অসংখ্য মানুষ জীবন দান করেছেন। সামরিক শাসনবিরোধী এই সংগ্রাম অনেকবার ওঠানামা করেছে। কখনো কখনো বুর্জোয়া নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়েছে, কিন্তু আবার তা জেগে উঠেছে। এরশাদ ও সামরিক আমলাতন্ত্র চেয়েছিল সংবিধানে এমন ব্যবস্থা রাখতে যাতে সামরিক বাহিনী স্থায়ীভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু প্রবল গণআন্দোলনের মুখে তাদেরকে সেই উচ্চভিলাষ ত্যাগ করতে হয়। এই উচ্চভিলাষ বাস্তবায়নে এরশাদ ব্যর্থ হয়ে সামরিক শাসনকে বেসামরিকীকরণের উদ্যোগ নেন। এজন্য যেনতেন প্রকারের একটা নির্বাচন করা দরকার হয়ে পড়ে। কিন্তু ছাত্র, শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রেণী-পেশার মানুষ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সামরিক শাসনের অধীনে নির্বাচন হতে দেবে না বলে ঘোষণা করে। ফলে এরশাদ উপজেলা নির্বাচন, সংসদ নির্বাচন এমনকি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেও সেসব নির্বাচনের তারিখ স্থগিত করতে বাধ্য হন। ১৯৮৬ সালের ১৭ মার্চে সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের বাসভবনে প্রথমবারের মতো ২২ দলের নেতৃবৃন্দ বৈঠকে বসে এক যুক্তবিবৃতিতে ঘোষণা করেন সামরিক শাসনের অধীনে যারা সামরিক শাসক এরশাদ ঘোষিত ২৬ এপ্রিলের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে, তাদের জাতীয় বেঈমান হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। এই বৈঠক থেকেই প্রহসনের নির্বাচন বর্জন ও প্রতিহত করার আহ্বান জানিয়ে ২২ দলের পক্ষ থেকে ১৯৮৬ সালের ২০ মার্চ যৌথ মিছিল, ২১ মার্চ যৌথ মশাল মিছিল এবং ২২ মার্চ সকাল-সন্ধ্যা হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ২১ মার্চ মশাল মিছিল শেষে হঠাৎ করেই শোনা গেল, জেনারেল এরশাদ রাত পৌনে ৮টায় বেতার ও টিভিতে অনির্ধারিত ভাষণ দেবেন।

জেনারেল এরশাদ ভাষণ দিলেন এবং বিরোধীদলের প্রতি হুমকি দিলেন ভোর ৫টার মাধ্যে নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত না নিলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। কেউ যদি রাজনীতি করে তাহলে তার সাথে তর্ক চলে। কিন্তু যেখানে রাজনীতি নেই, সেখানে কোনো যুক্তিই চলে না। তাই ঘটে গেল ১৯৮৬ সালের ২১ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে অনুষ্ঠিত ১৫ দলের বৈঠকে। সে বৈঠকে আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ যেমন সামরিক শাসক এরশাদের হুমকির মুখে নতি স্বীকার করে এবং এরশাদের শর্ত মেনে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে অবস্থান নিলেন, তেমনি তাদের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করলেন কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড ফরহাদ, ন্যাপ নেতা মোজাফফর আহমদ, সাম্যবাদী দলের নেতা মোহাম্মদ তোয়াহসহ ১৫ দলের অন্তর্ভুক্ত ৮টি দলের নেতৃবৃন্দ। বৈঠকে যখন নির্বাচনে যাওয়া না যাওয়া নিয়ে চরম বিতর্ক চলছে, ঠিক সে সময় শেখ হাসিনা ঘোষণা করলেন ১৫ দলের সভায় বসে সিদ্ধান্ত জানাবেন। ৩০ মিনিট পর আবার ১৫ দলের বৈঠক বসে এবং কোনো আলোচনা ছাড়াই বঙ্গবন্ধুর বিরাট ছবির নিচে বসে এরশাদের হুমকির কাছে আত্মসমর্পণ করে শেখ হাসিনা নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দিলেন। শেখ হাসিনা সেদিন বিধ্বস্ত অবস্থায় বলেছিলেন 'আমার দলের সবাই নির্বাচনে যাওয়ার পক্ষে। তাই দল রক্ষার্থে আমার নির্বাচনে যাওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।' যে বঙ্গবন্ধু ভবন ছিল বাংলার মানুষের আন্দোলনের প্রতীক, যে ভবন থেকে বঙ্গবন্ধু আজীবন বাঙালির অধিকারের কথা বলেছেন, দিয়েছেন আন্দোলনের দিকনির্দেশনা, সে ভবন থেকেই বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা এক সামরিক স্বৈরশাসকের কাছে আত্মসমর্পণের ঘোষণা দিলেন। সমাজে একটা কথা চালু আছে 'কেউ দেখে শেখে, কেউবা ঠেকে শেখে'। আবার খুবই নগণ্য হলেও এমন কয়েকজন আছেন 'যারা দেখেও শেখে না, ঠেকেও শেখে না'। শেখ হাসিনা যে 'দেখেও শেখেন না, ঠেকেও শেখেন না' সে প্রমাণ অতীতে তিনি একাধিকবার দিয়েছেন এবং এখনও এরশাদকে নিয়ে যে কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলা খেলছেন তাতে তাঁর উপর আশাবাদী হওয়ার কোনো কারণ নেই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেছিলেন 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না আমি বাংলার মানুষের অধিকার চাই।' এই ঘোষণার প্রতি তিনি আন্তরিক

ছিলেন। তাই জেল-জুলুম এমনকি ফাঁসির রজ্জুও তাঁকে তার আদর্শ থেকে টলাতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন তাঁর কোনো বিকল্প নেই। শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রক্তের উত্তরাধিকার হিসেবে এখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেননি। এরশাদ, গোলাম আযম, আ স ম রব কিংবা আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর সাথে আপস করে বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী হওয়া যায় না।

আওয়ামী লীগসহ ৮ দলের এই ডিগবাজি কেউ কোনো সময় কল্পনাও করেননি। এ সময় ৫ দফার ভূলুণ্ঠিত পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরার অঙ্গীকার ঘোষণা করে ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ, দুই বাসদ এবং শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল। ১৯৮৬ সালের ৭ মে সামরিক শাসনের অধীনে ভোটারবিহীন সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তখনকার পত্রপত্রিকার সংবাদ প্রতিবেদনে ১০ থেকে ১৫ ভাগ ভোটারের ভোটকেন্দ্রে হাজির হওয়ার কথা বলা হয়। শেখ হাসিনা প্রথমে ভোট ডাকাতির কথা বললেও কোনো আন্দোলনের ঘোষণা দিলেন না। তাই এরশাদ নিরাপদেই বহাল থাকলেন। ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর যারা কয়েকদিন আগে নির্বাচন বর্জনের নীতি গুঁয়ার্তুমি ছাড়া আর কিছু নয় বলেছিলেন, তারাই চার মাসের ব্যবধানে নির্বাচন বর্জনের নীতিতে ফিরে এসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিলেন। কিন্তু ভোট ডাকাতির সংসদ থেকে বেরিয়ে আসতে রাজি হলেন না। এই ভোট ডাকাতির নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও সংসদ অধিবেশনে যোগ দিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে ক্ষতি করলেন শেখ হাসিনা এবং এরশাদের অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করার সুযোগ করে দিলেন এ নিয়ে আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের কোনো উচ্চবাক্য নেই। এসব ব্যাপারে তাদের কলমের কালি ফুরিয়ে যায়। অথচ বাংলাদেশের বামপন্থী আন্দোলনের কোনো নেতা কি করলেন অথবা কি লিখলেন তার জবাব কি এবং তাদেরকে ঘায়েল করার জন্য দিস্তা দিস্তা কাগজ অপচয় করতে তাদের রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু করতে দেখা যায়।

১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর ভোট ডাকাতির তথাকথিত সংসদে ২২৩ জন ভোট ডাকাত সদস্যের ভোটে ৭ম সংশোধনী গৃহীত হয়। ৬ষ্ঠ সংশোধনীর মাধ্যমে সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান তার সকল

অপকর্মকে সাংবিধানিক বৈধতা দিয়েছিলেন। ৭ম সংশোধনী গৃহীত হওয়ার সময় শেখ হাসিনা ও ৮ দলীয় সাংসদগণ সংসদে অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে সংসদে ঝাঁকিয়ে বসলেন এবং চালু করতে সাহায্য করলেন ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংশোধনীর মতো অগণতান্ত্রিক বিধিবিধানগুলো। সংসদকে তাই পরোক্ষ স্বীকৃতি প্রদান করা হলো। ভোটডাকাত ও জামায়াতিদের সাথে বসে হেসে খেলে সংসদ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করলেন শেখ হাসিনা। ঘাতক জামায়াতকে সংসদীয় রাজনীতিতে বৈধতার ছাড়পত্র দিলেন এরশাদ এবং সংসদে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ করে দিলেন শেখ হাসিনা। তিন জোটের সংগ্রামে গতিহীনতা, ঐক্যের মধ্যে অনৈক্যের সুর এরশাদকে সাহসী করে তোলে। ভোটের রাজনীতিতে পরাজিত হয়ে এরশাদ ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। অথচ ব্যক্তিগত জীবনে এরশাদ ধর্মীয় অনুশাসন পালন তো দূরের কথা, বরং ধর্মীয় আচার আচরণের বিপরীতে ছিলেন। ১৯৮৮ সালের ১৩ মার্চ বরিশালের শর্ষিণায় এক ধর্মসভায় ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার ইঙ্গিত দেন। কিন্তু তা প্রতিরোধ করার মতো অবস্থা তিন জোটের ছিল না। ঐক্যের রাজনীতি পরিহার করতে তখন সবাই ব্যস্ত। ১৯৮৮ সালের জুন মাসের প্রথম দিকেই ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে রাষ্ট্রধর্ম বিল পাস হয় অবৈধ সংসদে। গৃহীত হয় ৮ম সংশোধনী। ৮ম সংশোধনী বাতিলের দাবিতে ১৯৮৮ সালের ১২ জুন সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। ৮ম সংশোধনীর বিরোধিতা করে বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে জামায়াতও বক্তব্য রেখেছে। সংশোধনী আসার পর দেশে ধর্মকে ব্যবহারকারীর রাজনীতিতে উগ্রতা বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রদায়িক শক্তি শুধু মাথাচাড়া দিয়ে উঠল না, সশস্ত্র আক্রমণও শুরু করল। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির যে সর্বনাশা আগ্রাসন সুশীল সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য হুমকির কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে, এরশাদের রাষ্ট্রধর্ম বিল হচ্ছে এই আগ্রাসনের প্রধান বিষবৃক্ষ। তাই এই বিষবৃক্ষের মূলোৎপাটন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

আওয়ামী লীগই বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান শক্তি। স্বাভাবিকভাবেই আওয়ামী লীগের রাজনীতি এবং মতাদর্শিক অবস্থান এ দেশের গোটা রাজনৈতিক গতিধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে, প্রভাবিত করে। সে কারণেই মুক্তিযুদ্ধের প্রধান শক্তি আওয়ামী লীগ নেত্রী যখন বলেন—

বিসমিল্লাহর জন্য আমরা জীবন দেব তখন অতি অনায়াসেই জামায়াতের ধর্মীয় মৌলবাদী রাজনীতিকে উস্কে দেয়া হয়, বৈধতা দেয়া হয়। জামায়াতের রাজনীতির সাথে আওয়ামী লীগ রাজনীতির তখন আর কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না । প্রাক্তন আলবদর কমান্ডার কামরুজ্জামানের কাছে থেকে মুজিবকন্যা যখন উপঢৌকন গ্রহণ করেন, তখন ত্রিশ লাখ শহীদ হত্যার নারকীয় অপরাধ ক্ষমা পেয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের অহংকারকে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। সর্বোপরি ১৯৯১ সালের অক্টোবরে জামায়াতের সাথে আওয়ামী লীগের প্রকাশ্য ও আনুষ্ঠানিক বৈঠক এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী বদরুল হায়দার চৌধুরী কর্তৃক গোলাম আযমের কদমবুচির মধ্য দিয়ে একাত্তরে জামায়াতের সকল নৃশংস কর্মকাণ্ড—হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনকে বৈধতা দেয়া হয়। আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় গিয়ে পূর্বের অঙ্গীকার করা ৮ম সংশোধনীসহ সংবিধানের সাথে অবৈধভাবে সংযোজিত অগণতান্ত্রিক বিধিবিধানগুলো বাতিল করার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ তো দূরের কথা, এসব বিধিবিধানের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দও উচ্চারণ করেনি। তাই বলা যায়, আওয়ামী লীগ রাজনীতিতে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' কেবল ফাঁকা স্লোগান মাত্র, নীতিমালা হিসেবে বিবেচ্য নয়। নীতিমালা মানে এই নয় যে, বিশেষ বিশেষ সময়ে জামায়াতকে স্বাধীনতার শত্রু বলে গালি দেয়া আর প্রয়োজন হলেই তাদের সাথে সহযোগিতা ও সমঝোতার রাজনীতি করার ব্যাপারে একমত হওয়া। স্বৈরাচারী এরশাদের সাথে আওয়ামী লীগের অনৈতিক মিতালী তাদের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত করে দিচ্ছে। এরশাদের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের তাৎপর্য খুবই গভীর। এর ফলে সামরিক আমলাতন্ত্রের ক্ষমতাগ্রহণের ও জবরদস্তিমূলক শাসন চাপিয়ে দেবার আশঙ্কা অনেকটা কমেছে। কিন্তু এই আন্দোলনের দুর্বলতাও ছিল অনেক। যে কারণে এতবড় বিজয়ের পরও জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা এখনও পূরণ হয়নি। ভবিষ্যতে শ্রমজীবী মানুষসহ মধ্যবিত্ত তথা গোটা জনগণের প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার ও শোষণমুক্তির সংগ্রামই কেবল এই নীতিহীন-আদর্শহীন রাজনীতির অবসান করে নতুন আলোর পথের দিকনির্দেশনা দিতে পারে। আমাদের সে দিনের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

১০.০৪.২০০১

‘ব্লাডি সিভিলিয়ান’দের জন্য শোক প্রকাশের কেউ নেই

বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সময় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীন বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল দর্শন ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র। এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য বাঁশের লাঠি নিয়ে কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-জনতা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন হানাদার পাক বর্বর-বাহিনীর বিরুদ্ধে। নয় মাস মরণপণ যুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিলেন। প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের জনক হচ্ছেন বাংলাদেশের জনগণ। তৎকালীন পাকিস্তান সামরিক বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেশ কিছুসংখ্যক বাঙালি সেনা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে অবদান রেখেছিলেন এ সত্য অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, তাদের অধিকাংশই তৎকালীন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাক বর্বর-বাহিনীর গণহত্যা শুরু হওয়ার পর। বলা যায়, সেনা সদস্যরা প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে অস্ত্র তুলে নেন এবং প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম এ জি ওসমানী বলেন, ‘যদি পাকিস্তানীরা নির্দিষ্ট রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধেই তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করত, তাহলে সামরিক বাহিনী ও পুলিশের বাঙালি সদস্যরা হয়তো নিরপেক্ষ থেকে যেত। যখন চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সাথে সাথে বিভিন্ন বাহিনীর লোকদেরও হত্যা শুরু করেছে, তখনই কেবল আমরা এক হয়ে বিদ্রোহ শুরু করলাম।’ তাই বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধে যেসব সামরিক অফিসার অংশ নিয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে দেশপ্রেমের সাথে সাথে নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদও ছিল। অগণিত সাধারণ জনগণের তুলনায় মুক্তিযুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণ নগণ্যই ছিল বলা যায়। তাদের একটি ক্ষুদ্র অংশই মুক্তিবাহিনীর সাথে অঙ্গীভূত

এবং মুক্তিবাহিনীর আদর্শ-উদ্দেশ্যের সাথে একীভূত হয়ে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীন থেকেই যুদ্ধ করেছেন। আবার এমন অনেকেই আছেন যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েও তাতে যোগ দেননি।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ১১০০ অফিসারসহ ২৮ হাজার বাঙালি সেনাসদস্য তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন। এসব সেনাসদস্য স্বাধীনতার বহু পরে প্রত্যাবাসিত হয়ে বাংলাদেশে এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদানের সুযোগ লাভ করেন। অথচ স্বাধীন বাংলাদেশে যে ৯৫ হাজার পাকিস্তানি সেনাসদস্য আত্মসমর্পণ করে, তারা সিমলা চুক্তির মাধ্যমে পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার পর একজন সেনাসদস্যকেও সে দেশের সেনাবাহিনীতে নেয়া হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সময় মাত্র ২০ জনের মতো সামরিক-বাহিনীর অফিসার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মাত্র ৩ হাজার এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের ১০ হাজার সদস্য অংশগ্রহণ করেন। অপরদিকে মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্রসমাজ, শিক্ষক, কর্মচারী, সাংবাদিক, বিভিন্ন পেশার নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জনগণ, শিল্প শ্রমিক ও কৃষিজীবীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল সত্যিকার অর্থে অন্যতম নির্ধারক শক্তি। মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সাথে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে অংশগ্রহণের জন্য প্রায় আড়াই লাখ স্বেচ্ছাসেবী ১২০টি ট্রানজিট ক্যাম্পে রিপোর্ট করেন। এদের অধিকাংশই ছিলেন গোটা বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনীর নগণ্য সংখ্যক সদস্য অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছেন সে সত্য যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র বা অনন্য নায়ক হিসেবে তুলে ধরার প্রবণতা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত স্থিতিকাল কেবল একাত্তরের নয় মাসই নয়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ২৪ বছরের পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে একটানা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কর্মী-সমর্থক, ছাত্রসমাজ, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, কৃষক-শ্রমিকের লাগাতার

আন্দোলন পরিচালনার ফলেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সম্ভব হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে, কোনো সামরিক নেতার নামে যুদ্ধ হয়নি। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর মুক্তিযুদ্ধে সাহসিকতার জন্য রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদক 'বীরশ্রেষ্ঠ' পদক পেলেন ৭ জন সেনাসদস্য। মুক্তিযুদ্ধে অসংখ্য সাহসিকতাপূর্ণ অবদান রাখার পরও সাধারণ জনগণ অর্থাৎ 'ব্লাডি সিভিলিয়ান' কোনো 'বীরশ্রেষ্ঠ' পদক পেলেন না।

বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্তে অনেক সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেও প্রকাশ্যে কোনো কিছু বলার তখন উপায় ছিল না। রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পদক 'বীরশ্রেষ্ঠ' একতরফাভাবে সেনা-সদস্যদের প্রদান করার ফলে বাংলাদেশের বেসামরিক সরকারের ভিত্তি যে 'জলপাই রং' এর পোশাকের উপর নির্ভরশীল, সে সত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গণতন্ত্র কার্যকর করতে হলে সামরিক বাহিনী থাকতে হবে রাজনৈতিক কমান্ডের অধীনে। গণতন্ত্রে সামরিক বাহিনীর রাজনীতি চর্চা, ক্ষমতা দখল, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে আরোহণ শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার সমান অপরাধ। এই অপরাধ করেছেন জিয়াউর রহমান ও এইচ এম এরশাদ। কিন্তু এজন্য তাদের বিচারের সম্মুখীন হতে হয়নি। রাজনীতিবিদদের গালি দিয়ে, অপমান ও নির্যাতন করে বেসামরিক নেতৃত্বকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে রাষ্ট্রক্ষমতা জবরদখলকারী জিয়া ও এরশাদ সামরিক জান্তা বাংলাদেশে প্রায় ১৫ বছর সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র, মুৎসুদ্দি পুঁজি এবং আন্তর্জাতিক পুঁজির যৌথ ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট স্বার্থসমূহের বাস্তবায়ন ও পরিপোষণের কাজেই রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এতে সামরিক বাহিনীর কর্পোরেট স্বার্থ সর্বাধিক হাসিল হয়েছে সত্য, কিন্তু দেশের জনগণের সুন্দর ও সুদিনের প্রত্যাশার কবর রচনা করা হয়েছে। জিয়া ও এরশাদ তাদের নিজেদের হীনস্বার্থে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্র ও সরকারে সামরিকীকরণ করেছেন। বাংলাদেশে বারবার রক্তাক্ত অভ্যুত্থান-পাল্টা-অভ্যুত্থান হয়েছে। দুজন রাষ্ট্রপতি হত্যা, জেলে চার জাতীয় নেতা হত্যার সাথে সেনাবাহিনীর সদস্যরাই জড়িত। আরো হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা সেনাসদস্যকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। হত্যার মাধ্যমে সামরিক বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের সরানো হয়েছে। আর এসব হত্যার প্রধান নায়ক হচ্ছেন

সেনাশাসক জিয়াউর রহমান। বর্তমানে সামরিক বাহিনীর জেনারেলগণ, অফিসারবৃন্দ ও সৈনিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হয় পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবাসিত, নতুবা মুক্তিযুদ্ধের পরের বা সাম্প্রতিক কয়েক বছরের রিক্রুটমেন্টের ফসল।

অনেকেই বাংলাদেশের আজকের রাজনৈতিক সংকটের জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বকে দায়ী করেন। তারা ভুলেও 'জলপাই রং'-এর পোশাকের জিয়া ও এরশাদের অপকর্মের রাজনীতির কথা একবারও উচ্চারণ করেন না। সেনাবন্ধু নামে খ্যাত রাজনীতিবিদ মওদুদ আহমদের কথা একবারও তাদের মুখ থেকে ধিক্কারের সাথে উচ্চারিত হয় না। আমাদের 'জলপাই রং'-এর সেনাসদস্যরা দুজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে হত্যার মাধ্যমে দেশে যে উর্দিপরা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস শুরু করেছিলেন, সে ধারাবাহিকতার ফসলই আজকের বাংলাদেশ।

বর্তমান রাষ্ট্রক্ষমতায় একাত্তরের ঘাতক নিজামী ও মুজাহিদকে বসার সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন জিয়াউর রহমান। বেগম খালেদা জিয়া সে ধারাবাহিকতা রক্ষা করবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সরকারি বাসভবনে না থেকে উত্তরপাড়ার সেনাভবনে থাকার নেপথ্য কারণ হচ্ছে 'ব্লাডি সিভিলিয়ান'দের ওপর তাঁর কোনো আস্থার জায়গা নেই। অন্য কারণ হচ্ছে বিএনপির সূতিকাগার তো হচ্ছে সেনানিবাস। বিএনপিকে তো সেনাবাহিনীর আস্থাশীল দল বলা হয়ে থাকে। অপরদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন স্বাধীন বাংলার মসনদ গ্রহণ করেই 'জলপাই রং'-এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন, শেখ হাসিনা তো এর বাইরে যাওয়ার কথা নয়। শেখ হাসিনার পাঁচ বছরের ক্ষমতাকালীন 'জলপাই রং'-এর পোশাক পরিধান করে তাঁকে বিভিন্ন সেনানিবাসে বক্তব্য রাখতে দেখা গেছে। সেনাবাহিনীর জন্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। কিন্তু তারপরও শেষ রক্ষা হয়নি। অনেকের ধারণা, সেনাবাহিনীর আস্থাহীনতার জন্যই তাকে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে হয়েছে। সেনাবাহিনী হচ্ছে এ দুটি দলের পাওয়ার বেজ। তাই এই পাওয়ার বেজকে পক্ষে রাখার জন্য রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলে। এ প্রশ্নে বিএনপি-আওয়ামী লীগের কোনো তফাৎ নেই, সবাই এক। প্রতিযোগিতা চলছে পাওয়ার বেজকে খুশি রাখার। তাই বেনিনে ১৫ জন

সেনাসদস্য বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার পর রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয় এবং লাশ গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিমানবন্দরে গিয়ে লাশের কফিন গ্রহণ করেছেন।

বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বিমানবন্দরে লাশের কফিন গ্রহণের জন্য মর্যাদায় যিনি তাঁর নিচে, সেই সেনাপ্রধানের কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু বিরোধীদলীয় নেত্রীর সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। সাহসই হচ্ছে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রধান বাহন। শেখ হাসিনার দেহে বঙ্গবন্ধুর রক্ত প্রবহমান, কিন্তু তিনি বিমানবন্দরে ছুটে গিয়ে সাহসের প্রমাণ দিতে পারলেন না।

১৫ জন সেনা কর্মকর্তার মৃত্যুতে সংবাদপত্রে লেখা হয়েছে 'জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান'। এমনকি তাদের 'শহীদ' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। 'শহীদের সংজ্ঞা আগেই পাল্টানো হয়েছে এবার সে বিভ্রান্তিকে আরো শক্ত করা হলো। সরকারিভাবে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করে পালন করা হয়েছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহে ৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে, এর আগে মঙ্গায় মারা গেছেন অনেক মানুষ। প্রতিদিন দেশে গড়ে ১৬ জন মানবসন্তান প্রাণ হারাচ্ছেন বলে সংবাদপত্র সূত্রে জানা যায়। লঞ্চ দুর্ঘটনায় শত শত মানুষের মৃত্যু হয়। অপারেশন ক্লিনহার্টে পিটিয়ে ৫২ জন মানুষকে হত্যা করা হয় এবং জাতীয় সংসদে 'ইনডেমনিটি' করে খুনিদের খুশি করার জন্য মানুষ হত্যার লাইসেন্স জায়েজ করা হলো। ২০০৩ সালে খুন হয়েছেন ৩ হাজার ৯২০ জন। এই যে হত্যার হোলিখেলা চলছে, এসব মানবসন্তানের মৃত্যুর জন্য সরকার কোনো জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করে না। এসব লাশ গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী তো দূরের কথা, কোনো সরকারি কর্মকর্তাও ছুটে যান না। এইসব মৃত মানুষগুলোকে কেউ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানের মর্যাদায় ভূষিত করা হয় না। এর একমাত্র কারণ, এরা যে 'ব্লাডি সিভিলিয়ান'। তাই স্পষ্টভাবে বলতে চাই, দেশের সাধারণ নাগরিক বা 'ব্লাডি সিভিলিয়ান' হোক সবার জন্যই মৃত্যু সমান শোকের, সমান দুঃখের।

যেসব সেনাসদস্য বেনিনে বিমান দুর্ঘটনায় ট্রাজিক মৃত্যুর শিকার হয়েছেন তাদের পরিবার পরিজনের আর্ত আহাজারি যেমন আমরা সংবাদপত্রে পড়েছি, তেমনি তাদের মতো কাঁদেন, দুঃখ করেন সন্ত্রাসীদের

হাতে নিহত কিংবা লঞ্চডুবিতে নিহত অসহায় যাত্রীদের স্বজনরা। মৃত্যু যেভাবেই হোক না কেন, সব মৃত্যুই শোকের। এতে কোনো পার্থক্য নেই, পার্থক্য টানা উচিত নয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আমরা মৃত্যুতে মৃত্যুতে পার্থক্য তৈরি করেছি। মৃত্যুকে নিয়ে রাজনীতি করছি। আমরা অবশ্যই বেনিনে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ১৫ জন সেনা কর্মকর্তার মৃত্যুতে শোক দিবস পালন করব, নিশ্চয়ই আমরা মর্মাহত এই ট্রাজেডিতে। কিন্তু প্রতিদিন যে দেশে ১৬ জন মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, শীতে মৃত্যু হচ্ছে, লঞ্চডুবিতে মৃত্যু হচ্ছে, মঙ্গায় মারা যাচ্ছেন তাদের জন্য জাতীয় শোকদিবস পালিত হবে না কেন? 'ওরা ব্লাডি সিভিলিয়ান' বলে? গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের এ আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাই এখনই সময় এ ব্যাপারে প্রতিবাদী হওয়ার। আমাদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে যারা 'জলপাই রং'-এর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাদের বয়কট করার এখনই সময়।

০৭. ০১.২০০৪

হাইকোর্টের রায় ও ফতোয়াবাজদের হুংকার

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায়, গভীর রাতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত আসামিকে জামিন প্রদান, বিচারকদের বিব্রতবোধ ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের উচ্চতর বিচার বিভাগ যখন সর্বমহলে তীব্রভাবে আলোচিত-সমালোচিত এবং নানা প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হচ্ছিল, ঠিক সেসময় উচ্চতর বিচার বিভাগের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে দিয়েছেন দুজন বিচারপতি। নতুন বছরের প্রথম দিনে হাইকোর্টের বিচারপতি মোঃ গোলাম রব্বানী ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা এক ঐতিহাসিক রায়ে সব ধরনের ফতোয়াকে সম্পূর্ণভাবে বেআইনি ঘোষণা করেছেন। রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, ফতোয়া একটি আইনি মতামত এবং দেশের সংবিধান অনুযায়ী কেবল আদালতই এ ধরনের মতামত দেয়ার অধিকার রাখেন। অননুমোদিত কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার জারি করা সব ধরনের ফতোয়াকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করে আইন প্রণয়নের জন্য আদালত থেকে জাতীয় সংসদের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়া উক্ত রায়ে সকল স্কুল ও মাদ্রাসায় মুসলিম পরিবারিক আইন ও অধ্যাদেশ পাঠ বাধ্যতামূলক করার জন্য এবং সকল মসজিদের খতিব যেন শুক্রবারে এই অধ্যাদেশটির বিষয়ে আলোচনা করেন, সে নির্দেশ দানের সুপারিশ করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হিসেবে একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সংবিধান অনুসারে আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য আদালত সুপারিশ করেছে। উচ্চ আদালত সম্পর্কে জনমনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া, আস্থাহীনতা এবং নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, এই রায় ঘোষণার পর তা অনেকখানি দূর হয়েছে।

কিন্তু এই যুগান্তকারী রায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের ফতোয়াবাজ মুফতি ফজলুল হক আমিনীসহ চিহ্নিত ফতোয়াবাজরা ক্ষেপে উঠেছেন। মুফতি ফজলুল হক আমিনী ফতোয়া সম্পর্কে রায় প্রদানকারী দুই বিচারপতিকে

মুরতাদ ঘোষণা করেছেন এবং আরেক ফতোয়াবাজ চট্টগ্রামের পটিয়া মাদ্রাসার প্রধান মুফতি মুহাম্মদ ইসহাক গাজী এই রায় সমর্থনকারী সবাইকে মুরতাদ ও ধর্মদ্রোহী ঘোষণা দিয়েছেন। তাদের এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ধর্মের নাম ব্যবহার করে ফায়দা লুটার ও স্পর্ধা কতটুকু বেড়েছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মুফতি ফজলুল হক আমিনী এবং তার সহযোগীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি নিয়ে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলেও তার বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনো আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় সাধারণ মানুষ দারুণভাবে ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত। সর্বমহলে প্রশ্ন উচ্চারিত হচ্ছে, আদালত সম্পর্কে মন্তব্য করায় প্রধানমন্ত্রীকে যদি আদালতের মুখোমুখি হতে হয়, তবে এই ফতোয়াবাজ মাওলানারা কেন ছাড় পাচ্ছেন? নানা ঘটনায় হাইকোর্ট যেখানে সুয়োমটো রুলনিশি জারি করে, কিন্তু মুফতি আমিনীর ব্যাপারে তারা নিশ্চুপ কেন? জামিন বিষয়ে প্রশ্ন তোলায় প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বার অ্যাসোসিয়েশন নেতারা আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেছিলেন, অথচ হাইকোর্টের রায় ও দুজন বিচারপতিকে মুরতাদ ঘোষণার পর তাদের রহস্যজনক নীরবতা বিস্ময়কর। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয়, দেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলেকে ফতোয়াবিরোধী হাইকোর্টের এই রায়কে অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। আগামী নির্বাচনে ভোটাররা ফতোয়াবাজদের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন, এই ভয়ে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতার বাইরে বড় দলগুলো তাদের মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছে। এসব বড় রাজনৈতিক দলগুলোর সত্য, ন্যায় এবং জনগণের প্রতি তাদের যে কোনো দায়বদ্ধতা নেই, রায় সম্পর্কে তাদের নীরবতা সে বাস্তবতাই প্রমাণ করে। বড় রাজনৈতিক দলগুলোর এই নির্লিপ্ততা ফতোয়াবাজদের সাহসী করে তুলেছে।

সত্তর দশকে বর্তমান বাংলাদেশ যখন পাকিস্তানের অংশ ছিল তখন পাকিস্তানেরই এক কুলাঙ্গার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন রেডিও ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিকসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই ঘোষণার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। জনপ্রতিরোধের মুখে সরকার সে ঘোষণা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র-পরিচালক শহীদ জহির রায়হানের অমর সৃষ্টি 'জীবন থেকে নেয়া' ছায়াছবি নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে ছাত্রজনতার

প্রতিরোধের মুখে সে ছায়াছবি মুক্তি দিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে জনতার সে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ নেই বলেই প্রতিক্রিয়াশীলদের লাশ জিন্দা হয়ে প্রগতির ধারাকে বারবার আঘাত করছে। বড় রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব আপসকামিতার পঙ্কিল আবর্তে বন্দি যে কারণে একাত্তরের ঘাতক দালালদের যেমন বিচার হয়নি, তেমনি অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী সামরিক স্বৈরশাসক যাদের বুটের তলায় বারবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছে আমাদের পবিত্র সংবিধান, তাদেরও কোনো বিচার হয়নি। বরং এই স্বাধীন দেশে পাক বর্বর-বাহিনীর সহযোগী ঘাতক দালালদের স্বাধীনতার পুরস্কার পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের নির্লিপ্ততার কারণেই অতি কৌশলে ও ধূর্ততার মাধ্যমে একাত্তরের ঘাতক দালালরা ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে বিষাক্ত করে তুলেছে বাংলাদেশ। এই নরকের কীটগুলো তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য কখনো আশ্রয় নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী বলে দাবিদার আওয়ামী লীগের ছায়াতলে, আবার বর্তমানে জাতীয়তাবাদীদের আখড়া বিএনপির'র ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে। মৌলবাদী তৈরির প্রশিক্ষণ ও সহায়তাদানের কারখানা শুধু মাদ্রাসা নয়, 'প্রবাহ-ইনডেক্স—রেটিনা' নামের কোচিং সেন্টার, 'আইডিয়াল স্কুল', চিকিৎসা সেবার নামে 'ইবনে সিনা', 'ফুলকুঁড়ির আসর', 'দর্পণ ক্লাব', 'দারুশ শেফা' এবং ইসলামী ব্যাংকগুলোও। সর্বক্ষেত্রে বিশাল ও বিষাক্ত জাল বিস্তার করে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। আজ ফজলুল হক আমিনীসহ মৌলবাদীরা উচ্চ আদালতের রায় সম্পর্কে যে হুংকার উচ্চারণ করছে, সে সাহস একদিনে তৈরি হয়নি। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি ও প্রগতিবাদীদের নির্লিপ্ততার কারণেই তাদের এই বাড় বেড়েছে। তাদের ক্ষুরধার নখদন্ত যদি এখনই উপড়ে ফেলার জন্য জনপ্রতিরোধ সৃষ্টি করা না যায়, তাহলে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির বিপর্যয় ঠেকানো কঠিন হবে। তাই এখনই সময় মৌলবাদ প্রতিরোধের ডাক দেয়ার। উচ্চ আদলতের রায় বাংলাদেশে জাগ্রত জনতার প্রত্যাশার প্রতিফলন। তাই জনপ্রতিরোধের মাধ্যমে গণজাগরণ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন একাত্তরের চেতনা এবং সাহস।

মৌলবাদ কি— বাংলাদেশের মানুষের তা অজানা নয়। ১৯৭১ সালে 'ধর্মরক্ষার' নামে মৌলবাদীরা বাংলাদেশের মাটিতে যে সহিংসতা আর গণহত্যা চালিয়েছে, তা ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই বাংলার ঘরে ঘরে

আজো মৌলবাদী সেসব নরপিশাচদের বিরুদ্ধে মানুষের ঘৃণা আর ধিক্কার উচ্চারিত হয়। মৌলবাদ হচ্ছে সমাজ-সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানবিরোধী একটি দুষ্ট ক্ষত। ধর্মকে ব্যবহার করে ওরা হিংস্রতায় মেতে ওঠে। মৌলবাদ বিনষ্ট করছে মানুষের শান্তি, থামিয়ে দিচ্ছে প্রগতির ধারা এবং ব্যঙ্গ করছে সমাজ সভ্যতাকে। মৌলবাদীরা ধর্মের সর্বজনীন মর্মবাণীর সাথে কুসংস্কার আর অলীক বিশ্বাসের যোগসূত্র তৈরি করে নিজেদের মনগড়া মতবাদ আবিষ্কার করে। তাদের এই মতবাদ যে প্রকৃত ধর্মীয় মতবাদ নয়, তা জনগণের কাছে গোপন থাকে না। তাই তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শক্তি প্রয়োগের পথ বেছে নেয়। বেছে নেয় ধর্মের লেবাসে সন্ত্রাসের পথ। মৌলবাদ ধর্মকে যেমন তাদের রুটি-রুজির প্রধান মাধ্যম মনে করে, তেমনি ধর্মকে ব্যবসায়িক পণ্য ও সামাজিক কর্তৃত্বের হাতিয়ার মনে করে। মৌলবাদ মানুষকে বর্বর অমানুষে পরিণত করে। এর প্রমাণ মানুষ দেখেছেন ১৯৭১ সালে এবং ১৯৭৫ পরবর্তী বছরগুলোতে। দেখেছেন আফগানিস্তানে, ফিলিস্তিনে ও বসনিয়ায়। মৌলবাদীদের সাধারণ চরিত্র হলো এরা খুবই কলহপরায়ণ ও মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগী। যেখানেই মৌলবাদ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, সেখানেই শান্তি নির্বাসনে গেছে। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। পাকিস্তানের জ্ঞানপাপী মৌলবাদী মাওলানা আবুল আলা মওদুদী ১৯৫৩ সালে মুসলমান ও কাদিয়ানীদের মধ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করে শত শত কাদিয়ানীকে হত্যা করে। এই হত্যার অপরাধে আদালতে মাওলানা মওদুদীর ফাঁসির আদেশ হয়। কিন্তু স্বৈরাচারী জেনারেল আইয়ুব তাকে ক্ষমা করে দেয়। মাওলানা মওদুদীর অনুসারী যারা একাত্তরের গণহত্যার প্রধান নায়ক— সেই গোলাম আযম, মতিউর রহমান নিজামী, দেলওয়ার হোসেন সাঈদী, কামারুজ্জামান, কাদের মোল্লাসহ একাত্তরের ঘাতক দালাল এই মৌলবাদী গোষ্ঠী ধর্মের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার নামে পাক হানাদার কবলিত বাংলাদেশে গণহত্যা এবং গণধর্ষণ পরিচালনা করেছে। যুদ্ধাপরাধী হিসেবে এদের বিচার আজো হয়নি।

মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার ছাতকছড়া গ্রামের আশ্রব উল্লাহর মেয়ে নূরজাহান ফাতোয়াবাজির শিকার হয়ে ১৯৯৩ সলের ১০ জানুয়ারি মারা যায়। এই ঘটনা দেশে-বিদেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ফলে

সরকারের টনক নড়ে। ফতোয়াবাজ মাওলানা মান্নানসহ নয় জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে জেলহাজতে প্রেরণ করে। দীর্ঘ শুনানির পর ১৯৯৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মৌলভীবাজার জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নূরজাহান হত্যা মামলার রায়ে ফতোয়াবাজ মাওলানা মান্নানসহ ৯ জনকে ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে এই মামলার রায়ই ছিল প্রথম আইনি পদক্ষেপ। ধর্ম নিয়ে যারা ব্যবসা করে তাদের বিরুদ্ধে এই রায় একটি আদর্শ দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে। এই রায় প্রমাণ করে, ধর্ম মানুষের কল্যাণের জন্য, কিন্তু ফতোয়াবাজির মাধ্যমে যারা ধর্মকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে তারা ধর্ম তথা মানবতার চিরশত্রু। কিন্তু তারপরও অনেক নারী ফতোয়াবাজির শিকার হয়ে হয় মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন অথবা স্বামী-সংসারহারা হয়েছেন। আর কোনো বিচারের নজির নেই। তাই ফতোয়াবাজদের দৌরাত্ম্য বাড়তেই থাকে। ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, সামাজিক প্রতিরোধের অনুপস্থিতিতে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। একসময় এই মৌলবাদী গোষ্ঠী সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রয়াত কবি সুফিয়া কামাল, কবি শামসুর রাহমান, জ্ঞানতাপস আহমদ শরীফ, শহীদ জননী জাহানারা ইমামসহ অনেক বিশিষ্টজনকে মুরতাদ ঘোষণা করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিজয় দিবসের সমাবেশে হামলা এবং অনেক মানবাধিকার কর্মীকে হত্যার হুমকি দিয়ে এলাকা ত্যাগে বাধ্য করার পরও এই মৌলবাদ ও ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ নেই। ফতোয়াবাজ সমাজ, প্রগতি ও আধুনিক ধ্যান-ধারণার অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত করছে। তাই ফতোয়াবাজির বিরুদ্ধে সামগ্রিক লড়াই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ফতোয়াবাজি নিষিদ্ধ সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়ের কার্যকারিতা ছয় সপ্তাহের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছে। স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের সকল অন্যায় ও জুলুমের মধ্যে মুসলিম পারিবারিক আইনটি ব্যতিক্রম ছিল। সে আইন বর্তমানে আমাদের সংবিধানের সাথে যুক্ত। অবশ্য স্বৈরশাসক এরশাদ অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে কেবল রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্য অধ্যাদেশের মাধ্যমে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' সংবিধানের সাথে যুক্ত করে মৌলবাদীদের লম্ফঝম্ফ দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যে কারণে

ফজলুল হক আমিনীসহ তার সহযোগীদের সাহসের মাত্রা সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। কিন্তু নূরজাহান হত্যা মামলার রায় এবং গত পহেলা জানুয়ারি হাইকোর্টের রায়ের মধ্য দিয়ে যে সত্য বের হয়ে এসেছে, সে সত্যকে ধারণ করেই অগ্রসর হতে হবে। হাইকোর্টের রায় মানুষকে জাগ্রত করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। এ রায় মানুষের দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। অসাম্পদায়িক ও প্রগতির ধারায় রাষ্ট্র ও সমাজ বিনির্মাণের প্রত্যাশায় সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানি শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আমরা বিজয়ী হয়েছিলাম। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে পাকিস্তানের কবর রচনা করে স্বাধীন বাংলাদেশের উত্থান ঘটে। কিন্তু সত্য হচ্ছে, পাকিস্তানকে কবর দিলেও সে দেশের অনুসারীদের নির্মূল করতে পারিনি। তাই অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ও সমাজ বিনির্মাণের জন্য এখনো লড়াই করে যেতে হচ্ছে। এ লড়াই অব্যাহত আছে। একাত্তরের চেতনায় বলীয়ান হয়ে সব টানাপড়েনের অবসান ঘটিয়ে ঘোষণা করতে হবে মৌলবাদ নিপাত যাক।

১৬.০১.২০০১

শাসকগোষ্ঠী নয়, ইতিহাস তৈরি করে জনগণ

যে মহান ব্যক্তির আহ্বানে আমরা স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, যিনি আমাদের স্বাধীনতার স্থপতি, বাঙালি জাতির মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি তিনি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের দুজন বাদে সকলের জীবন কেড়ে নেয় ঘাতকের নির্মম বুলেট। এমনকি অবুঝ শিশু রাসেলও বর্বরদের হিংস্র থাবা থেকে রক্ষা পায়নি। শুধু বিদেশে থাকার ফলে হায়েনাদের কবল থেকে রক্ষা পান শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলার মানুষ হত্যা করেনি। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে স্বাধীনতার পরাজিত শত্রুরা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একটি নাম নয়, একটি ইতিহাস। এ ইতিহাসের জন্ম একদিনে বা দুদিনে হয়নি। দীর্ঘ সময় লেগেছে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হওয়ার পূর্ব থেকেই শুরু হয়েছে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু অগ্রসেনানী হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের স্থপতি এবং বাঙালি জাতির জনক—এ নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। চল্লিশের দশকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে যেসব জাতীয়তাবদী নেতার আবির্ভাব ঘটে তাদের মধ্যে নক্রুমা, নাসের, সুকর্ন, জওহরলাল নেহেরু অন্যতম। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও একই কাতারে সমাসীন হন। আন্তর্জাতিক বিশ্বে একটি স্বাধীন জাতির জন্মদাতা হিসেবে স্বীকৃতি পান। এত উচ্চমানের একজন মহান নেতাকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করা হয়েছে, এর চেয়ে কলঙ্কজনক ঘটনা আর কি হতে পারে। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুতে সেদিন সারা জাতি হতবাক হয়ে গিয়েছিল। আমরা পারিনি সেদিন বারুদের গন্ধে বাংলার আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে তুলতে। পিতৃহত্যার বদলা আমরা নিতে পারিনি। কিন্তু ইতিহাস বড় নিষ্ঠুর। ঘাতককে ইতিহাস স্বীকৃতি দেয় না। কারবালার

ময়দানের সিমার, পলাশী প্রান্তরের মীরজাফর আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর নামটি মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘ একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে যত্রতত্র বঙ্গবন্ধুর নাম ব্যবহার করে বঙ্গবন্ধুর বিশালতাকে খাটো করেছে। বঙ্গবন্ধুর জন্য কোনো সরকারপ্রধানের সার্টিফিকেটের দরকার নেই। কেননা বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্থপতি। তাই যে বা যিনি বাংলাদেশের ক্ষমতার মসনদে আসীন হবেন তাকে বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা স্বীকার করে নিতেই হবে। যারা স্বীকার করবে না তাদেরকে পঁচাত্তরের ঘাতকচক্রের সহযোগী হিসেবে চিনে নিতে বাংলার মানুষের অসুবিধা হবে না। ১৫ আগস্টের জাতীয় শোকদিবসের সরকারি ছুটি যারা বাতিল করেছে তারা যে ১৫ আগস্টেরই সুবিধাভোগী এ সত্য জনগণের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার মানুষের নয়নমণি, যতদিন বাঙালি জাতি থাকবে, যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, ততদিন বাংলার আকাশ, বাতাস, মাটি, ফুল, পাখি এবং মানুষ বঙ্গবন্ধুর কথা বলবে।

১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর একই বছর ৩ নভেম্বর কারাগারে বন্দি অবস্থায় হত্যা করা হয় জাতীয় চার নেতা তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও এএইচএম কামারুজ্জামানকে। ৭ নভেম্বর সিপাহি জনতার বিপ্লবের নামে খালেদ মোশাররফ, এটিএম হায়দারসহ অনেক বীরমুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করা হয়। ষড়যন্ত্র আর কূটকৌশলের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা জবরদখল করেই জিয়াউর রহমান যেসব মুক্তিযোদ্ধা সেনা অফিসারকে নিজের ক্ষমতার জন্য হুমকি মনে করেছেন তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে অথবা অন্য কোনোভাবে হত্যা করে নিজের ক্ষমতাকে নিরাপদ করেছেন। যে কর্নেল তাহের জিয়াকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন, সেই কর্নেল তাহেরকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করেন। চট্টগ্রামে জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর জেনারেল মঞ্জুরসহ অনেক মুক্তিযোদ্ধা সেনা অফিসারকে হত্যা করা হয়। ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয় ১২ জন মুক্তিযোদ্ধা সেনা অফিসারকে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি সরকার বাংলাদেশকে মুক্তিযোদ্ধাশূন্য করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এই সময়ের মধ্যে

স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতক দালালচক্রকে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব দিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। গোলাম আযমকে দেশে ডেকে এনে নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ পাঁচ বছর ক্ষমতায় ছিল। এই সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নিধন না করলেও ঘাতক দালালদের ব্যাপারে কোনো শক্ত অবস্থান নিতে দেখা যায়নি। বরং অনেকক্ষেত্রে ঘাতক দালালদের তোয়াজ করতে দেখা গেছে। বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির আদর্শের পথ পরিত্যাগ করে কেবল ক্ষমতার জন্য ঘাতক দালাল আর মৌলবাদের সাথে আপস করে মাথায় পট্টি, হাতে তছবিহ, একাধিকবার সৌদি আরব গমন করেও শেখ হাসিনা শেষ রক্ষা করতে পারেননি। ২০০১ সালের পয়লা অক্টোবরের অষ্টম সংসদ নির্বাচনে দেশী-বিদেশী চক্রান্তে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। চার কুচক্রীর চক্রান্তে ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়ে শেখ হাসিনা এখন নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, আপসের রাজনীতির গতিপথ তাঁর জন্য সুফল বয়ে আনবে না। তাঁকে বঙ্গবন্ধুর আপসহীন আদর্শের রাজনীতির গতিধারায় এগিয়ে যেতে হবে। তাঁকে সাহসী হয়ে ফিরে যেতে হবে স্বাধীন বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে বর্ণিত রাজনীতির গতিপথে। শেখ হাসিনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে শেয়ালের ভয়ে সিংহ কখনো গর্তে আত্মগোপন করে থাকে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর রাজনৈতিক জীবনে কখনো আপসকামিতার পথে অগ্রসর হননি। এজন্যই তিনি মহান নেতা, বাঙালি জাতির জনক। স্বাধীনতার সেই মহান নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রক্তের উত্তরাধিকার বহন করেছেন শেখ হাসিনা। তাই শেখ হাসিনাকে কেবল পিতার উত্তরাধিকার পরিচয় বহন করলে চলবে না, পিতার সাহসের, আপসহীন লড়াইয়েরও উত্তরাধিকারী হতে হবে। আর এজন্য চাই সাহস, আরো সাহস। রণাঙ্গনে বিজয়ের জন্য সাহসের বিকল্প নেই এ সত্য অনুধাবন করলে আর তাঁকে পরাজয়ের গ্লানি সইতে হবে না।

বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেই প্রশাসনকে মুক্তিযোদ্ধাশূন্য করার যে উদ্যোগ নিয়েছিল তা ইতোমধ্যেই সমাপ্তির পথে। চর দখলের মতো মুক্তিযোদ্ধা সংসদ দখল করা হয়েছে। জোটের শরিক দল হিসেবে একাত্তরে পাক বর্বর-বাহিনীর সহযোগী,

বাঙালি তথা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবী হত্যার নায়ক, ঘাতক দালালচক্রের দুজন— নিজামী ও মুজাহিদ রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদারিত্ব পেয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। ত্রিশ বছর আগে ১৯৭১ সালে যে পতাকার বিরুদ্ধে নিজামী, মুজাহিদ এবং তাদের নেতা গোলাম আযম হানাদার পাক বর্বর-বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাঙালি নিধনযজ্ঞে অংশ নিয়েছিল, যে বাঙালির বাড়ির ছাদে এই পতাকা উড়তে দেখেছে সে বাড়ি পুড়িয়ে ছারখার করেছে, বাড়ির মানুষকে হত্যা করেছে, যে যুবককে এই পতাকা হাতে জয় বাংলা স্লোগান দিতে দেখেছে, সে যুবকের গলায় এই পতাকা পেঁচিয়ে হত্যা করেছে, সে পতাকা আজ তাদের সরকারি বাসভবনে যেমন পতপত করে উড়ে, তেমনি তাদের গাড়িতেও সে পতাকা শোভা পায়। শহীদের রক্তের বদলে প্রাপ্ত আমাদের জাতীয় পতাকার এই অসম্মান ও অমর্যাদা আমরা নীরবে সহ্য করে যাচ্ছি।

১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি থেকে ২০০১ সালের ২২ নভেম্বরের মধ্যে ব্যবধান ৩০ বছর। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে একমাত্র রাজাকার হিসেবে আব্দুল খালিকের বিচার ও জেল হয়েছিল। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে কুষ্টিয়ার চিকন আলী। আর কোনো ঘাতক দালালের বিচার হয়নি। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাকে কারাযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে, ফাঁসিতে ঝুঁলিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৯৪ সালে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে অভিযুক্ত অবস্থায় মারা যান। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর আওয়ামী লীগ সরকার প্রণীত 'জাতির পিতার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা আইন' বাতিল করে। এই আইনের প্রক্রিয়া হিসেবে গণভবন বরাদ্দ বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু সাবেক রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাদের জন্য সরকারি সব সুযোগ সুবিধা ভোগের সুযোগ অব্যাহত আছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়াকে দেয়া ক্যান্টনমেন্ট ও গুলশানের বাড়ি দুটি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হলেও এখনও ফিরিয়ে দেয়া হয়নি। বর্তমানে যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় তাদের কাছে নৈতিকতার প্রশ্ন অবান্তর, ভোগদখলই বড় কথা। তাই নিজেদের ভোগদখল অটুট রেখেছেন এবং ক্ষমতায় আসার ক্ষেত্রে যারা সহায়তা করেছেন সেই সাবেক রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ভোগদখলও বহাল রেখেছেন।

সুতরাং স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পর গোটা বাঙালি জাতি আজ আবার অরক্ষণীয় হয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের একাংশের বিবেক আজ শবগন্ধময় ভাগাড়ে পরিণত। বাংলা একাডেমির সাম্প্রতিক ঘটনা তার প্রমাণ বহন করে। বাংলাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় একটি প্রচলিত প্রবাদ 'এই দিন দিন নয় আরও দিন আছে।' ১৫ আগস্ট ছুটি বাতিল করে ৭ নভেম্বর ছুটি প্রণয়ন করে জাতির মহান ইতিহাস পাল্টানো যাবে না। কারণ ইতিহাস শাসকগোষ্ঠী তৈরি করে না, ইতিহাস তৈরি করে জনগণ।

২২.১১.২০০১

জহির রায়হান থেকে শাহরিয়ার কবির

নির্ভীক সাংবাদিক, সাহিত্যিক, মুক্তিযোদ্ধা, সাম্প্রদায়িকতা ও একাত্তরের ঘাতক দালালদের বিরুদ্ধে অকুতোভয় যোদ্ধা শাহরিয়ার কবিরকে দেশের ক্ষমতাসীন সরকার তথাকথিত রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে আটক করে কারাগারে বন্দি রেখেছে। আইনের প্রতি কোনো প্রকার তোয়াক্কা না করে বারবার রিমান্ডে এনে শাহরিয়ার কবিরের সাথে অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে। সাধারণ কয়েদিদের সঙ্গে অত্যন্ত মানহানিকর অবস্থায় তাকে বারবার আদালতে হাজির করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিকভাবে ও দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠা সত্ত্বেও সরকার শাহরিয়ার কবিরকে মুক্তিদানের ব্যাপারে মুখ খুলছে না, উল্টো সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ শাহরিয়ার কবিরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বক্তৃতা-বিবৃতি অব্যাহত রেখেছেন। বিশ্ববিখ্যাত মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল শাহরিয়ার কবিরকে বন্দি বিবেক বলে তাঁর পক্ষে দাঁড়িয়েছে এবং তাঁর গ্রেফতারের নিন্দা জানিয়েছে। আমরা যারা একাত্তরের এই মহান মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং বিজয় ছিনিয়ে এনেছি, আমরা একবাক্যে এই মহান মুক্তিযুদ্ধকে একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সময় বলে মনে করি। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ কেবল স্মৃতি নয় আমাদের অহংকার, সাহসী হওয়ার প্রেরণার উৎস। মুক্তিযোদ্ধা ও নির্ভীক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরকে গ্রেফতার করে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করে কারাগারে বন্দি করে রাখার ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ বছর পর আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এক নির্মম সত্যের মুখোমুখি। আমরা যদি পেছনে ফিরে থাকাই তা হলে মনের আয়নায় ভেসে উঠবে যারা আমাদের স্বাধীনতার মূল প্রেরণার উৎস ছিলেন, যারা একাত্তরের রণাঙ্গনে আমাদের সাহসিকতার প্রতীক ছিলেন, তাদেরকে একে একে ঘাতকের বুলেটে স্বাধীন বাংলাদেশে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বাধীনতার পক্ষের এই জাতীয় বীরদের

নিধনযজ্ঞ আমরা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখেছি, প্রতিবাদী হয়ে উঠিনি। এমনকি জাতির জনকের হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ত্রিশ লাখ বাঙালির তাজা প্রাণ এবং দু'লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে পাওয়া আমাদের স্বাধীনতার মূল্যবোধগুলো যখন একে একে বিসর্জন দিতে শুরু করে ক্ষমতা দখলকারী ঘাতকরা, তখনও আমরা শোকে পাথর হলেও বারুদের মতো জ্বলে উঠিনি। আর উঠিনি বলেই হায়েনাদের শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে আজ ত্রিশ বছর পর তারা রাষ্ট্রক্ষমতায় বসে একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা শাহরিয়ার কবিরকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। শুধু এখানেই শেষ নয়, ক্ষমতাসীনরা আমাদের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির ওপর হাত দিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের যেমন অপমান করা হচ্ছে তেমনি স্বাধীনতাকেও অপমান করা হচ্ছে। এরপরও যদি আমরা সচেতন না হই, সাবধানতা অবলম্বন না করি, তা হলে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস, পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ পালনে হাত দিবে। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস এবং পহেলা বৈশাখ পালনের বৈধতা নিয়ে ইতোমধ্যেই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ১৫ আগস্টের জাতীয় শোকদিবসের সরকারি ছুটি বাতিল এবং ৭ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধা হত্যা দিবসকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করায় সরকারের আসল রূপ প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

জহির রায়হান একটি নাম, একটি ইতিহাস। তিনি একাধারে ছিলেন ভাষাসৈনিক, ঔপন্যাসিক, চলচ্চিত্রকার, প্রগতিশীল রাজনীতিসচেতন ব্যক্তিত্ব এবং মুক্তিযোদ্ধা। জহির রায়হান পাকিস্তানের লৌহমানব বলে খ্যাত স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের শাসনামলে স্বৈরশাসনবিরোধী চলচ্চিত্র 'জীবন থেকে নেয়া' ছবিটি তৈরি করে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন। একটি সামাজিক ছবির আড়ালে জহির রায়হান যে কাহিনীর বিন্যাস ঘটিয়েছিলেন তাতে স্পষ্টতই বাঙালি জাতির ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি কোনদিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সে দিকনির্দেশনার ইঙ্গিত ছিল। জহির রায়হান ছবিতে সংযোজিত করেন ইকবাল, নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হবে এই মর্মান্তিক সত্য হয়তো জহির রায়হান কল্পনাই করেননি। কিন্তু তারপরও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গানটিকে 'জীবন থেকে নেয়া'

ছবিতে সংযোজিত করেছিলেন। জহির রায়হান ছবিটি শেষ করে সেন্সর সার্টিফিকেটের জন্য জমা দেন। কিন্তু ছবিটিকে সেন্সর সার্টিফিকেট দেয়া হয়নি। 'জীবন থেকে নেয়া' ছবিটিকে সেন্সর বোর্ড আটকে দিয়েছে এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবিটি দেখার জন্য উদগ্রীব দর্শকরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেন। কোনো ছবির মুক্তির জন্য রাস্ত ায় দর্শক ও জনগণের বিক্ষেভ প্রদর্শনের ঘটনা অকল্পনীয় হলেও জহির রায়হানের 'জীবন থেকে নেয়া' ছবির জন্য হয়েছিল, যা একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসেবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। আওয়ামী লীগ, ন্যাপসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে 'জীবন থেকে নেয়া' ছবিটিকে সেন্সর সার্টিফিকেট না দেয়ায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে অবিলম্বে ছবিটিকে সেন্সর সার্টিফিকেট প্রদানের দাবি জানোনো হয়। জনদাবির মুখে স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের সাঙ্গপাঙ্গরা বাধ্য হয়ে সেসময় ছবিটিকে সেন্সর সার্টিফিকেট দিতে বাধ্য হয়। ছবিটি বিভিন্ন সিনেমা হলো প্রদর্শনকালে ছবির পাত্রপাত্রীর মুখে যখন 'জয় বাংলা' স্লোগান উচ্চারিত হতো, তখন হলভর্তি দর্শক সমস্বরে 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে ফেটে পড়তেন। 'জীবন থেকে নেয়া' ছবিটি যে বাঙালি জাগরণে বিশেষ অবদান রেখেছে এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় জহির রায়হান ভারতে গিয়ে সুখনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন না। নানা প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং অসংখ্য সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তৈরি করেছিলেন স্টপ জেনোসাইডের মতো অসামান্য একটি দলিলচিত্র। পাকহানাদার বাহিনী বাংলাদেশে যে গণহত্যা চালিয়েছিল তা প্রমাণ করতে এই দলিলচিত্রটিই যথেষ্ট। জহির রায়হানের যুদ্ধের অস্ত্র ছিল দুটি। একটি কলম আর অন্যটি ক্যামেরা। জহির রায়হান মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্যামেরার মাধ্যমে 'স্টপ জেনোসাইড' তৈরি করে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের যে প্রামাণ্য দলিল তৈরি করে গেছেন, সে দলিল এখনও এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত।

মুক্তিযুদ্ধের বিজয় লাভের পর জহির রায়হান ভারত থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসে বসে থাকেননি। ক্যামেরা নিয়ে ছুটে গেছেন রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে। বধ্যভূমির ছবি তুলেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা বিরোধিতা করেছিল তাদের মুখোশ খুলে জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য

তাদের তালিকা তৈরি করতে থাকেন। আর এখানেই জহির রায়হান মারাত্মক ভুল করেন। ভীমরুলের চাকে আঘাত করতে গিয়ে তিনি নিজেই তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন। ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি জহির রায়হান খবর পান বড় ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারকে মিরপুরে আটকে রাখা হয়েছে। জহির রায়হান তখন শাহরিয়ার কবিরকে সাথে নিয়ে ছুটে যান মিরপুরে। শাহরিয়ার কবির তাকে মিরপুরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসেন। কিন্তু জহির রায়হান সেই যে গেলেন আর ফিরে আসেননি। প্রথমে জহির রায়হান নিখোঁজ রয়েছেন এই সংবাদ পাওয়া গেলেও ২৮ বছর পর ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মিরপুর রণাঙ্গনের এক সৈনিকের বর্ণনায় জানা যায়, গুলিতে নিহত হয়েছিলেন জহির রায়হান। স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি একজন বীরমুক্তিযোদ্ধার রক্তে প্রথম রঞ্জিত হয় ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি, স্বাধীনতা ও বিজয় অর্জনের মাত্র ৪৬ দিন পর বীরমুক্তিযোদ্ধা জহির রায়হান শহীদ হন। বরেণ্য একজন চলচ্চিত্রকার, ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক ও মুক্তিযোদ্ধা এক অবাঙালির হাতে স্বাধীন বাংলাদেশে শহীদ হলেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো সরকারই এ ব্যাপারে একটি তদন্ত করার প্রয়োজন মনে করেনি। আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, নিজেদেরকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করি, আমাদের পক্ষ থেকেও কোনো প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়নি। অথচ আমরা যারা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দেই, আমাদের অবদান শুধু ট্রিগার টেপার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু জহির রায়হানের মতো বীরমুক্তিযোদ্ধাদের কর্মতৎপরতার কাছে আমাদের অবদান সিন্ধুতে বিন্দুর চেয়েও ক্ষুদ্র। আর যারা 'সিক্সটিন বাহিনীর' সদস্য, তাদের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

জহির রায়হান ঘাতক দালালদের ব্যাপারে অতিমূল্যবান কাগজপত্র এবং ছবি উদ্ধার করেছিলেন। তাই তিনি অনেকের চক্ষুশূলের কারণ হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেখানে জহির রায়হানের 'জীবন থেকে নেয়া' ছবিটির সেন্সর সার্টিফিকেট না দেয়ার কারণে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন সেখানে জহির রায়হান নিখোঁজ হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু সরকারের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার উদ্যোগ না নেয়া রহস্যজনক বলেই মনে হয়। ভারতে জহির রায়হানের কর্মতৎপরতার উপর প্রবাসী

সরকারের অনেকেই ক্ষুব্ধ ছিলেন। এই ক্ষুব্ধ নেতাদের কেউ হয়তো বঙ্গবন্ধুর কাছে জহির রায়হান সম্পর্কে মিথ্যা কল্পকাহিনী তুলে ধরে তাঁকে বিরূপ করে তোলেন। জহির রায়হান নিখোঁজ হওয়ার খবরটি পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর কাছে আড়াল করে রাখা হয়। কলম আর ক্যামেরাকে যুদ্ধের হাতিয়ার করতে গিয়ে জহির রায়হান ঘাতকের হাতে প্রাণ দিলেন। সেদিন শাহরিয়ার কবির ফিরে এসেছিলেন বলেই ঘাতকের নিশানা থেকে রক্ষা পেয়ে যান।

ত্রিশ বছর পর গত ২২ নভেম্বর শাহরিয়ার কবিরকে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আটক করা হয়। আটকের খবর জানাজানি না হলে দেশবাসী হয়তো জানতেন নির্ভীক সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও মুক্তিযোদ্ধা বিমানবন্দর থেকে নিখোঁজ হয়েছেন। পরে হয়তো কোনো একসময় কোনো এক সাংবাদিকের অনুসন্ধানী রিপোর্ট থেকে দেশবাসী জানতে পারতেন শাহরিয়ার কবিরের গুলিতে নিহত হওয়ার খবর। জহির রায়হানের জন্য কলম আর ক্যামেরা যেমন কাল হয়েছিল, শাহরিয়ার কবিরের জন্যও কাল হয়েছে কলম আর ক্যামেরা।

০২.০১.২০০২

সাইফুর রহমানের মানসিক বৈকল্যসুলভ মন্তব্য প্রসঙ্গে

আবার আলোচনায় বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের অর্থমন্ত্রী এম. সাইফুর রহমান। নানা ধরনের উল্টাপাল্টা কথা বলে সংবাদ শিরোনামে আসার ব্যাপারে ইতোমধ্যেই তার পটুত্ব প্রমাণিত হয়েছে। যে কোনো কারণেই হোক মাঝে কয়েক দিন কিছুটা নিয়ন্ত্রিত ছিলেন তিনি। এখন আবার দেখা যাচ্ছে স্বরূপে এবং আগের চেয়েও বেশি মাত্রায় তিনি মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করতে শুরু করেছেন। এবার আঘাত করেছেন মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনায়। ১০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার আশুগঞ্জ-ভৈরব মেঘনা নদীর ওপর নির্মিত সেতু উদ্বোধনকালে এম. সাইফুর রহমান বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে হাতেগোনা যে কয়জন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের নাম সর্বজনশ্রুত তাদের অন্যতম আমাদের মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ঘাতকদের হাতে নিহত জাতীয় চার নেতার একজন সৈয়দ নজরুল ইসলামকে 'কোথাকার কোন নজরুল ইসলাম, ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার' বলে অসুস্থ, ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অমার্জনীয় বক্তব্য রেখেছেন। অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের এই বক্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর সর্বমহল থেকে ধিক্কার উচ্চারিত হতে থাকে।

জাতীয় সংসদে এ বিষয় নিয়ে আলোচনাকালে সাইফুর রহমান জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম সম্পর্কে যে কটাক্ষপূর্ণ কথা বলেছেন, সে সত্য স্বীকার করেছেন এবং এ ব্যাপারে সংসদে জবাব দিতে তিনি বাধ্য নন বলে জানিয়েছেন। তিনি সংসদে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের নামকরণ আর নাম পরিবর্তনের উল্লেখ করে নিজেকে দায়মুক্ত করার অপচেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি ভুলেও উচ্চারণ করেননি বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের ছবি নামানো আর নাম পরিবর্তনের কথা। অন্যের উদাহরণ

টেনে নিজের অবৈধ আচরণ যুক্তিগ্রাহ্য করা যায় না, এ কথা অর্থমন্ত্রীকে স্মরণ করে দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কেননা তিনি নিজেই এই নামকরণের কালচার থেকে মুক্ত নন। মৌলভীবাজার জেলা শহরের সাইফুর রহমান অডিটোরিয়াম, জগৎসী সাইফুর রহমান কলেজ এবং নিজের স্ত্রীর নামে মৌলভীবাজার মহিলা কলেজের ছাত্রীবাসের নামকরণ দুররে সামাদ রহমান সে প্রমাণই বহন করে। তিনি সংসদকে আরো বলেছেন, এই সেতুর ব্যাপারে সৈয়দ নজরুল ইসলামের কোনো অবদান নেই। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী একজন জাতীয় নেতার অবদান কোথায় আছে বা নেই এমন কথা এম. সাইফুর রহমানের জানা থাকার কথা নয়। কারণ তিনি সে সময় লন্ডনে নিরাপদে অবস্থান করছিলেন। যুক্তরাজ্য প্রবাসীরা সেসময় জানবাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার সংগ্রামে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করলেও এম. সাইফুর রহমান কোথায় ছিলেন এ নিয়ে প্রশ্ন আছে। সাধারণ যে কোনো সচেতন ব্যক্তি মাত্রই জানেন, মুক্তিযুদ্ধের সেই নেতৃত্বের অবদান সকল স্থান-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে। কেননা তাঁরা সেদিন দেশের স্বাধীনতায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলেই এম. সাইফুর রহমান আজ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী। ১৯৭৫ সালের আগে যার কোনো নাম পরিচয় ছিল না, সেই তিনি সামরিক সেনাশাসক জিয়াউর রহমানের রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে হিসাবরক্ষক থেকে হয়ে গেলেন রাজনীতিবিদ। বর্তমানে ক্ষমতার মোহে একাত্তরে সৈয়দ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী জাতীয় শত্রু রাজাকার-আলবদর নেতাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম সম্পর্কে অশালীন বক্তব্য থেকেই এম. সাইফুর রহমানের আসল রূপ প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার প্রথম দিন থেকেই এম. সাইফুর রহমান অস্বাভাবিক ও অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে শুরু করেন। কারও কোনো প্রশংসা নয়, সবার বিরুদ্ধে অকথ্য ভাষায় তিনি আক্রমণ করা শুরু করেন। সবাই স্তম্ভিত। এই যদি হয় বিএনপির প্রথম সারির একজন নেতার আসল চেহারা, তাহলে বাকিদের অবস্থা ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়। অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েই একরাশ বিরক্তি নিয়ে বলা শুরু করলেন, গ্যাস বিক্রি করতে হবে, সম্পদ মাটির নিচে রেখে

লাভ কী, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, ব্যবসায়ীরা চোর-বাটপার, মানি এক্সচেঞ্জগুলো হুন্ডি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, গার্মেন্টস হচ্ছে দর্জির দোকান, কাস্টমস ইন্সপেক্টর হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশসহ অনেক অস্বাভাবিক ও অসংলগ্ন কথা বলে রীতিমতো চমক সৃষ্টি করেন। সাইফুর রহমান পেশায় প্রধানত একজন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট। আর একাউন্ট্যান্টের প্রধান কাজ ব্যয়ের খুঁত বের করা। একাউন্ট্যান্টের মন নিয়ে অন্যকিছু চিন্তা করা দুরূহ। একজন আমলাকে মন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হলে দেখা যাবে একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কিভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যায় তা নিয়েই তিনি তৎপর। একজন পেশাদার একাউন্ট্যান্ট যে আজীবন একাউন্ট্যান্টই থেকে যান, বাগাড়ম্বর করে অর্থনীতিবিদ হতে পারেন না সে সত্য এম. সাইফুর রহমান ইতোমধ্যেই প্রমাণ করেছেন।

জিয়াউর রহমানের রাজনীতির আমলে এম. সাইফুর রহমানের বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অনুপ্রবেশ ঘটে। সে ধারাবাহিকতায় ২০০১ সালের অক্টোবর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মৌলভীবাজার-৩ আসন থেকে এম. সাইফুর রহমান কিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন সে সত্য আর কারো জানা না থাকলেও এই নির্বাচনী এলাকার জনগণ ভালোভাবেই জানেন। রাজনগর উপজেলার তিনটি ইউনিয়নের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের তাদের ভোটাধিকারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়। সিলেট-১ আসনের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে এম. সাইফুর রহমান ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে প্রতিপক্ষ থাকবেই। তাই বলে প্রতিপক্ষের প্রতি অভদ্র আচরণ কারো কাম্য হতে পারে না।

মুজিবনগর সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সম্পর্কে এম. সাইফুর রহমান যে কুরুচিপূর্ণ কটাক্ষ করেছেন, সে মহান নেতার নির্দেশে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালে যুদ্ধ করেছিলেন, এ সত্য কি সাইফুর রহমান অস্বীকার করতে পারবেন? সাইফুর রহমানরা তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিত্যদিন মিথ্যাচার প্রচার করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি যদি ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দার হয়ে থাকেন, তাহলে সে সরকারের অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সেক্টর কমান্ডার প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার

কাছে অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম কাণ্ডারী সম্পর্কে প্রকাশ্য জনসভায় এম. সাইফুর রহমান যে ব্যঙ্গোক্তি-কটূক্তি করেছেন, তা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ত্রিশ লাখ বীর বাঙালির প্রতি চরম অবমাননার সমান। তাই বাঙালি জাতি তার এই অমার্জনীয় অপরাধের জন্য আজীবন ধিক্কার জানিয়ে যাবেন। একাত্তর সালের যুদ্ধাপরাধীরা যেভাবে বাঙালি জাতির কাছে ধিকৃত এবং ঘৃণিত সে তালিকায় আরেকটি নাম যুক্ত হলো। আর তিনি হলেন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের অর্থমন্ত্রী এম. সাইফুর রহমান। পারস্যের বিখ্যাত কবি ফেরদৌসী সুলতান মাহমুদের উপহারের আশ্বাস পেয়ে দীর্ঘ পরিশ্রম করে শাহনামার মতো মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। কবি ফেরদৌসী শাহনামা রচনা সমাপ্ত করে যখন সুলতান মাহমুদকে উপহার দিলেন, তখন সুলতান মাহমুদ কবিকে স্বর্ণমুদ্রা উপহার না দিয়ে রৌপ্যমুদ্রা উপহার দিলেন। কবি ফেরদৌসী সুলতান মাহমুদের সে উপহার প্রত্যাখ্যান করে ফিরে এসে শাহনামা মহাকাব্যের শেষে একটি কবিতা যুক্ত করেছিলেন। সে কবিতাটি হচ্ছে, 'আগর শাহ্ রা শাহ বুঁদে পিদর/ বছর পর নেহালে মরা তাজ ও জর।'

শাহনামার সাথে এ কবিতা যুক্ত করার ফলে সুলতান মাহমুদ রাগে-ক্ষোভে মহাকবি ফেরদৌসীকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। সুলতান মাহমুদের রাজরক্ষীদের হাত থেকে রক্ষার জন্য মহাকবি ফেরদৌসী আত্মগোপন করেন এবং সীমাহীন দুঃখকষ্ট ভোগ করে আত্মগোপন অবস্থায়ই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সুলতান মাহমুদ পরিশেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং অঙ্গীকারের সমুদয় স্বর্ণমুদ্রা যখন মহাকবি ফেরদৌসীর বাড়িতে প্রেরণ করেন তখন কবির লাশের জানাজার প্রস্তুতি চলছে। কবির কন্যা ঘৃণাভরে সুলতান মাহমুদ প্রেরিত সে স্বর্ণমুদ্রা প্রত্যাখ্যান করেন। সে স্বর্ণমুদ্রা ফেরত পেয়ে সুলতান মাহমুদ যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন নিজের ভুলের জন্য অনুশোচনা করেছেন বলে ঐতিহাসিকদের ভাষ্য মতে জানা যায়।

সুলতান মাহমুদ একসময় নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনা করেছিলেন, কিন্তু এম. সাইফুর রহমানরা সেটা করতে পারবেন কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে।

২০. ০৯.২০০২

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড কার বুক ঝাঁঝরা হবে আরো একবার?

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তালিকা অনেক দীর্ঘ। ভগবত সিং থেকে শুরু করে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লচাকী, সূর্যসেন, প্রীতিলতাসহ হাজার হাজার বিপ্লবী বীর ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে তাদের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন আমাদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য। কিন্তু আমাদের সেই সুন্দর ভবিষ্যতের অগ্রযাত্রাকে বারবার কৌশলে লক্ষ্যচ্যুত করা হয়েছে। যিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র স্বাধীনতাযুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন সেই নেতাজী সুভাষ বসুর মৃত্যুরহস্য আজো উদ্‌ঘাটিত হয়নি। ব্রিটিশ শিক্ষায় শিক্ষিত দুই ব্যারিস্টার মহাত্মা গান্ধী ও মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এই উপমহাদেশে জাতিগত বিভেদের কলঙ্ক তিলক এঁকে দিয়ে ইতিহাস ও ভূগোলকে অস্বীকার করে ব্রিটিশদের সাথে আপসরফার মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু মর্মান্তিক সত্য হচ্ছে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যু নিয়ে এখনো পাকিস্তানে বিতর্ক রয়েছে। মহাত্মা গান্ধী ভারতের মাটিতে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের উর্বর উপত্যকা এই উপমহাদেশে এমন হৃদয়বিদারক পরিণতির শিকার হয়েছেন ভারতের গান্ধী পরিবার। পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে এক জেনারেল ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলিয়ে হত্যা করে। আর বাংলাদেশের ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলকে কালো নেকাবে ঢেকে রেখেছে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এ এইচ কামারুজ্জামান হত্যাকাণ্ডের কালিমালিপ্ত ইতিহাস। এই হত্যাকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় নিহত হয়েছেন জিয়াউর রহমান, কর্নেল তাহের, খালেদ মোশাররফ, কর্নেল হায়দার, মঞ্জুরসহ আরো অনেক বীরমুক্তিযোদ্ধা। শ্রীলংকায় একই ধারায় সলোমন

বন্দরনায়েকে, বিজয় কুমারাতুঙ্গা, রানাসিংগে প্রেমাদাসা, নেপালে রাজা বীরেন্দ্র, আফগানিস্তানে জেনারেল মোহাম্মদ দাউদ, নূর মোহাম্মদ তারাকি, হাফিজ উল্লাহ আমিন, বাবরাক কারমাল, নজিব উল্লাহ অভ্যুত্থান পাল্টা অভ্যুত্থানে নিহত হন। বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ বার্মা সামরিক শাসকদের নতুন পোশাকি নাম মিয়ানমারে গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধরেই সামরিক শাসন কায়েম রয়েছে। ১৯৯০ সালের নির্বাচনে জনগণের রায়ে যখন অং সাং সুচির নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি দলটি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, তখন আর সেই দলকে সরকার গঠন করতে দেয়া হয়নি। জনমতের এই প্রতিফলনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিল সামরিক সরকার এবং নির্বাচিত নেত্রী সুচিকে প্রায় বারো বছর হয় কারাবাস না হয় গৃহবন্দি থাকতে হয়েছে। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার উপর বৃষ্টির মতো আর্জেস গ্রেনেড আর গুলিবর্ষণের পরও বলতে হবে তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছেন। করাচিতে বেনজির ভুট্টো বেঁচে গেলেও পিন্ডিতে আর বাঁচতে পারলেন না। গত ২৭ ডিসেম্বর ঘাতকের বুলেট তাঁর প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। বেনজীর ভুট্টো হত্যার ব্রিটিশ পুলিশের তদন্ত রিপোর্টকে অপর্যাপ্ত হিসেবে আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করেছেন পাকিস্তানের শীর্ষ মানবাধিকার কর্মী আসমা জাহাঙ্গীর। ব্রিটিশ পুলিশের তদন্তের উপর যেখানে ব্রিটেনেই অনাস্থার জায়গা তৈরি হয়েছে সেখানে বিদেশে ব্রিটিশ পুলিশের তদন্তে আস্থার জায়গা খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। প্রিন্সেস ডায়নার মৃত্যুরহস্য আজো উদঘাটন করতে পারেনি ব্রিটিশ পুলিশ। তাই পাকিস্তানে কিংবা বাংলাদেশে ব্রিটিশ পুলিশের তদন্ত যে অসার এবং অর্থহীন তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। সিলেটে ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর উপর বোমা হামলার তদন্তে গিয়েছিল ব্রিটিশ পুলিশ। আজো আমরা সে তদন্তের ফলাফল পাইনি। কোনোদিন পাওয়া যাবে সে ভরসাও করা যায় না। এসব তদন্তের ব্যাপারে একটি কথাই বলা যায় আসল ঘটনাকে আড়াল করার জন্যই এসব তদন্তের ভান করা হয়।

মাইনাস টু পাকিস্তানে যেমন সেনাশাসক মোশাররফের জন্য বুমেরাং হয়েছে বাংলাদেশেও এই তত্ত্ব দৃশ্যমান সরকার প্রধান ফখরুদ্দীন আহমদ

এবং অদৃশ্য সরকারের প্রধান নিয়ন্ত্রক জেনারেল মইন উ আহমেদের জন্য বুমেরাং হয়ে তাদের অস্তিত্বকেই হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। বেনজীর ভুট্টো হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে কোনো গুণগত পরিবর্তন আসবে তা প্রত্যাশা করা যায় না। তবে জনগণের রায়ই যে শেষ কথা পাকিস্তানের সাম্প্রতিক নির্বাচনে আবার তা প্রামাণিত হয়েছে। এই নির্বাচনে ২৭২ আসনবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে সাবেক প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত বেনজীর ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি পেয়েছে ৮৮ আসন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ পেয়েছে ৬৬ আসন। অন্যদিকে সেনাশাসক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের মুসলিম লীগ ৩৮টি আসন পেয়ে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। অবাক করা কাণ্ড হচ্ছে মৌলবাদী বলে পরিচিত মুত্তাহিদা মজলিস-ই-আমল পেয়েছে মাত্র ৫টি আসন। অথচ ২০০২ সালের নির্বাচনে এই মৌলবাদী দলটি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। সামরিক সরকারের অধীনে মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের যে প্রসার ঘটে তার প্রমাণ বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশে মৌলবাদী, জঙ্গিবাদী মুত্তাহিদা মজলিস-ই-আমলকে পরাজিত করে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের বিজয় সূচিত হয়েছে। পাকিস্তানে ১৮ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে অন্যতম তাৎপর্য হলো মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলোর ভরাডুবি এবং সেক্যুলার রাজনৈতিক দলগুলোর বিজয়। দীর্ঘদিন পর হলেও পাকিস্তানে গণতন্ত্রের সুবাতাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। বাংলাদেশও বর্তমানে এক কঠিন সময় অতিক্রম করছে। সরকার ঘোষিত সময় অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কিনা তা নিয়ে জনমনে এই অনাস্থার পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। তবে সরকার ঘোষিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে পাকিস্তানের মতো মৌলবাদী দলগুলোর যে ভরাডুবি হতো এতে কোনো সন্দেহ নেই। নিজামী, মুজাহিদ, আমিনী, পাশা, ফরিদ, শাহজাহান চৌধুরীর মতো লোকগুলো পবিত্র সংসদ ভবনে প্রবেশের সুযোগ পাবে না এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায়। তাদের কালো নখের আঘাত থেকে দেশ, সমাজ ও সংসদের পবিত্র অঙ্গন রক্ষা করা আমাদের পবিত্র দায়িত্বেরই অংশ।

পাকিস্তানের কারাগারে গোপন বিচারের মাধ্যমে বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা না করে স্বদেশে নিজবাড়িতে এনে সপরিবারের তাঁকে হত্যার নেপথ্য কারণ এখন আর কারো অজানা নয়। একাত্তর সালে পাকিস্তান সরকারের প্রতি মার্কিন সরকারের একমাত্র নির্দেশ ছিল গণহত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশকে জনশূন্য করা হলেও মার্কিন সরকার কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করবে না কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানকে অবশ্যই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সে ধারাবাহিকতায় বেনজীর ভুট্টোকেও বাড়িতে ডেকে এনে আমেরিকাই যে তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই তো অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মন্তব্য হচ্ছে, 'আমেরিকাকে যারা বন্ধু মনে করে, তাদের আর শত্রুর প্রয়োজন হয় না।' আইএসআই যদি বেনজীরকে হত্যা করেও থাকে তাহলে এই হত্যার নেপথ্যে যে সিআইএ'র যোগসাজশ নেই সেটা ভাবলে ভুল হবে। বাঙালির জাতির জনক বাংলাদেশের স্থাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সহায়তাকারী ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী হত্যা, কঙ্গোর জাতীয়তাবাদী নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বা হত্যা, চিলির প্রেসিডেন্ট সালভাদোর আলেন্দে হত্যা, ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসি দিয়ে হত্যাসহ আরো অনেক রাজনৈতিক জনপ্রিয় নেতাকে হত্যার নেপথ্যে সিআইএ'র যে ভূমিকা ছিল তা আজ বিশ্বের শান্তি কামী মানুষের অজানা নয়। আর এসব হত্যার দৃশ্যমান শক্তি হিসেবে সবসময় সেনাবাহিনীর উচ্চবিলাসী জেনারেলদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব হত্যার সাথে জড়িত জেনারেলদেরকে জনপ্রতিরোধের মুখে পড়ে খুবই অসম্মানজকভাবে ক্ষমতার মসনদ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো যখন রাজনৈতিক সরকারের অধীনে পরিচালিত হয়েছে সে সময় কোনো কোনো দেশে অদক্ষ সরকার ক্ষমতাসীন থাকাকালে দুর্নীতি, লুটপাট সীমাহীন পর্যায়ে চলে যেতে দেখা গেছে। যেমন বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সেনাশাসক জিয়াউর রহমানের শাসনামলে দুর্নীতির চেয়ে সর্বাধিক সংখ্যক সামরিক বেসামরিক লোককে বিচারের নামে প্রহসন করে হত্যা করা হয়েছে কিন্তু এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সম্পূর্ণ নীরব থেকেছে। অন্যদিকে সেনাশাসক এইচ এম এরশাদের শাসনামল বাংলাদেশের ইতিহাসে

সর্বাধিক দুর্নীতি ও অনৈতিকতার শাসনকাল হিসেবে বিবেচিত হলেও বিশ্ব সম্প্রদায় এই সময়কেও তেমন হিসাবে নিতে চায় না। বিশ্ব সম্প্রদায় বিশেষ করে মার্কিন ও ব্রিটিশ সরকারের মূল ক্ষোভের কারণ হচ্ছেন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার উপর। যদিও শেখ হাসিনার পাঁচ বছরের শাসনকাল বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসনকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় বলে উল্লেখ করা যায়। বেগম খালেদা জিয়ার প্রথম দফা প্রধানমন্ত্রিত্বকালীন সময় তেমন বিতর্কিত না হলেও ঘাতক জামায়াতের সাথে জোটবদ্ধ সরকারের সময়টি বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম সময় হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে। মর্মান্তিক সত্য হচ্ছে যাদের লুটপাট আর অপশাসনের সকল দায়ভাগ বেগম খালেদা জিয়াকে বহন করতে হচ্ছে তাদের অনেকেই এখন আর তাঁর পাশে নেই। বাংলাদেশের লুটপাটের অর্থনীতির জনক, সন্ত্রাসীদের গডফাদার, ভণ্ড প্রতারক এম. সাইফুর রহমান, আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া, মেজর হাফিজসহ অনেকেই বর্তমানে বেগম জিয়ার পক্ষ ত্যাগ করে সুবিধাবাদী অবস্থান গ্রহণ করে আবার ক্ষমতাসীন হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। আওয়ামী লীগের মধ্যেও সুযোগ আলীদের অভাব নেই। তবে তাদের অনেকেই বাতাস দেখে নৌকা ত্যাগের চিন্তায় ছিলেন এবং এখনো আছেন। পশ্চিমা হোয়াইটকালার কূটনীতিকদের সমর্থনে ক্ষমতাসীন বর্তমান দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সরকারের দৃষ্টিতে বিশ্ব বেহায়া বলে খ্যাত, দুর্নীতিবাজ ও লম্পট হিসেবে যিনি দেশে বিদেশে কুখ্যাতি অর্জন করেছেন সেই এইচ এম এরশাদ এখনো মুক্ত মানুষ হিসেবে জাতিকে সুবচন উপহার দিয়ে যাচ্ছেন। প্রকাশিত দুর্নীতিবাজদের তালিকায় এরশাদের নাম নেই। নাম নেই আরো অনেক সামরিক বেসামরিক আমলা তথা রাজনীতিতে অনুপ্রবেশকারী লুটেরা ধনিক-বণিক শ্রেণীর। আর এটাই স্বাভাবিক। সামরিক শাসন আসে ধনিক, বণিক, লুটেরাদের রক্ষা করা আর বিদেশীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্য। তাই তো দেখা যায় বাংলাদেশে এক বছরের বেশি সময় ধরে জরুরি অবস্থার নামে জনগণের সব অধিকার খর্ব করে রাখা হয়েছে কিন্তু হোয়াইট কালার কূটনীতিকদের পক্ষ থেকে তেমন জোরালো প্রতিবাদ উচ্চারিত হচ্ছে না। অথচ এরাই গণতন্ত্রের কথা বলেন, মানবাধিকারের কথা বলেন। এরাই ইরাক, খোয়ব দেখেন। এরাই

তাদের হুকুম তামিল না করায় জনপ্রিয় নেতা সাদ্দাম হোসেনকে ডিক্টেটর উপাধি দিয়ে হত্যা করে কিন্তু তাদের শর্ত মতে তেল বিক্রি করতে রাজি থাকার জন্য সৌদি রাজতন্ত্রকে পূর্ণ সমর্থন প্রদান করতে কোনো বাধা থাকে না। সৌদি আরবের বাদশাহ আব্দুল্লাহ যখন চারটি জাম্বো জেট নিয়ে সভাসদসহ হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছেন তখন ব্রিটেনের প্রিন্স চালর্স তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে রানীর প্রাসাদে নিয়ে আসেন। হায়রে পশ্চিমা গণতন্ত্র! এরূপ আপসকামী গণতন্ত্রপ্রেমীদের স্বরূপ প্রকাশ করার সময় এখনই। আর এজন্য দরকার জনজাগরণের। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দরিদ্র, শোষিত-বঞ্চিত অনাহারী মানুষকে জাগিয়ে তুলতে পারলেই এই অমাবস্যার অন্ধকারের অবসান হবে। নতুন সূর্যের উদয় হবে। ক্ষুধার্থ বুলেটের আঘাতে জনপ্রিয় নেতা-নেত্রীর হত্যাকে ঠেকাতে পারে একমাত্র জনতার সম্মিলিত প্রতিরোধ। জনতার প্রতিরোধের মুখে জলপাই রঙের পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে থাকা দানবদের পরাজিত করতে পারলেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘরে ঘরে শান্তি ফিরে আসবে, আসবে সুদিন। মনে রাখতে হবে দেশ জনতার। আর সে দেশ শাসন করার বৈধ ক্ষমতা রাখেন জনতার দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। দেশশাসনে সেনাবাহিনীর অংশীদারিত্ব কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে রাষ্ট্রীয় বাজেটের সিংহভাগ খরচ করে সেনাবাহিনী পোষণ করার কোনো প্রয়োজন আছে কিনা তা এসব দেশের নেতৃবৃন্দকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। একের পর এক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বলে দেয় এই উপমহাদেশের রাজনীতির অন্তর্নিহিত চরিত্রটা কী? আদর্শ নয় বরং উপমহাদেশে রাজনৈতিক নেতৃত্ব শূন্য করার একটি ঘৃণ্য প্রয়াস। রাজনীতির মৌল চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এ ধারাবাহিকতা চলবেই।

এক সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো প্রধান তিনটি সংগঠিত শক্তি হিসেবে সামরিক বাহিনী, ছাত্রসমাজ এবং কৃষক-শ্রমিক সমাজকেই বিবেচনা করা হতো। এই তিনটি শক্তির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও সংগঠিত শক্তি হচ্ছে সামরিক বাহিনী। প্রতি বছর রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে বাজেট ঘোষিত হয় সে বাজেটের সিংহভাগই খরচ হয়ে থাকে সামরিক বাহিনীর লালনপালনে। তাই এই উপমহাদেশের রাষ্ট্রগুলোতে সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রের ভেতরে আরেকটি রাষ্ট্র হিসেবেই খ্যাতি অর্জন করেছে। বিশ্ব

রাজনীতিতে এক সময় দ্বি-কেন্দ্রিক শক্তির প্রভাব থাকায় বিশ্ব রাজনীতিতে একটি ভারসাম্য বজায় ছিল। সে সময় কমিউনিস্ট জুজুর ভয় দেখিয়ে গণতান্ত্রিক ও জনপ্রিয় নেতৃত্বকে হত্যা কিংবা দেশত্যাগী করে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের অসংখ্য নজির রয়েছে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এককেন্দ্রিক শক্তির বলয়ে পড়ে তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্যপীড়িত ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর রাষ্ট্রগুলোতে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বলতে কিছু এখন আর অবশিষ্ট নেই। যে কোনো দেশে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের ভ্যানগার্ড হলেন কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রসমাজ। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রসমাজের তীব্র আন্দোলনের মুখে সেনাশাসক আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, জিয়াউর রহমান, এইচ এম এরশাদের পতন হয়েছে। তাই সেনাবাহিনীকে নিরাপদ রাখার জন্যই একটি মহল যারা বিদেশীদের অর্থে লালিত পালিত তারা কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রসমাজের সংগঠিত শক্তিকে বিনষ্ট করার জন্য আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছেন। আমাদের গৌরবময় ছাত্র আন্দোলনের ললাটে তারা নানা প্রকার কলঙ্ক তিলক এঁটে দিয়ে ছাত্রসমাজকে জনবিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। যে শ্রমিকসমাজ ছিল আমাদের ভরসার স্থল আশার আলো সে শ্রমিক সমাজকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আদমজী জুটমিলসহ হাজার হাজার মিল কারখানা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ হলেও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ফলে বিনষ্ট আমাদের এই প্রধান খাতকে নিয়ে জনগণকে তাই নতুন করে আবার ভাবতে হবে, আবার জনযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। নতুবা ক্ষুধার্ত বুলেটের আঘাত থেকে কেউ রক্ষা পাবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে বেনজীর ভুট্টোর হত্যা আকস্মিক হলেও একেবারে অভাবিতপূর্ব ছিল না। শেখ হাসিনা কিংবা বেগম খালেদা জিয়ার ক্ষেত্রেও যে এর পুনরাবৃত্তি হবে না— এমন নিশ্চয়তা কোথায়?

লন্ডন ০৪. ০৩. ০৮

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং রাষ্ট্রের দায়

বাংলাদেশ বর্তমানে এক ভয়ঙ্কর দুঃসময় অতিক্রম করছে। বাংলাদেশের জনগণ বর্তমানে রাজনৈতিক-সামাজিক জীবনে এক কঠিন সময় পার করছে। আশঙ্কা নানা অকল্যাণের। রাজনীতিহীন, গণতন্ত্রহীন, সহায়হীন, সম্বলহীন, ক্ষুধার্ত এবং ভবিষ্যৎহীন এক অন্ধকারের দিকে ধাবমান লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশ নামের আমাদের স্বদেশ ভূমি। স্থবির, অচল প্রায় সবকিছু। এই অস্থির সময়কে কৃষ্ণপক্ষ বলে অভিহিত করেছেন অনেকেই। এর থেকে পরিত্রাণের কোনো পথ দেখানোর মতোও কেউ আমাদের সামনে এখন নেই। তাই জাতীয় এই দুঃসময়ে রাষ্ট্রের কিছু দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন মহলের পরিষ্কার চিন্তাভাবনা করার এখনই সময়। বিশেষ করে, একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী তথা জাতীয় শত্রুর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কী ভূমিকা পালন করা উচিত তা নিয়ে জনগণকে সজাগ ও সচেতন করার আন্দোলনকে আরো বেগবান করতে হবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল মাত্র সাড়ে তিন বছরের জন্য। তারপর থেকে সকল ব্যর্থতার মূলে কিন্তু সামরিক স্বৈরশাসকরা। বাংলাদেশের মানুষ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায়। এই নিয়ে তৃতীয়বারের মতো সারা দেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করার দাবিতে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ একই মোহনায় মিলিত হয়েছেন। স্বাধীনতার পরপরই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হলেও বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার মাধ্যমে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে তা থেমে যায়। এরপর নব্বইয়ের দশকে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা গণজাগরণ উপেক্ষা করে তৎকালীন সরকার। তাই এখন সর্বমহলে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীরা মুক্ত হলো কী করে? ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর জিয়াউর রহমানের নির্দেশে যদি গেজেট জারি করে যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তি দেয়া না হতো, তাহলে বারবার যুদ্ধাপরাধীদের

বিচারের দাবিটি সামনে আসার প্রয়োজন হতো না। যুদ্ধাপরাধীদের কেউই কারাগারের তালা ভেঙে বের হয়ে আসেনি। তাই উচ্চকণ্ঠে বলা যায়, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষে যুদ্ধাপরাধীদেরকে যিনি মুক্তি দিয়েছেন তিনি ক্ষমাহীন অপরাধ করেছেন। তার অপরাধ যুদ্ধাপরাধের চেয়ে অনেক বড় অপরাধ। নানা ঘটনা প্রবাহের প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পরপরই সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার প্রসঙ্গটি আলোচনায় আনেন। একপর্যায়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হওয়া উচিত বলে অভিমত রাখেন। কিন্তু এরপরও 'এটা বর্তমান সরকারের দায়িত্ব নয়' বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা বিভ্রান্ত সৃষ্টি করেছে। সরকারের ভেতর থেকে কেউ কেউ একাধিকবার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, ছত্রিশ বছরে রাজনৈতিক সরকারগুলো যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে কেন ব্যর্থ হলো? এ প্রশ্নের উত্তর বলা যায়, বিগত সরকারগুলো অনেক কিছুই করতে ব্যর্থ হয়েছে, যা ঠিক করার দায়িত্ব বর্তমান ক্ষমতাসীনরা কাঁধে তুলে নিয়েছেন। বর্তমান ক্ষমতাসীনদের মূল দায়িত্বের মধ্যে না পড়া সত্ত্বেও যখন অনেক কিছুতেই হাত দেয়া হচ্ছে, তখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করতে বাধা কোথায়?

একটি যুদ্ধ যে কোনো জাতির জন্যই যে, কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, সেটা ইতিহাসের নবীন ছাত্র মাত্রেরও জানা। অথচ মানবজাতির ইতিহাস যুদ্ধবিগ্রহ আর রক্তপাতে ঠাসা। এক সময় যখন যুদ্ধ কোনো নিন্দার কাজ ছিল না বরং প্রকৃত বীরকে জনগণ প্রায়ই দেবতার আসনে বসিয়ে বন্দনা করেছেন। আমাদের জ্ঞাত ইতিহাসে এরকম অনেক বীরের কাহিনীই আমাদের জানা। তবে এই বিজয়ী বীরের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানতে পারি সেই সব কুলাঙ্গারদের কথা, যারা নিজের জাতি, জ্ঞাতি এবং ভাইয়ের সঙ্গে বিরোধিতা করে শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অনেক ক্ষেত্রে নিশ্চিত জয় সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সেই যুদ্ধের করুণ পরাজয়ের পথে ঠেলে দিয়েছে। যুদ্ধ শেষ কিংবা যুদ্ধ চলাকালীন এমনতরো ভয়ঙ্কর শত্রুদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যার নির্দেশ দেয়া থাকত, এমনকি কখনো কখনো যুদ্ধ জয়ের পর এদেরকে জনসম্মুখে কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা থাকত। মহাকাব্যে এরকম শত্রুর কথা অত্যন্ত

নিন্দাপূর্ণ বাক্যে লিখিত আছে। আমরা এখনও ঘরের শত্রু বলতে বিভীষণকেই বুঝি। যদিও সে রাবণের ভাই কিন্তু রামের পক্ষ নেয়ার পরও জনগণের কাছে বিভীষণ ঘরের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। জাতি-জ্ঞাতি-ভাইকে ত্যাগ করে তা সে যতই ন্যায় কিংবা ধর্মের পক্ষাবলম্বন করুক না কেন, ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই তাকে নিন্দা করবে, ঘৃণাও তার জন্য তোলা থাকবে।

বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এখনও তেমন কোনো মহাকাব্য লিখিত হয়নি, যদি ভবিষ্যতের কোনো কাহিনীকার কিংবা কবি এই মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোনো মহাকাব্য লিখতে বসেন তাহলে তাকে এই যুদ্ধের বিজয়ী বীরের কথা যেমন লিখতে হবে তেমনিই তাকে অবশ্যই এর বিরোধিতাকারী শত্রুপক্ষ পাকিস্তানি শাসকচক্রের সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত বাঙালি রাজাকার, আলবদর, আল-শামস তথা গোলাম আজম, মইত্যা নিজামী, মুজাহিদ, কামরুজ্জামান, সাঈদীসহ প্রবাসে আত্মগোপনে থাকা ঘাতকদের কথা ঘৃণার সঙ্গে উল্লেখ করতেই হবে, নচেৎ এই মহাকাব্য অসমাপ্ত থেকে যাবে। কারণ পাকিস্তানি শাসকচক্রের প্রতি বাঙালির ঘৃণা শাশ্বত, যেমনটি রামায়ণ মহাকাব্যে রাবণ কিংবা মহাভারতে দুর্যোধন, কিন্তু শত-সহস্র গুণ বেশি। ফলে পাকিস্তানিদের প্রতি যদি ঘৃণার পাথর নিক্ষেপের ব্যবস্থা রাখা হয় তাহলে এই দেশীয় শত্রুদের প্রতি বরাদ্দ রাখা উচিত মলমূত্র কিংবা তার চেয়েও নোংরা কোনো বস্তু।

বাঙালি জাতির ইতিহাসের মাহেন্দ্রক্ষণ উনিশশো একাত্তর। কারণ এর আগে এই জাতিটি কখনোই প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করতে পারেনি। বার বারই বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা শাসিত হয়ে, লাঞ্ছিত হয়ে সহ্যের একেবারে প্রান্তসীমানায় এসে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় হলো, দীর্ঘ শাসনযন্ত্রণা ভোগের পরও এই জাতির ভেতরকার মুনাফেক গোষ্ঠী নিজ জাতি ভাইয়ের স্বাধীনতার চেয়ে বিদেশী প্রভুদের গোলামিকেই বেশি পছন্দের হিসেবে নিয়েছে। আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে, তাদের এই গোলামি এবং পা-চাটা স্বভাব ও মনোভাবকে তারা ধর্মের আচ্ছাদনে ঢেকে রাখতে চেয়েছে। জিন্নাহর ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বকে মিথ্যে প্রমাণ করাটাই যদি হয়ে থাকে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান অর্জন তাহলে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সেদিনও আজকে যারা

বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী ও তার অনুসারীরা যে ধর্মের দোহাই দিয়ে সেদিন বাঙালি জাতির বিরোধিতা করেছিল এবং পাকিস্তানিদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছিল তা আসলে ছিল নিতান্তই স্বার্থ ও শ্রেণীগত, এর সঙ্গে ধর্মের কোনোই সম্পর্ক ছিল না।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দায় অবশ্যই রাষ্ট্রের। কারণ একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রাক্কালে যারা এর বিরোধিতা করবে তারা স্বাভাবিকভাবেই সেই রাষ্ট্র ও ভূখণ্ডের নাগরিকের জাতীয় শত্রু। পৃথিবীর যে কোনো রাষ্ট্র এবং জাতিই এরকম জাতীয় শত্রুর প্রতি কোনো প্রকার ক্ষমা কিংবা করুণা পোষণ করে না, করেওনি, ইতিহাসে এমন কোনো নজির নেই। এখানে যুদ্ধাপরাধের চেয়েও বড় প্রশ্ন, জাতীয় অস্তিত্বের, সার্বভৌমের এবং স্বাধীনতার। আর এগুলো যাদের কাছে নিরাপদ নয়, তারাই জাতীয় শত্রু। বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে কোনো দেশ বা জাতির স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ব যদি বিপন্ন হয় তাহলে সেই জাতি কী করে? একাত্তরে আমরা কী করেছিলাম? সর্বশক্তি নিয়োগ করে পাকিস্তানি শত্রুর বিরুদ্ধে লড়েছিলাম এবং তাদের প্রতি আমরা কোনো রকম দয়া-মায়া প্রদর্শন করিনি। যদি করতাম তাহলে একাত্তরে আমাদের বিজয় অর্জিত হতো না। আমরা হয় মরব, না হয় জিতব—এই শপথ নিয়ে যুদ্ধে নেমেছিলাম এবং এ কারণেই আমরা বিজয় অর্জন করতে পেরেছি।

আজকের এই সময়ে চোখ বন্ধ করে এক মুহূর্তের জন্য আমরা যদি ভাববার চেষ্টা করি যে, একাত্তরে বাঙালি জাতি বিজয় লাভ করেনি, স্বাধীনতা পায়নি। পরাজিত হয়েছে পাকিস্তানি বর্বরতার কাছে এবং সেই সঙ্গে দেশজ এই রাজাকারগোষ্ঠীর হাতে। একাত্তরের পঁচিশে মার্চের ভয়াল রাতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যে নিষ্ঠুরতা ও হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছিল তা বাঙালির আনুষ্ঠানিক পরাজয় স্বীকারের পরপরই বন্ধ হয়ে যেত কি? কিংবা বাঙালি নারীর গর্ভে সাচ্চা মুসলমান পয়দা করার যে ভয়ঙ্কর হিটলারীয় পরিকল্পনা নিয়ে পাকিস্তানীরা বাঙালি নারীকে ধর্ষণযজ্ঞে নেমেছিল, তা থেকে তারা সরে দাঁড়াত? নিশ্চয় নয়। কারণ তারা তো পঁচিশে মার্চের হত্যাযজ্ঞ কিংবা নির্বিবাদে বাঙালি নারী ধর্ষণ-এর পরিকল্পনা করেছিল এই দেশটিকে তারা পুরোপুরি তাদের করে নেয়ার পরিকল্পনা থেকেই, এই দেশটি ছেড়ে যাওয়ার জন্য তো নয়।

আজকে এই রাজাকার, আল বদর, আল শামস বা গোলাম আযম, নিজামী, সাঈদী, সাকা চৌধুরী, মুজাহিদ, কামরুজ্জামানরা থাকত পাকিস্তানিদের পরের কাতারের শাসক। আমরা ক্রমশ এদের দ্বারা নির্যাতিত হতে হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম। যে কাল্পনিক দৃশ্যটির কথা বলেছি, তা কল্পনায় আনতেই আমাদের কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এমন দৃশ্য কল্পনায় আনাও কষ্টের এবং দুঃখজনক। কিন্তু অত্যন্ত কষ্ট এবং পরিতাপের কথা হচ্ছে, বাঙালি জাতি কিন্তু একাত্তরের এই পরাজিত জাতীয় শত্রুদের হাতেই এখন শাসিত হচ্ছে। এরাই জাতীয় পতাকা উড়িয়ে বাঙালি জাতির রক্তে ভেজা ঘামে ভেজা অর্থের বেসাতি করেছে। এই জাতীয় শত্রুরাই আমাদের জাতীয় অস্তিত্বে ক্রমাগত আঘাত হেনে চলেছে। কখনো ধর্মের দোহাই দিয়ে, কখনো তথাকথিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের কথা বলে আমাদের বিভ্রান্ত করে, কখনো সারা দেশব্যাপী বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে, কখনো রগ কেটে, ব্রাশ ফায়ারে বাঙালির বুক ঝাঁঝরা করে দিয়ে একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে চলেছে। পাকিস্তানিরা আজকে নিজের দেশের অখণ্ডতা রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে আর এদিকে তাদের একাত্তরের দোসররা স্বাধীন বাংলাদেশকে বানানোর চষ্টো করে চলেছে এক ধর্মরাষ্ট্র, তাও যদি প্রকৃত ধর্মের পথকে মেনে হতো তাও না হয় কথা ছিল, কিন্তু এরা তো ধর্মকে ব্যবসায়িক পুঁজি করে মুনাফা লাভের ধান্দায় নেমেছে।

একটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মানবশরীরে যদি কোনো ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া কিংবা ভাইরাস আক্রমণ করে তাহলে তারা শরীরের যে অংশ সংক্রমিত হচ্ছে সেখানে অতি দ্রুত বংশবৃদ্ধি ঘটাতে থাকে। এই ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া কিংবা ভাইরাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারে না মানবদেহের উপকারী ব্যাকটেরিয়া কিংবা ভাইরাসগুলো। যে কারণে আমাদের এন্টিবায়োটিকের সাহায্য নিতে হয়। যাতে মানবদেহের উপকারী ব্যাকটেরিয়া কিংবা ভাইরাস উপযুক্ত পরিবেশ লাভ করে এবং শত্রু ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে দ্রুত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারে। বাংলাদেশের অবস্থাও কিন্তু তেমনই। আমরা কিন্তু এখনও এমনটি দেখিনি যে, গোলাম আযম, নিজামী, মুজাহিদ কিংবা সাকা চৌধুরীর ছেলে তাদের বাপ-দাদার কৃতকর্মকে অস্বীকার করে এবং তাদেরকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বের প্রতি আস্থাশীল হয়েছে।

বরং দেখা যাচ্ছে যে, এসব চিহ্নিত রাজাকারের ছেলেমেয়েরাও তাদের পিতার মতোই মানসিকতা পোষণ করে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আজকে বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশকে এই রাজাকার-ভাইরাস আক্রমণ করেছে এবং তাদের শরীরে, মনে ও মগজে দ্রুত বংশবিস্তার করে চলেছে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির শত্রু রাজাকার-ব্যাকটেরিয়া। এরা কোনো দিন এই দেশ ও জাতির ভালো চায়নি, চাইতে পারে না। যারা জন্মের সময়ই শিশুসন্তানের মতো দেশটিকে নুন খাইয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল তারা কি করে এর ভালো চাইবে? এর পরিপূর্ণতা চাইবে?

আর এখানেই আসে রাষ্ট্রের দায়বোধের ব্যাপারটি। আগেই বলেছি যে, যে কোনো রাষ্ট্রই তার জাতীয় শত্রুর প্রতি কোনো প্রকার ক্ষমা কিংবা নমনীয়তা প্রদর্শন করে না। কারণ শত্রু এক থেকে বহু হতে সময় নেয় না, শত্রুর বংশবৃদ্ধি সব সময় দ্রুততার সঙ্গে ঘটে। তাই প্রথম রাতেই বেড়াল মারার মতো শত্রুকে নিঃশেষ করতে হয় ঠিক সময়মতোই। কিন্তু বাংলাদেশ পারেনি। এই না পারার মাশুল আমাদের কম গুনতে হয়নি। আমরা হারিয়েছি আমাদের জাতির পিতাকে, আমরা হারিয়েছি আমাদের অহঙ্কারের ধন ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানকে এবং সেই সঙ্গে আরো অনেক কিছুই। এর একমাত্র এবং প্রধানতম কারণ হচ্ছে, বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের দেহে প্রবলভাবে বাসা বেঁধে আছে রাজাকার নামক ভাইরাস, আল-বদর, আল-শামস, তথা জামায়াতে ইসলামী নামের ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া। অন্য কোনো জাতি হলে, মুক্তিযোদ্ধা নামের এন্টিবায়োটিক দিয়ে এতদিন এসব ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়াকে ঝাড়-বংশে নিশ্চিহ্ন করে দিত। কিন্তু বাঙালি জাতি বড়ই দুর্ভাগা, কিন্তু দুর্ভাগ্যের শেষ থাকে, একদিন আকাশের কালো মেঘের ফাঁকে উঁকি মারে মেঘভাঙা রোদ।

জাতিকে খাওয়ানো-পরনো এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যেমন রাষ্ট্রের দায়িত্ব তেমনিই বহিঃশত্রুর সঙ্গে হাত মেলানো দেশজ শত্রুকেও জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে নির্মূল করাটাও রাষ্ট্রেরই প্রধান দায়িত্বে পর্যায়ে পড়ে। জাতীয় দেহের ভেতর রাজাকার-ভাইরাসের অভয়ারণ্য রেখে কোনোভাবেই যে সামনে এগুনো সম্ভব নয়, এ কথা এখন আর কোনোভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই যত দ্রুত সম্ভব, এই যুদ্ধাপরাধীদের আরো বংশবৃদ্ধি ঘটার আগেই রাষ্ট্রকেই পদক্ষেপ নিতে হবে

এদের বিরুদ্ধে জাতীয়-এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করার এবং এদেরকে সমূলে বিনাশ করার। রাষ্ট্র যদি পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে সেই এন্টিবায়োটক প্রয়োগের দায়িত্ব চলে যায় সচেতন জনগোষ্ঠীর হতে কিন্তু সেক্ষেত্রে নতুন সমস্যা হিসেবে যে ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা থাকে তাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় গৃহযুদ্ধ বলা হয়ে থাকে। বাঙালি জাতি-ইতিহাসে অনেক দুঃখ-বিবাদ এবং যাতনা সয়েছে, এখন সময় এসেছে একটু শান্তি লাভের। আশা করি, বাংলাদেশ রাষ্ট্র বাঙালি জাতিকে এই শান্তিটুকু দেবে। আধ-পেটে খেয়ে থাকাটাও পোষায়, কিন্তু জাতীয় শত্রুর সঙ্গে ঘর করার চেয়ে মৃত্যুও যে শ্রেয়—এ কথা আজ আপামর বাঙালির প্রাণের কথা, এটাও রাষ্ট্রকেই বুঝাতে হবে এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপও নিতে হবে। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে না পারার ঐতিহাসিক ক্ষত আমাদের সমাজ জীবনকে নানাভাবে বিষিয়ে চলেছে। গণহত্যা, লুণ্ঠন ও নারীর সম্ভ্রমহানির মতো ঘৃণিত কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার পরেও যুদ্ধপরাধীদের বিচারের দাবিটি যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে সেখান থেকে বাংলাদেশের জনগণ বা সরকারকে পিছু হটার সুযোগ নেই। বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়তো বেশ কয়েক বছর লাগবে, যে সময় বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে নেই। সচেতন জনগণের দাবি অনুযায়ী প্রক্রিয়া শুরু করার প্রথম ধাপ হিসেবে একটি কমিশন বা ট্রাইব্যুনাল গঠন করা তেমন কঠিন কাজ নয়।

(একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি যুক্তরাজ্য শাখার উদ্যোগে আয়োজিত 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং রাষ্ট্রের দায়' শীর্ষক ৫ জুন আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে মূল প্রবন্ধ হিসেবে এ নিবন্ধটি উপস্থাপন করা হয়।)

রাজাকার চিকন আলী এবং আজকের বাংলাদেশ

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের পূর্ণ বিজয় অর্জিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণ আশা করেছিলেন যারা গণহত্যা যুদ্ধাপরাধের সাথে জড়িত তাদের বিচার হবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে গত ৩৬ বছরেও যুদ্ধাপরাধী ঘাতক দালালদের বিচার হয়নি। ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক কূটকৌশল আর সুবিধাবাদিতার জন্য যুদ্ধাপরাধী রাজাকার আলবদর, আল-শামস-এর বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব পর্যন্ত পেয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতার সুবাদে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরি করে সর্বত্র ডালপালা ছড়িয়েছে, চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধী নেই। ঘাতক আলী আহসান মুজাহিদের এই বক্তব্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। সারা বাংলাদেশে এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। যুদ্ধাপরাধী ঘাতক দালালদের বিচারের দাবিটি আবার সামনে চলে আসে। বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনগণ মনে করেন বর্তমান সরকার যে সব দুর্নীতিবাজ শত শত বিঘা জমি দখল করেছে তাদেরকে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করেছে। কিন্তু যারা ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল দখল করার ঘোরতর ষড়যন্ত্রে মত্ত ছিল তাদেরকে কেন গ্রেফতার করে কারাগারে ভরা হবে না। যুদ্ধাপরাধী ঘাতক দালালরা একাত্তরে হানাদারকবলিত বাংলাদেশে যে ষড়যন্ত্র করেছিল এখনও তারা একই ষড়যন্ত্রে বিভোর। কিন্তু বর্তমান সরকারের আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের বক্তব্য থেকে এ সত্যই প্রকাশ পেয়েছে তিনি যুদ্ধাপরাধী ঘাতক দালালদের রক্ষা করতেই বড় বেশি তৎপর। এর নেপথ্য কারণ হচ্ছে একাত্তরে তিনি আমাদের মুক্তির লড়াই থেকে নিরাপদ দূরত্বে ছিলেন। জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনের জুডিশিয়াল কমিটিসহ দেশে বিদেশে গণহত্যাকারীদের বিচারের দাবি অতীতের সরকারগুলোর মতো বর্তমান সরকারের কাছেও উপেক্ষিত। এই

ধারাবাহিকতায় চিকন আলীর ফাঁসির আদেশ হলেও কার্যকর হয়নি আর মোটা আলীরা এই দীর্ঘ ৩৬ বছরের মোটাতাজা হয়ে হয়েছে। সার্বিকভাবে অবহেলিত হয়েছেন স্বাধীনতার সূর্যসন্তানরা।

রাজাকার চিকন আলীর ফাঁসি হয়নি। সে রক্ষা পেয়ে গেছে। বাংলাদেশের দালাল আইনে সর্বপ্রথম এবং একমাত্র ফাঁসির দণ্ডাদেশ রাজাকার চিকন আলীকে দেয়া হয়েছিল। চিকন আলী পরবর্তীতে হাইকোর্টে আপিল করে। আদালত ফাঁসির বদলে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। এই নামের কারণেই নাকি হাইকোর্টের বিচারক তাকে ফাঁসির দণ্ড থেকে রেহাই দিয়েছিলেন। বিচারক নাকি সে সময় এজলাসে আইনজীবীদের যুক্তিতর্কের উত্তরে বলেছিলেন চিকন আলীদের ফাঁসি হলে মোটা আলীদের কি হবে।

১৯৭২ সালে ১১ জুন দৈনিক বাংলায় চিকন আলীকে নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ ও বিদেশের সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয় চিকন আলীর মৃত্যুদণ্ডের সংবাদ। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সংবাদটি ছিল 'কুষ্টিয়ার দায়রা জজ ও বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সদস্য শ্রী আর কে বিশ্বাস গত বৃহস্পতিবার রাজাকার চিকন আলীকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছেন। বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ৩০২ ধারা এবং ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল—আদেশের ১১ (ক) ধারা বলে চিকন আলীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। দালাল আদেশের অধীনে এই প্রথম একজনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হলো। মামলার বিবরণের প্রকাশ, বাংলাদেশের দখলদার বাহিনীরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শাসন আমলে মিরপুর গ্রামে চিকন আলী রাজাকার তালিকাভুক্ত হয়। সে হত্যা, লুটতরাজ, ঘরবাড়ি জ্বালানো এবং মেয়েদের মর্যাদাহানির কাজে অংশগ্রহণ করে। ১৯৭১ সালে ১৯ অক্টোবর অভিযুক্ত চিকন আলী তার গ্রামের বাড়িতে কামাল উদ্দিন মণ্ডল নামক এক ব্যক্তিকে বলে যে, সে জনৈক ইয়াজ উদ্দিনের বাড়ি থেকে দুলালী বেগমকে বের করে আনতে ইচ্ছুক। পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারদের হামলা থেকে রক্ষার জন্য আব্দুল গফুরের মেয়ে দুলালী বেগমকে ইয়াজ উদ্দিনের কাছ থেকে উদ্ধার করে গুলি করে ইয়াজ উদ্দিনকে হত্যা করে। চিকন আলীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলেও সেনাশাসক জিয়াউর রহমান দালাল আইন বাতিল ঘোষণা করায় সে ৮

বছর ৪ মাস পরে মুক্তি লাভ করে। চিকন আলীর সাথে তার ভাগ্য প্রতারণা করেছে। জেলমুক্তির পর বাড়ি ফিরে সে আবিষ্কার করে তার স্ত্রীর বিয়ে হয়ে গেছে অন্যত্র। আর যে দুলালী বেগমের জন্য ইয়াজউদ্দিনকে হত্যা করতে পিছপা হয়নি, সেই দুলালীও তখন অন্য ঘরের বাসিন্দা। চিকন আলীর জন্য কেউ আর অপেক্ষায় থাকে না। দরিদ্র চিকন আলী ফিরে যায় মাটি কাটার কাজে। যে দেশের বিরোধিতা করেছিল সেই দেশের মাটি খোঁড়াতেই খুঁজে নেয় সে রুটি-রুজির শেষ আশ্রয়। আমাদের দেখামতে একমাত্র চিকন আলীই হয়তো একজন ভাগ্যাহত রাজাকার। নতুবা আর সব রাজাকার মোটা ছিল, দিনে দিনে আরো মোটাতাজা হয়েছে। নষ্ট রাজনীতির ধারা তাদের হাতে আদর করে তুলে দিয়েছে আলাদিনের এক আশ্চর্য চেরাগ। সেই চেরাগ হাতে পেয়ে এককালে লঞ্চে যে ব্যক্তিটি ফেরি করে বেড়াত, যে ব্যক্তি তার সুরেলা কণ্ঠে বিক্রি করত চুলকানির ওষুধ, একাত্তর তাকে রাজাকার করেছে, ১৯৭৮ সালে দালাল আইন বাতিল হলে সে দায়মুক্ত হয়েছে, পরবর্তী সরকার তাকে দিয়েছে সম্মান-প্রতিপত্তি। সে এখন বড় গলায়, ইসলামের সবক শেখায়। কী আশ্চার্য উত্থান! কী সীমাহীন সৌভাগ্যের বরপুত্র! এককালের 'চুলকানির' ফেরিওয়ালা এখন রাষ্ট্রের লেজ দিয়ে আয়েসে তার কান চুলকায়। মনে মনে হয়তো হাসে, হয়তো বলে, বোকা, বোকা, পুরো রাষ্ট্রজুড়ে বোকার বসবাস। ষোলো ডিসেম্বর, ছাব্বিশে মার্চ বোকারা যায় স্মৃতিসৌধে, চৌদ্দ ডিসেম্বর যায় বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে, একুশে ফেব্রুয়ারি যায় শহীদ মিনারে, পনেরো আগস্ট যায় টুঙ্গিপাড়ায়, বছরের এই ছয়দিন বাদ রেখে বাকি তিনশো ঊনষাট দিন তারা আমাদের সাথেই থাকে। আমাদের সাথে কোলাকুলি করে, আমাদের হাত ধরে ক্ষমতার সাধ পায়, আমরা আর তারা ভাই ভাই, আমরা আর তারা একসাথে গান গাই, "আয় তব সহচরি, হাতে হাতে ধরি ধরি, নাচিবো গিরিগিরি, গাহিবো গান...!'

বাংলাদেশে রাজাকারদের আস্ফালন, নষ্ট রাজনীতিবিদরা তাদের স্বার্থে বছরের পর বছর নীরবে দেখে গেছেন, সহে গেছেন। কিন্তু দেশপ্রেমিক জনতা কখনো একে মেনে নেয়নি। রাজাকাররা তাদের কাছে চিরকাল রাজাকার। রাজাকারের গাড়িতে জাতীয় পতাকা কিংবা রাজাকারদের পাছায় জুড়ে থাকা রাষ্ট্রীয় চেয়ার তাদের অবস্থানকে একটুও ঊর্ধ্বে

তোলেনি। তারা অতি অবশ্যই ঘৃণিত ছিল এবং আছে। তাদের পাপ কখনো লীন হবার নয়।

কিন্তু যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অসুস্থ ধারার বিপরীতে মুক্তপ্রাণ, মুক্তবুদ্ধির মানুষেরা হতবুদ্ধি হয়েছিলেন এবং আছেন। মাঝে মাঝে ভেতরের শুভতম বোধের তাগিদে তারা রাজাকারদের বিচার চেয়েছেন। গঠন করেছেন ঘাতক নির্মূল কমিটি। স্বপ্রণোদিত হয়ে রাষ্ট্রের বিবেক প্রকাশিত হয়েছে মুক্তবুদ্ধির মানুষের চেতনায়। কিন্তু এখানেও হানা দেয় নষ্ট রাজনীতির বীজ। যে বিশাল দায়ভার কাঁধে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, সত্য বলতে সেটি এখনো নিজের ঘাড়ে বহন করে চলেছে এই সংগঠনের অজস্র মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। কিন্তু রাষ্ট্রকে দায়মুক্ত করতে তারা আজো ব্যর্থ। এই ব্যর্থতা নেতৃত্বের নয়, এই ব্যর্থতা মুক্তচিন্তার মানুষের নয়, এই ব্যর্থতা তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। রাজনীতিবিদদের আপসকামী মনোভাব রাজাকারদের বিচারকে বিলম্বিত করেছে এবং আজো বিলম্বিত ও অনিশ্চিত করে রেখেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, রাজাকারদের বিচার করার দায়ভার কার? একজন ব্যক্তি যদি স্বপ্রণোদিত হয়ে রাজাকারদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করেন সেটি কি যুক্তিযুক্ত উদ্যোগ?

উদ্যোগটি প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু সঠিক নয়। এই একটা ক্ষেত্রে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অতিকথনপ্রিয় উপদেষ্টা মইনুল হোসেনের বক্তব্যকে মেনে নেয়া যায়। তিনি বলেছেন, কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করতে পারেন না।

মইনুল হোসেনের কথা এই পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু তার নিজের মুখের কথাটিই তৈরি করে নতুন আরেকটি প্রশ্ন, তবে রাজাকারদের বিচার করার দায়ভার কে নেবে? উত্তর অবশ্যই রাষ্ট্র। কিন্তু রাজাকারদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হলে যেভাবে মইনুল হোসেন উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন তাতে সংশয় স্পষ্ট হয়ে আসে রাষ্ট্রের বর্তমান দায়িত্বশীলরা রাজাকারদের প্রতি সহানুভূতিশীল।

এখন দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তি মামলা করতে পারবেন না, রাষ্ট্র মামলা করবে না। তবে কি রাজাকাররা আপনাতেই দায়মুক্তির সুবাস পাবে অথবা

বর্তমানে সারা দেশে এবং প্রবাসে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চেয়ে যে একটা গণজাগরণ তৈরি হয়েছে সেটি নিষ্ফল আবেদন হয়েই থাকবে?

বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রই যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করেনি। যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করার মাঝে রাষ্ট্রের উদারতা প্রকাশ পায় না। বরং ডানা ভাঙা পাখির মতো রাষ্ট্রের অক্ষমতাই স্পষ্ট হয়ে আসে। কোনো রাষ্ট্র নিজের ঘাড়ে অক্ষমতার অমার্জনীয় কলঙ্ক ধরে রাখতে চায় না। একমাত্র দুঃখজনক ব্যতিক্রম বাংলাদেশ। লংকার রাবণের মতো যে দল ক্ষমতায় গেছে সে দলটিই রাজাকারদের বিচারের প্রশ্ন আশ্চর্য নীরব থেকেছেন সব সময়।

রাজাকারদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত যা বলার সবটাই বলেছেন দেশের সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষ যুদ্ধাপরাধীদের সাথে কোনো বাণিজ্যেই আপসে রাজি ছিলেন না এবং আজো নয়, যতদিন না রাজাকারদের বিচার না হলে আমি বিশ্বাস করি, দেশের মানুষ ততদিন নিজের অবস্থান থেকে, নিজের কণ্ঠকে সাধ্যমতো উঁচু করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করে যাবেন।

কিন্তু তাদের এই দাবিটি পূরণ করতে হবে রাষ্ট্রকেই। এর কোনো বিকল্প নেই। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, একটি অনির্বাচিত সরকারের কাছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করা কতটুকু যুক্তিসংগত? তারা বলছেন, নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকারই পারবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে। তার মানে আবারো অপেক্ষা। একটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় না আসার পূর্ব পর্যন্ত দাবিটি শিশির ভেতরে মুখ বন্ধ করে ছেড়ে দিতে হবে সময়ের দরিয়ার। তারপর যদি আবারও 'হাওয়া মার্কা' সরকার আসে তাহলে তো কথাই নেই। ছত্রিশ বছর ঝুলে থাকা দাবিটি হয়তো চিরস্থায়ীভাবেই ঝুলে থাকবে।

কিন্তু আমি এবং আমরা মনে করি, বর্তমান সরকার চাইলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে। রাষ্ট্রের কোটি কণ্ঠ এই দাবিটি তুলেছে। সুতরাং একে উপেক্ষা করার সুযোগ তাদের নেই। সরকার নির্বাচিত নাকি অনির্বাচিত সেটির চাইতে বড় হচ্ছে, সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশার বিষয়টি।

বর্তমান সরকার বলছেন, দেশে দুর্নীতিবিরোধী অভিযানসহ তারা যা যা করছেন তার সবটাই জনদাবি। জনগণের প্রত্যাশা মতোই তারা কাজ

করে যাচ্ছেন। কথাটি সত্যি ধরে নিয়েই বলা যেতে পারে, এই মুহূর্তে তার চাইতেও অনেক বড় জনদাবি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে যদি সরকার একটি হ্যাঁ/না ভোটের আয়োজন করে তবে দেখা যাবে কেবল হাতেগোনা যুদ্ধাপরাধী এবং তাদের দোসররা ছাড়া দেশের সকল নাগরিকই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষে তাদের রায় দেবেন।

আমরা মনে করি, সরকারের উচিত হবে জনদাবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এই মুহূর্তেই জরুরি, কারণ সারা দেশে এই দাবিটির পক্ষে যে জোয়ার এসেছে তাতে ভীত হয়ে পড়েছে রাজাকাররা। একাত্তর পরবর্তী সময়ে তারা যেমন ভীত ছিল এখন সেই বোধটাই আবার তাদেরকে আঁকড়ে ধরেছে। কোনোরকমে যদি এবার তারা এই অবস্থা থেকে উৎরে যেতে পারে তবে অতি অবশ্যই এমন কোনো কূটকৌশল (কূটকৌশলে তাদের জুড়ি মেলা ভার) খেলবে, সেই কৌশলে ভবিষ্যতে তাদের বিচার প্রক্রিয়াটি আরো বেশিমাত্রায় অনিশ্চিত হয়ে আসবে। এবার যদি রাজাকাররা তাদের গা বাঁচাতে পারে তবে আগামীতে তাদের গা ছুঁয়ে দেখাটাই সম্ভবত দুষ্কর হয়ে পড়বে।

শুভ কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষা করতে নেই। 'শুভস্য শীঘ্রম।' যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সব অর্থেই শুভ একটি কাজ। এর ফলে দেশের কলঙ্কমুক্তি আসবে। দেশকে কলঙ্কমুক্ত করতে হলে আমাদের ভেতরে জেগে ওঠা বোধকে ধরে রাখতে হবে। পথটি অবশ্যই সহজিয়া নয়। তবে সবাই যদি একসাথে হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকি, তবে কোন পথটি কবে, কখন, কোন কালে অলঙ্ঘনীয় থেকেছে?

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বীরসেনানী শহীদ খালেদ মোশাররফ

স্মৃতি কেউ ভুলে কেউ ভুলে না। কিন্তু ইতিহাস কিছুই ভুলে না। ইতিহাস তার নিজস্ব গতিতেই চলে। সত্য কোনো সময় মরে না, সত্য চিরদিন অমর হয়ে থাকে। সত্য মরেও মরে না, হয়তো কোনো কোনো সময় কালো মেঘে সত্যের আকাশটা আড়াল করে ফেলে কিন্তু সূর্যের তেজে সে কালো আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়, অসত্য ও বিকৃত ইতিহাস আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয় কালো গতিধারায়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্থাপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ড নিছক একজন রাষ্ট্রপতি বা জাতির জনকের হত্যাকাণ্ড ছিল না। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে রাষ্ট্রক্ষমতার যে পটপরিবর্তন হয় তাতে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সকল সুফলগুলোকে নির্বাসনে প্রেরণ করে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ববর্তী ভাবধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে বাস্তবে ক্যান্টনমেন্টের পাশাপাশি বঙ্গভবন, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও বেতার ভবনে ঘাতক ৭ মেজরের ব্যারাক বহির্ভূত একটি ভিন্ন কামান্ড ছিল সক্রিয়। সামরিক বাহিনীর অধিকাংশ কর্মকর্তারই ঘাতক ৭ মেজরের বাড়াবাড়ি মেনে নিতে পারছিলেন না। সেনাপ্রধান হিসেবে লে. জেনারেল জিয়াউর রহমানের কর্তব্য ও দায়িত্ব ছিল ভেঙে পড়া সেনাবাহিনীর এই কাঠামোগত শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এ বিষয়ে তাঁর ওপর চাপও ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে জিয়াউর রহমান ছিলেন ঘাতক ফারুক রশিদের পছন্দের সেনাপ্রধান এবং ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের বেনিফিশিয়ারী। ফলে ঘাতকদের বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত নেয়া তার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না কিংবা ইচ্ছা করেই দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে তিনি ধীরে চলো নীতি গ্রহণ

করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন রহস্যময় মানুষ, যাকে বোঝা ছিল খুবই কঠিন। ফলে সেনাসদরে একটা অনিশ্চয়তা বিরাজমান ছিল। খুনি ঘাতকদের বিরুদ্ধে সেনা কর্মকর্তারা খোলাখুলিই আলাপ করতে থাকেন কীভাবে কাউন্টার অ্যাকশন নেয়া যায়। সেনাপ্রধানের কাছ থেকে কোনো নির্দেশ পেতে ব্যর্থ হয়ে ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তারা আর্মি চেন অব কমান্ডের দ্বিতীয় কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের কাছে গেলেন। বাংলাদেশের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম সেনানায়ক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে খুনি ঘাতকচক্র ও তাদের সহায়তাকারীদের বিরুদ্ধে কাউন্টার অ্যাকশন শুরু হলো ৩ নভেম্বর প্রথম প্রহরে। ৩ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর এই দিনগুলো ছিল বিভিন্ন ঘটনার শ্বাসরুদ্ধকর নাটকীয়তায় ভরপুর। এই কাউন্টার অ্যাকশনে খালেদ মোশাররফের রণকৌশলের কাছে খুনি ঘাতকরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এজন্য তাঁকে একটি গুলিও ছুঁড়তে হয়নি। কিন্তু খুনি চক্র ও তাদের রাজনৈতিক সহযোগীদের কূটকৌশলের কাছে খালেদ মোশাররফ চরমভাবে ব্যর্থ হন। যে কারণে একটি মহৎ কাউন্টার অ্যাকশনের বিয়োগান্তক পরিণতি ঘটে মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে সফল সমরনায়ক ও শৌর্যমণ্ডিত বীরমুক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশাররফের নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে। কিছু কিছু মৃত্যু আছে যা মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়। বাংলাদেশের ইতিহাসে খালেদ মোশাররফের মৃত্যু তেমনি একটি মৃত্যু। খুনিদের বিরুদ্ধে খালেদ মোশাররফের অ্যাকশন সঠিক ছিল কিনা তা একদিন ইতিহাসই বিচার করবে। বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে যেখানে বিরামহীনভাবে মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এতে বঙ্গবন্ধুকে জনমানুষের হৃদয় থেকে মুছে ফেলা সম্ভব হচ্ছে না। খালেদ মোশাররফ একজন বীরমুক্তিযোদ্ধা ও সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অপপ্রচার চালানো হয়ে আসছিল সেগুলো যে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ইতোমধ্যে তা প্রমাণিত হয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফ যে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন সেটি ছিল এক নিষ্পাপ ও বিরল প্রজাতির অভ্যুত্থান। মাত্র ৫ দিন স্থায়ী হয়েছিল এই রক্তপাতহীন অভ্যুত্থান। কিন্তু

ব্যর্থ হলো শোচনীয়ভাবে। খালেদ মোশাররফ ছিলেন একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ সামরিক কর্মকর্তা। কিন্তু সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারায় একটি সফল অভ্যুত্থান চরমভাবে ব্যর্থ হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কজনক হত্যাকাণ্ডের পর পাপা টাইগার নামে খ্যাত জেনারেল এম এ জি ওসমানীর সেনাবাহিনীর মধ্যে রক্তপাত এড়ানোর ফর্মুলার অংশ হিসেবে সেনাসদরে একের পর এক সমঝোতা হয়েছে কিন্তু রক্তপাত এড়ানো যায়নি। সেনা কর্মকর্তা আর সেনা কর্মকর্তাদের রক্তে বারবার রক্তাক্ত হয়েছে বাংলার শ্যামল মাটি। গোপন সামরিক বিচারে কত সংখ্যক সেনাসদস্য ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলে প্রাণ দিয়েছেন সে পরিসংখ্যান আজো অজানা এক অধ্যায়। তারপরও খালেদ মোশাররফ সেই পুরনো সমঝোতার পথই বেছে নিয়েছিলেন। অথচ ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব বড়ই রূঢ়। ক্ষমতা দখলকালে চরম নির্দয়তাই যে সাফল্যের প্রধান চাবিকাঠি এ সত্য তিনি প্রয়োগ করেননি। ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের নেতা খালেদ মোশাররফের প্রথম ও প্রধান ভুল— সময়টা ছিল অভ্যুত্থানের সম্পূর্ণ প্রতিকূলে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সারা দেশে একটি ভীতিকর পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। খালেদ মোশাররফের অপারেশনে গোপনীয়তা বলতে কিছু ছিল না। বেতার, টিভি বন্ধ রেখে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য লক্ষ্য সম্পর্কে জাতিকে ও সশস্ত্র বাহিনীকে কিছুই জানতে দেননি। তিনি যে ক্ষমতায় আছেন এর সামান্য উত্তাপও কেউ টের পায়নি। জনগণ ও সৈনিকদের প্রভাবিত করার চেষ্টাই তিনি করেননি। পুরো পাঁচদিন তিনি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন সৈনিক ও জনগণ থেকে। গণমিডিয়া বন্ধ থাকায় সর্বত্র সৃষ্টি হয় নানা গুজব ও বিভ্রান্তি যা খালেদ মোশাররফের বিপক্ষে কাজ করে। একদিকে ভারতীয় প্রচার মাধ্যমে খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান সম্পর্কে উল্লাসমূলক প্রচারণা, রাজপথে জয় বাংলার মিছিল এবং সেই সাথে অভ্যুত্থান সম্পর্কে আতিকুল আলম, এনায়েত উল্লাহ খান প্রমুখ প্রভাবশালী সাংবাদিকের নেতিবাচক ভাষ্য ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে খালেদ মোশাররফের ক্ষমতার ভিত টলটলায়মান করে দেয়। আগস্ট অভ্যুত্থানের পর থেকে আতিকুল আলম ছিলেন রয়টার বিবিসির ঢাকাস্থ সংবাদদাতা। যেহেতু বিদেশী সাংবাদিকদের সে সময় বাংলাদেশে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ছিল সে কারণে

বেশ কিছুদিনের জন্য বহির্বিশ্বে বাংলাদেশবিষয়ক সংবাদের একমাত্র উৎস ছিলেন আতিকুল আলম। এই আতিকুল আলম স্বাধীনতাবিরোধী ভূমিকার জন্য দালাল আইনে গ্রেফতার হয়েছিলেন। অন্যদিকে এনায়েত উল্লাহ খানও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে বঙ্গবন্ধু সরকারের সময় গ্রেফতার হয়েছিলেন। খুনি মোশতাকের শাসনামলে তিনি বাংলাদেশ টাইমসের সম্পাদকের পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন। এই দুই ব্যক্তির মিথ্যা প্রচারণা সামাল না দিয়ে খালেদ মোশাররফ এদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে একাধিক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন বলেও জানা যায়। জাতীয় অস্থিতিশীলতার ঐ কালপর্বে ঢাকার সংবাদ মাধ্যমের প্রভাবশালী দুই সাংবাদিক আতিকুল আলম ও এনায়েত উল্লাহ খান খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ৩ নভেম্বরের সেনা অভ্যুত্থানকে কূটনৈতিক পল্লী ও গণমাধ্যমে ডানপন্থী অভিধায় চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে অতি তৎপর ও উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। তাই বলা যায়, ক্ষমতা সংহত করতে অকল্পনীয় দীর্ঘসূত্রতাই ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানকারীদের ভাগ্য বিপর্যয়ের মূল কারণ। আর সেনাসদরে খালেদ মোশাররফ বিরোধী প্রচারপত্র কারা, কাদের সহযোগিতায় বিতরণ করেছিল তা আজো উদঘাটিত হয়নি। ফারুক-রশিদের দৃঢ় অভিমত হচ্ছে, ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানের নেপথ্য নায়ক জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ নয়। অর্থাৎ জিয়া-শাফায়াতের গোপন সমঝোতায়ই ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। জিয়াকে তার বাসায় শাফায়াতের ট্রুপসের তত্ত্বাবধানে নিরাপদে আটকে রাখা হয়। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা দখলের ঐ দিনগুলোতে বিভিন্ন গ্রুপ বিভিন্ন মতলবে ভয়ংকর গোপন খেলায় মত্ত ছিল, যা উদঘাটন করা বেশ জটিল ব্যাপার। পরবর্তীতে শাফায়াত জামিল ও হাফিজ উদ্দিনের প্রতি সদয় ব্যবহার এই ধারণা বদ্ধমূল করে। অতি সম্প্রতি বিএনপির দুপক্ষের বাকযুদ্ধে থলের বিড়াল বের হতে শুরু করেছে। বেরিয়ে আসছে জিয়া হত্যাকাণ্ড ও ১৯৭৫ সালের ৩ ও ৭ নভেম্বর অভ্যুত্থানের অনেক অজানা কাহিনী। আর এ বাকযুদ্ধে একের পর এক জড়িয়ে পড়ছেন বিএনপির বর্তমান ও সাবেক নেতারা— যারা জিয়া হত্যা ও সেনা অভ্যুত্থানের সময় সেনাবাহিনীতে উচ্চপদে আসীন ছিলেন। ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সংঘটিত সেনা

অভ্যুত্থানে সক্রিয় সাবেক সেনা কর্মকর্তা কর্নেল (অব.) জাফর ইমাম বীরবিক্রম বলেছেন, যে ঘাতক দলটি খালেদ মোশাররফ, কর্নেল হায়দার ও কর্নেল হুদাকে হত্যা করেছিল তা জেনারেল মীর শওকত আলীর নির্দেশেই হয়েছিল। শেরেবাংলা নগরে ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে আশ্রয়কালীন অবস্থায় ৭ নভেম্বর সকালের নাস্তা খাওয়ার সময় ফিল্ড রেজিমেন্টে অবস্থানরত একজন সেনা কর্মকর্তার নির্দেশে কমান্ডিং অফিসারের কক্ষে দশম বেঙ্গলের ক্যাপ্টেন আসাদ ও ক্যাপ্টেন জলিল অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় খালেদ মোশাররফ, কর্নেল হুদা আর লে. কর্নেল হায়দারকে গুলি ও বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি আজো। সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার হলে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সকালের শেরেবাংলা নগরে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডের অনেক রহস্য উন্মোচিত হবে। আজ যারা উর্দি পরে বড় বড় কথা বলছেন, তাদের কাছে বিনীত নিবেদন, ৭ নভেম্বরের হত্যার বিচার করে জাতিকে কলঙ্ক মুক্ত করুন।

বীরমুক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশাররফের জন্ম ১৯৩৭ সালে জামালপুর জেলার ইসলামপুরের মোশাররফগঞ্জে। ১৯৫৫ সালে তিনি সেনাবাহিনীর লংকোর্সে ভর্তি হন এবং ১৯৫৭ সালে কমিশন লাভ করেন। একাত্তরে তিনি ছিলেন মেজর এবং বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে খালেদ মোশাররফই প্রথম বাঙালি সেনা কর্মকর্তা যিনি পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ তাকে ঢাকা সেনানিবাস থেকে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের হেড অফিস কুমিল্লায় বদলি করা হয়। ২২ মার্চ তিনি কুমিল্লা নতুন কর্মস্থলে যোগদান করেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সেনা কর্মকর্তারা কোনোভাবেই খালেদ মোশাররফকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। তাই বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে ২৪ মার্চ তাঁকে মৌলভীবাজার জেলার শমসেরনগর বিমানঘাঁটিতে যোগদানের নির্দেশ দেয়া হয়। অভিযোগ উত্থাপন করা হয় শমসেরনগর এলাকায় নকশালপন্থীদের উৎপাত ও ভারতীয়দের অনুপ্রবেশ ঘটছে এমন খবর তারা পেয়েছে। অথচ এই অভিযোগটি ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। এটি মিথ্যা এবং বানোয়াট এই কারণে বলছি যে, কারণ শমসেরনগর আমারই এলাকা। এখানকার আলো-হওয়ার মানুষ আমি।

খালেদ মোশাররফ যেদিন শমসেরনগর পৌঁছেন সেদিন তাঁর সাথে আমারও সাক্ষাৎ ঘটেছিল। মনে পড়ছে, ২৫ মার্চ দুপুর ২টায় খালেদ মোশাররফ শমসেরনগর পৌঁছে ডাকবাংলোতে ছাউনি গেড়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। মুহূর্তের মধ্যে খালেদ মোশাররফের অবস্থানের খবর এলাকাবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে ঢাকায় পাক বর্বরবাহিনীর গণহত্যার খবর শুনে জনগণের মধ্যে আতঙ্কের সাথে সাথে বিক্ষোভও ছড়িয়ে পড়ে। কমলগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জননেতা এম এ গফুরের নেতৃত্বে ছাত্র-জনতার একটি মিছিল নিয়ে আমরা ডাকবাংলোর পথে 'জয় বাংলা' 'জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে মুখরিত করে এগিয়ে যাচ্ছি। উদ্দেশ্য সেনা কর্মকর্তা খালেদ মোশাররফের বিষয়ে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার করা। তিনি যদি পাক বাহিনীর অনুচর হন তাহলে নিশ্চয় মিছিলের প্রতিরোধ করবেন। আর যদি স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি হন তাহলে উল্লাসে আমাদেরকে স্বাগত জানাবেন। মিছিল ডাকবাংলোর কাছাকাছি পৌঁছার সাথে সাথেই খালেদ মোশাররফ ছাউনি থেকে বের হয়ে এসে স্বাগত জানিয়ে আমাদের নেতা এম এ গফুরকে জড়িয়ে ধরে নিজের মুখে স্লোগান ধরলেন 'জয় বাংলা'। আমরা সবাই সমস্বরে সে স্লোগান উচ্চারণ করে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলি। তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, এই শমসেরনগর থেকে যে সংগ্রাম শুরু হলো সেটা কঠিন ও বিপদসংকুল। সকলেই নিজেকে স্বার্থের ঊর্ধ্বে রেখে দেশ ও জাতির মুক্তির জন্য আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তাঁর সাথের বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকরাও একই অঙ্গীকার করলেন। শমসেরনগর থেকে লে. মাহবুবের নেতৃত্বে একদল সৈন্যকে তিনি শ্রীমঙ্গল পাঠিয়ে সেখানে ডিফেন্স নিতে নির্দেশ দেন, যাতে ফিরে যাওয়ার পথে মৌলভীবাজার থেকে পাঞ্জাব রেজিমেন্ট কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি করতে না পারে। তারপর স্থানীয়ভাবে অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ শুরু করার নির্দেশ দিয়ে রাত ১২টায় তিনি শ্রীমঙ্গলের উদ্দেশ্যে শমসেরনগর ত্যাগ করেন। শমসেরনগরের ডাকবাংলো এখনো আছে। খালেদ মোশাররফ যেখানে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন সে স্মৃতিচিহ্ন এখনো অম্লান হয়ে আছে আমার হৃদয়ে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১১ জন সেক্টর কমান্ডারের মধ্যে মাত্র ২

জন সম্মুখসমরে গুরুতর আহত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে খালেদ মোশাররফের মাথায় গুলি লেগেছিল যা ভারতে অপারেশনের ফলে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। অপরজন কর্নেল তাহের, যার একটা পা হারাতে হয়েছে। খালেদ মোশাররফের সঙ্গে আর যে দুজন শাহাদাতবরণ করেন তাদের মধ্যে কর্নেল এটিএম হায়দার বর্তমানে স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া একটি নাম। মুক্তিযুদ্ধের বীরউত্তম হায়দারকে ভুলে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে জেনারেল নিয়াজীকে নিয়ে যাওয়ার যে দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি হয়ে আছে তাতে নিয়াজীর একপাশে জেনারেল অরোরা আর অপর পাশে জ্যাকেট পরিহিত কোমরে পিস্তল কাঁধে রাইফেলসহ যে যুবককে দেখা যায় তিনিই সেই মহান বীর এটিএম হায়দার। শহীদ হায়দারের বোন ক্যাপ্টেন ডা. সেতারাও ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা বীরপ্রতীক। বাসের অযোগ্য এই বাংলাদেশ ত্যাগ করে তিনি আমেরিকা প্রবাসী ছিলেন, সেখানেই মারা যান। তাঁর মরদেহ বাংলাদেশে নিয়ে এসে দাফন করা হয়েছে। কর্নেল তাহেরকে অবশ্য জিয়া তার জীবনরক্ষার পুরস্কার দিয়েছিলেন ফাঁসিতে লটকিয়ে হত্যা করে। তাই বলা যায় ৭ নভেম্বর ছিল সৈনিকদের ক্ষমতার লড়াই। সে যুদ্ধে খালেদ মোশাররফ পরাজিত। জিয়া বিজয়ী। এতে 'জনতা'র নামটা ব্যবহার অপরাধ বৈকি। জাতীয় চার নেতা হত্যার পরে লালবাগ থানায় ৪ নভেম্বর ১৯৭৫ একটি মামলা দায়ের এবং ৬ নভেম্বর ১৯৭৫ গঠিত ৩ সদস্যবিশিষ্ট বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির কার্যক্রম জেনারেল জিয়া স্থগিত ঘোষণা করেন। তাই চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ৭ নভেম্বর জেনারেল জিয়ার ক্ষমতারোহণ, মুক্তিযোদ্ধা হত্যা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশ ও জাতীয় ঐক্য বিভাজনের কলঙ্কময় দিন হিসেবেই চিহ্নিত। বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই দিনটিকে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে ছুটির দিন হিসেবে বহাল রাখায় সরকারের আসল স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর যে ইতিহাস আমরা পড়ে থাকি সেগুলো আসলেই বিজয়ীদের লেখা ইতিহাস। পরাজিতদের কোনো ইতিহাস হয় না। আর হলেও তা ব্যাপক প্রচার পায় না। নভেম্বর অভ্যুত্থানে খালেদ মোশাররফ

পরাজিত হয়েছিলেন, তাই বিজয়ীরা তাঁর কপালে কলঙ্কের কুলুপ লেপন করে যাচ্ছে। খালেদ মোশাররফ কোনোভাবেই যে ভারতীয় এজেন্ট ছিলেন না, এমন কি আওয়ামী লীগ ঘরানারও কেউ ছিলেন না এ সত্য ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। খালেদ মোশাররফকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হত্যা করেনি, হত্যা করেছেন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সদস্যরা। খুবই মর্মান্তিক এই হত্যার ঘটনা। তারপর এই বীরমুক্তিযোদ্ধা ভুলভাবে চিত্রিত হয়ে আছেন আমাদের ইতিহাসে। ইতিহাসের এই কলঙ্ক মোচনের দায় স্বাধীনতা ও মুক্তির চেতনায় বিশ্বাসী সকলের।

তথ্য সূত্র

১. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, রক্তাক্ত মধ্য—আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর—কর্নেল (অব.) শাফায়াত জামিল

২. তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা—লে. কর্নেল (অব.) এম এ হামিদ

৩. অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ কর্নেল তাহের জাসদ রাজনীতি—আলতাফ পারভেজ

৪. বাংলাদেশ : দ্যা আনফিনিশড রেভ্যুলুশন—লরেন্স লিফশুলৎস

দায়মুক্তি হলো চৌত্রিশ বছর পর

ফাঁসিতে ঝুলুক তারা,
শেষ হোক তাদের বেঁচে থাকার দিন
যারা অবেলায় জাতিকে করেছে পিতৃহীন।
(ড. আবুল হাসনাত মিল্টন)

চৌত্রিশ বছর দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে জাতির সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে। মানুষ নামের যেসব নরপশু পঁচাত্তরের মধ্য আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে অবেলায় এতিম ও কলঙ্কিত করেছিল, সেই ঘাতকদের পাঁচজন গত সাতাশে জানুয়ারি দিবাগত মধ্যরাতে তথা আটাশে জানুয়ারির প্রথম প্রহরে ফাঁসিতে ঝুলেছে। সর্বোচ্চ আদালতের চূড়ান্ত রায়ে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। এর মাধ্যমে বাঙালি জাতি মোটামুটি হলেও কলঙ্কমুক্ত হয়েছে। এই পঞ্চ পাষণ্ড হচ্ছে—লে. কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমান, লে. কর্নেল (অব.) মহিউদ্দিন আহমদ (আর্টিলারি), মেজর (অব.) একেএম মহিউদ্দিন আহমদ (ল্যান্সার), মেজর (অব.) বজলুল হুদা এবং মেজর (অব.) শাহরিয়ার রশিদ খান। তবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বঙ্গবন্ধুর অপর সাত খুনি বিভিন্ন দেশে পালিয়ে আছে। এরা হচ্ছে— লে. কর্নেল (অব.) আবদুর রশিদ, লে. কর্নেল (অব.) শরিফুল হক ডালিম, লে. কর্নেল (অব.) এএম রাশেদ চৌধুরী, লে. কর্নেল (অব.) এসএইচএমবি নূর চৌধুরী, লে. কর্নেল (অব.) আজিজ পাশা, ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মাজেদ এবং রিসালদার (অব.) মোসলেম উদ্দিন। এদের মধ্যে আজিজ পাশা পলাতক অবস্থায় জিম্বাবুইয়েতে নাকি মারা গেছে। জাতির জনকের ঘাতকদলের পলাতক আসামিদের দেশে এনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা এবং বঙ্গবন্ধুর ঘাতকচক্রের মদদদাতা ও সহযোগীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। তা' করা হলেই দেশ ও জাতি পুরোপুরি কলঙ্কমুক্ত হবে। তবে একটি কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে,

জাতির জনকের হত্যার বিচার করে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর পর সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট হত্যার পর খুনিরা দেশ-বিদেশে বিভিন্ন গণমাধ্যমে তাদের জঘন্য নৃশংসতার কথা সদম্ভে বলে বেড়িয়েছে। কেউ পারলে তাদের বিচার করুক বলে চ্যালেঞ্জও দিয়েছে। কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল যে, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করা যাবে না, তাদেরও বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে না। জাতির পিতাকে হত্যার দায়ে তাদের ফাঁসিতে ঝুলতে হবে—কখনো এমন হতে পারে বলে তারা কল্পনাও করেনি। খুনিদের সদম্ভ ঘোষণা ও চ্যালেঞ্জে এ দেশের প্রায় সকলের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটেছে। শুধু তারাই দুঃখ পায়নি, যারা একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী ছিল এবং যারা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের মুনাফাভোগী। এরাও বিশ্বাস করত যে, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার কখনো হবে না। কারণ জাতির জনককে হত্যার পর ক্ষমতায় আসীন হয়েছিল খুনিরাই। তারা ইনডেমনিটি আইনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। পঁচাত্তরের নভেম্বরে খন্দকার মোশতাক তথা খুনিদের সরকারের পতন ঘটে। কিন্তু ক্ষমতায় বসে খুনিদের অঘোষিত সহযোগী ও বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মুনাফাভোগী জেনারেল জিয়ার সরকার। প্রথমদিকে বিচারপতি সায়েম ছিলেন তার শিখণ্ডী মাত্র। সেই পঁচাত্তরের শেষভাগ থেকে ১৯৯৬ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত দীর্ঘ বিশ বছর সাত মাস সেই ভাবাদর্শের বিভিন্ন সরকার বাংলাদেশ শাসন করেছে। কোনো সরকারই বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের কোনো উদ্যোগ নেয়নি। কুখ্যাত ইনডেমনিটি আইন বাতিল করতে জাতির দাবিতে সাড়া দেয়নি। কারণ পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই পর্যন্ত সব সরকারই ছিল জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের মুনাফাভোগী ও নীরব সমর্থক। সেসব সরকার বিভিন্নভাবে বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের পৃষ্ঠপোষকতা, সহযোগিতা ও পুনর্বাসন করেছে। দুজন ঘাতককে প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে (১৯৮৮ ও ১৯৯৬) জাতীয় সংসদের সদস্যও বানানো হয়েছিল।

উনিশশো ছিয়ানব্বই'র জুন মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতির জনকের দল আওয়ামী লীগ তাঁরই কন্যার নেতৃত্বে বিজয়ী হয়ে

সরকার গঠন করে। এই সরকারই বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের রক্ষাকবচ ইনডেমনিটি আইন বাতিলের মাধ্যমে বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশকে কলঙ্কমুক্ত করার উদ্যোগ নেয়। অনেক আইনি লড়াই ও চড়াই-উৎরাইয়ের পর অবশেষে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার সম্পন্ন হয়। অতঃপর খুনিদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে বিশ্ববাসীকে বিলম্বে হলেও সগর্বে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, বাংলাদেশ অন্যায়-অবিচারের দেশ নয়, বাঙালি জাতি অকৃতজ্ঞ নয়। জয় বাংলার দেশে বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের ঠাঁই নেই।

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের বাণী দীর্ঘ প্রায় একুশ বছর নীরবে-নিভৃতে কাঁদার পর ১৯৯৬ সালে আলোর মুখ দেখলেও বারবার অন্ধকারের মধ্যে পড়েছে। হাইকোর্টের রায়ে ঘাতকদের ফাঁসির আদেশ বহাল থাকার পর খুনিরা সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে। এমনি অবস্থায় ২০০১ সালে জাতীয় সংসদের প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বেনিফিসিয়ারি বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসে। তাদের পাঁচ বছর দুঃশাসনকালে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা মুখ থুবড়ে পড়ে। অবশেষে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের সংসদ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোটের ঐতিহাসিক বিজয় ঘটে। এরপর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা ও তা কার্যকর হওয়ার পথ আবারো সুগম হয়। তাই বলা যায় যে, জাতির জনকের ঘাতকদের বিচার ও তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার কৃতিত্ব কোনো দলের একক নয়। এই কৃতিত্বের মূলে রয়েছে বাংলাদেশের জনগণ। যারা দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর বঙ্গবন্ধু হত্যার পর গুমরে কেঁদেছে, ঘাতকদের বিচার এবং তা কার্যকর হওয়ার অপেক্ষা করেছে। ১৯৯৬ এবং ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণ আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বাধীন জোটকে ভোট দিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার এবং বিচারের রায় কার্যকর করার পথ এগিয়ে দিয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতা ছাড়াও তিনি ছিলেন এ দেশের একজন নাগরিক। দেশের সকল নাগরিককে রক্ষা এবং যে কোনো ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডের বিচার করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাই নিছক একজন নাগরিক হিসেবেও জাতির জনক হত্যার বিচার হওয়া ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু রাষ্ট্র

সেই দায়িত্ব পালন না করে গুটিয়ে রেখেছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র সেই দায় থেকে মুক্তি পেল।

সাধারণত সকল মৃত্যুই দুঃখ ও বেদনার। কিন্তু কিছু কিছু মৃত্যু হয় স্বস্তি ও আনন্দের। জাতির পিতার ঘাতকদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ায় দুঃখের পরিবর্তে সারা দেশে পরিলক্ষিত হয় শান্তি ও উল্লাস। পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টে হায়েনারা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে জাতির ললাটে যে কলঙ্ক তিলক লাগিয়েছিল, তা থেকে মুক্তি লাভের ফলে বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ায় সবার মধ্যে ছিল অপার আনন্দ ও স্বস্তি। বঙ্গবন্ধুর খুনিচক্রের যেসব সদস্য বিভিন্ন দেশে পালিয়ে আছে, তাদের দেশে ফেরত এনে শাস্তির ব্যবস্থা এবং জাতির জনকে হত্যাকারীদের পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ মদদদাতা ও সহযোগীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে কলঙ্কমোচনের কাজটি সম্পূর্ণ হবে।

৩০ জানুয়ারি ২০১০

পরিশিষ্ট

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ
পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট কয়েকজনের স্মৃতিতে

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সত্যিকার অর্থেই একটি অনন্য জনযুদ্ধ ছিল। কারণ জনযুদ্ধের প্রধান উপাদান হচ্ছে সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন ও অংশগ্রহণ এবং অসীম ত্যাগ স্বীকার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এত ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ পৃথিবীর সাম্প্রতিক ইতিহাসে খুব কমই হয়েছে। কিন্তু তারপরও একটি দুষ্টচক্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দেশের সাধারণ জনগণের আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদানের প্রতিযোগিতাকে অস্বীকার করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে সামরিকীকরণের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এ প্রচেষ্টার সূচনা হয় বিজয়ের পর স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে সাহসিকতার জন্য সাতজন সামরিক ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ খেতাব 'বীরশ্রেষ্ঠ' পদক প্রদানের মাধ্যমে। বীরশ্রেষ্ঠ খেতাব কোনো বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাকে প্রদান করা হয়নি। বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের এই অবমূল্যায়ন শুধু দুঃখজনক নয়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যে জনযুদ্ধ ছিল, সে সত্যকে অস্বীকার করার নামান্তরও। শাসকশ্রেণীর শ্রেণীগত অবস্থানের কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অথচ কঠিন বাস্তবতা হচ্ছে, একাত্তর সালে পাকহানাদার কবলিত বাংলাদেশে বাঙালি সেনাসদস্যের সংখ্যা মোটেই দশ-বারো হাজারের অধিক ছিল না। এই স্বল্পসংখ্যক সেনাসদস্যের পক্ষে পাকবাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়ানো ছিল অসম্ভব ব্যাপার যদি না দেশের আপামর জনগণ স্বাধীনতাযুদ্ধকে জনযুদ্ধের দিকে এগিয়ে না নিতেন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা পরিচালিত গেরিলাযুদ্ধ, যেখানে সোয়া লাখের অধিক মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর এ যুদ্ধে খাদ্য, অস্ত্রশস্ত্র, ট্রেনিং ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিল ভারত। ভারত এক কোটি শরণার্থীকে দিয়েছিল আশ্রয়।

ভারতের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের পাশে। আমাদের হয়ে লড়তে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে

শহীদ হয়েছেন ৩ হাজার ৬৩০ জন ভারতীয় সৈন্য, আহত হয়েছেন ৯ হাজার ৮৫৬ জন এবং হারিয়ে গেছেন বা লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি ২১৩ জনের। স্বাধীনতাযুদ্ধের নয়মাস ধরে শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে, খাদ্যের যোগান দিয়েছে, নৈতিক সমর্থন দিয়েছে ভারতীয় সরকার। ভারতের মহান নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী আর সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান নেতা ব্রেজনেভের নাম আমাদের অনেকের মন থেকেই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে আরো অনেক নাম, যারা একাত্তরের দুর্দিনে আমাদের সহযোদ্ধা ছিলেন। বাঙালি জাতি যে বিস্মৃতপ্রিয় জাতি এতেই তা প্রমাণিত হয়। একাত্তরের স্মৃতিজাগরিত করার জন্যই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তিত্ব, যারা মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সহযোদ্ধা ছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাদের স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে।



অন্নদাশঙ্কর রায় : প্রয়াত প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় এক আলাপচারিতায় বলেছিলেন, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় যখন শুনলাম শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং অচিরেই তাঁকে হত্যা করা হবে, খবরটি শোনার পর মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। ভাবলাম এতবড় এক মহান নেতা ও দেশপ্রেমিককে হত্যা করা হবে। আর স্থির থাকতে পারলাম না। কাগজ-কলম নিয়ে বসেই লিখে ফেললাম, 'যতদিন রবে পদ্মা যমুনা গৌরি মেঘনা বহমান, ততদিন রবে কীর্তি তোমার, শেখ মুজিবুর রহমান/ দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা, রক্তগঙ্গা বহমান/ তবু নাহি ভয়, হবে হবে জয়, জয় মুজিবুর রহমান। তিনি বলেন, এর বিষয় বঙ্গবন্ধু নয় শুধু, বাংলাদেশও। হৃদয় ফুঁড়ে যেন বেরিয়ে এলো কথাগুলো।

তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দেশপ্রেমের কথা বলতে গিয়ে বলেন, স্বাধীনতার পর তার নেতৃত্বে একদল সাহিত্যিক গিয়েছিলেন ঢাকাতে। বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখাও করেন তারা। বঙ্গবন্ধু সেদিন তাঁর অফিসে একটু বিলম্বে এসেছিলেন। এসেই দুঃখ প্রকাশ করে জানান, গত রাতে তাঁর ঘুম

হয়নি। অধিক রাতে ঘুমোতে যেতে হয়েছিল তাঁর। ঐ রাতে আরব দেশসমূহের সাতজন প্রতিনিধি এসেছিলেন তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে। তাদের তিনি সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত কোনো আমন্ত্রণ গ্রহণযোগ্য নয়। বঙ্গবন্ধুর এই দৃঢ়তা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন তারা। মনে মনে আওড়েছিলেন তাই বুঝি সুকান্ত বলেছিলেন, 'জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার তবুও মাথা নোয়াবার নয়।' তিনি বলেন, একাত্তরের উত্তাল দিনগুলোতে কলকাতার সকল সাহিত্যিকই নৈতিকভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে। মনোজ বসু, নীহাররঞ্জন রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র—এরা তো প্রকাশ্যেই এগিয়ে গিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যার্থে। তিনি মৈত্রেয়ী দেবী, গৌরি আইয়ূব এবং লীল রায়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, এরাও সেদিন বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরিতে সহায়ক-শক্তি হিসেবে কাজ করেছেন। একাত্তরের স্মৃতিচারণ করে অন্নদাশঙ্কর রায় বলেন, একবার মনোজ বসু, নীহাররঞ্জন রায় ও তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী দপ্তরে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও কামারুজ্জামান তখন ছিলেন ঐ দপ্তরে উপস্থিত। তাঁরা তো দারুণ মুগ্ধ। কথায় কথায় তাঁরা বলেছিলেন, 'কলকাতার লেখকরা যদি এই মুহূর্তে তাদের লেখনী দিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ববিবেককে জাগ্রত না করত, তবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এত শক্তি অর্জন করতে পারত না।' উল্লেখ্য যে, অন্নদাশঙ্কর রায় শুধু একজন লেখক হিসেবেই সুখ্যাতি পাননি, তিনি একজন দক্ষ প্রশাসক হিসেবেও সুখ্যাতি পেয়েছিলেন। তিনি রাজশাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে তিনি ছিলেন ময়মনসিংহের জেলা জজ। চট্টগ্রামে এডিএমও ছিলেন তিনি। স্মৃতিচারণ করতে করতে তিনি বাংলাদেশ-ভারত দু'দেশেই সাম্প্রদায়িকতা আর মৌলবাদের উত্থানকে সবচাইতে বড় বিপদ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এদের ঠেকানো না গেলে স্বাধীনতা আর প্রগতি দুইই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তার দৃঢ়বিশ্বাস, বাঙালি জাতি অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তারা কোনো অবস্থাতেই সেই স্বাধীনতা বিপন্ন হতে দেবে না।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : প্রয়াত কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থান বাংলাদেশের দর্শনায়। ১৯৪১ সালে ভারত বিভাগের আগে চলে যান



কলকাতায়। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার খবর পান তিনি সুদূর ভিয়েতনামে বসে। আফ্রো-এশীয় লেখক সংঘের ডেপুটি সেক্রেটারি-জেনারেল হিসেবে তখন তিনি ভিয়েতনাম সফরে ছিলেন। সেখানেই শোনেন পাক-বাহিনীর বর্বরতার কথা, বাঙালি জাতির গর্জে ওঠার কথা। আফ্রো-এশীয় লেখক সংঘের নেতাদের সঙ্গে কথা হয় এসব নিয়ে। তাদেরও সমর্থন ছিল মুক্তিকামী বাঙালি জাতির প্রতি। সেখানে বসেই তিনি লেখেন, 'চোখের সামনে জ্বলছে আমার প্রিয় জন্মভূমি, বাংলাদেশের বাতাসে ভাসছে আমার ধর্ষিতা বোনের চিৎকার, দু আঙ্গুলে কানচাপা দিই। বানের জলের মতো সর্বস্বহারা মানুষ আসছে এপারে, প্রাণ নিয়ে, সম্ভ্রম বাঁচাতে। কি লিখবো আমি ভিয়েতনাম নিয়ে, আমার সামনে তো আরেক ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ।' কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় দেশে ফিরেই বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়ান। সভা-সমাবেশে একাত্ম হন, সংগঠিত করেন অন্য কবি-সাহিত্যিকদের। তিনি ছিলেন 'বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতির সহ-সভাপতি। সমিতির সভাপতি ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সহায়ক সমিতির আহ্বানে ১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে এবং নিরীহ মানুষদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে কলকাতায় পালিত হয় বন্‌ধ্‌ বা হরতাল। সে সময়ের স্মৃতিচারণ করে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, সে সময় সরকারি ভূমিকা কি হবে, জাতীয়নীতি কিভাবে এগুবে তার কথা আমরা ভাবিনি। কলকাতায় শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা অন্তর থেকেই অনুভব করেন তাগিদ। সেই তাগিদ ও দায়িত্ববোধ থেকেই গড়ে ওঠে সহায়ক সমিতি। এই সমিতির হয়ে সেদিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে কলম ধরেছিলেন কলকাতার সকল কবি-সাহিত্যিক। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেন, সেদিন আমাদের যা তাড়িত করেছিল তাতে মানবিকতা ছিল রাজনীতির চাইতে অনেক বেশি। কারণ, বাংলাদেশে দখলদার পাকিস্তানি-বাহিনী প্রকৃতপক্ষে হত্যা করেছিল মানবতাকে, সভ্যতাকে। এজন্যই সবাই সকল দল ও মতের ঊর্ধ্বে উঠে মানবতাকে রক্ষার জন্য মাঠে নেমেছিলেন। তিনি বলেন, কি

অপূর্ব দেশপ্রেম, মুক্তির কি দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ওরা এসেছিলেন এপারে। এত নির্মম পরিস্থিতির মুখেও তারা ভেঙে পড়েননি বরং উজ্জীবিত হয়েছেন। প্রাণ জাগিয়েছেন ঘরবাড়ি ফেলে আসা, যুদ্ধ জয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়া পরিবার আর তরুণদের। সব ফেলে এসে নতুন দেশ পাওয়ার নেশা বুকজুড়ে থাকলেই এমনটি করা সম্ভব। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'ক্ষমা নেই' আজও অম্লান।



দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৯৭১ সালে আকাশবাণী বেতার থেকে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সংবাদ, সংবাদ-সমীক্ষা, সংবাদ-পরিক্রমা শোনার জন্য বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষ অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতেন। রণাঙ্গন থেকে রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাসহ গোটা বাঙালি জাতিকে এক যাদুমন্ত্রে আকৃষ্ট করে রেখেছিলেন তিনি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গেয়ে তিনি বলেন, যুদ্ধরত বাংলাদেশ, যুদ্ধের বিজয় বা আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সাফল্য নিয়ে যখন কোন খবর, সমীক্ষা-পরিক্রমা থাকত তখন ডাক পড়ত তার। পরিক্রমা লিখতেন সুসাহিত্যিক প্রণবেশ সেন। তিনি বলেন, সংবাদ পড়তে গিয়ে এক মানসিক আবেগে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িয়ে পড়েছিলাম। বাংলাদেশ সম্পর্কে খুব বেশি জানতাম না। জেনেছি সংবাদ-পরিক্রমা আর খবর পড়তে গিয়ে। তারপর জেনেছি বাংলাদেশকে নানাভাবে। ভালোবেসে ফেলেছি প্রাণ দিয়ে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬৯-৭০ এর রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতাম কমবেশি। বেতার সাংবাদিক বলে পরিস্থিতি যে দ্রুত নয়া মোড় নিচ্ছে তাও বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু বিষয়গুলো পরিষ্কার হতে লাগল সময় গড়িয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে। গোটা বিষয় স্পষ্ট হয় ১৯৭১ সালের মার্চের শেষ ও এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে। যখন হাজার হাজার, লাখ লাখ শরণার্থী এপারে চলে আসতে লাগল। কিন্তু তখনও আমরা বুঝতে পারিনি কি ভয়াবহ ঘটছে ওপারে। এক এক করে শরণার্থীর দল আসতে লাগল আর আমরা জানতে পারলাম ইতিহাসের কত ধরনের নির্মম ও বর্বর ঘটনার নীরব সাক্ষী এরা। এরা দেখেছে চোখের সামনে বাবার, ভায়ের করুণ মৃত্যু,

বাবা দেখেছেন নিজের চোখের সামনে কন্যার লজ্জাহরণের দৃশ্য, মা দেখেছেন তার দুগ্ধপোষ্যকে বেয়নেটে খুঁচিয়ে মারার ঘটনা। গোটা সংসার, গোটা গ্রাম জ্বলে যেতে দেখেছেন অনেকেই। পাকিস্তানি বাহিনীর আচরণের কথা শুনে আমরা শিউরে উঠেছি, বোধহয় চোখে না দেখলে এসব ঘটনা বিশ্বাস করাও কঠিন। কিন্তু এই কঠিন বাস্তবতাকে বুকে পাথরচাপা দিয়ে এক কোটি মানুষ এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন এপারে।

দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নিজেকে বড় অসহায় মনে হতো সেদিন। একের পর এক নির্মম আর বীভৎস ঘটনায় মুষড়ে পড়েছি। কীই বা করার আছে আমার, কীই বা করতে পারতাম। একমাত্র সম্বল আমার কণ্ঠ, তাও আবার সরকারি বেতারে নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু তবুও যখন সে বাঁধন কিছু আলগা হলো, প্রাণভরে উপভোগ করলাম তা। বুকের ভেতরে লুকানো সবটুকু আবেগ আর উত্তেজনা ঢেলে দিতাম বাংলাদেশের জন্য। রণাঙ্গনের খবর যখন পড়তাম মনে হতো আমিই সেই অকুতোভয় যোদ্ধা, যে সব বাধা পায়ে দলে এগিয়ে চলেছে। যখন বিজয়ের কথা পড়তাম, সমস্ত উল্লাস-উচ্ছ্বাস নেমে আসত কণ্ঠজুড়ে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে, কূটনীতিতে যখন বাংলাদেশের কোনো ঘটনার কথা পড়তাম মনে হতো আমিই লড়ছি বাংলাদেশের হয়ে। যখন করুণ হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা পড়তাম কান্নায় ধরে আসত গলা। শেষদিকটায় যেন নেশায় পেয়ে বসেছিল। উত্তেজনা আর প্রবল আগ্রহে অপেক্ষা। কখন বাংলাদেশের খবর আসবে। আকাশবাণীর বার্তাকক্ষে বসে থাকা আর পড়ার আগেই বাংলাদেশের খবর জানা যেন দায়িত্ব হয়ে গিয়েছিল। সেই যে ঢুকতাম নিউজ রুমে—রাতে সংবাদ পড়তাম, পরিক্রমা পড়তাম, বসে থাকতাম শেষ সংবাদ জানার জন্য। রাতে বাড়ি ফেরা হতো না কোনো কোনো দিন, সেখানেই রাত কাটাতাম আবার যে ভোরের খবর পড়তে হবে।

দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমার পেশাগত জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে ঘটেছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। আমিও প্রাণভরে আমার সেই সময় সেই যৌবন উজাড় করে দিয়েছি বাংলাদেশের জন্য। এমন সময় ক'জন বেতার সাংবাদিকের জীবনেইবা আসে। 'বিনিময়ে'? হ্যাঁ, বিনিময়ে পেয়েছি রাষ্ট্রীয় সম্মান 'পদ্মশ্রী', তার চাইতেও বড় প্রাপ্তি ভালোবাসা। দুই বাংলার কোটি মানুষের ভালোবাসা। আর বিশাল হৃদয় এক বাঙালির

বুকের উষ্ণ আলিঙ্গন যা কখনো ভুলবার নয়। স্মৃতির প্রাঙ্গণ হাতড়ে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা হওয়ার ক্ষণটির কথা। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু যখন পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি হয়ে দেশে ফিরে আসেন তখন তিনি ঢাকায় যান রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে। ছিলেন হোটেল পূর্বাণীতে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বিদেশী সাংবাদিকরা যখন কথা বলছিলেন, তখন বঙ্গবন্ধু হঠাৎই বলে ওঠেন কোথায় সেই আমাদের দেবদুলাল। তিনি এগিয়ে গেলেন, বঙ্গবন্ধু তাকে জড়িয়ে ধরেন। বলে উঠেন, 'আমি জেলে বসেও আপনার সংবাদ আর পরিক্রমা শুনেছি। পাকিস্তান সরকার কিছুদিনের জন্য জেলখানা থেকে রেডিও তুলে নিয়ে গেছে, ক'দিনের জন্য শুনতে পারিনি আপনার কণ্ঠ। পরে অবশ্য ফিরিয়ে দেয় রেডিও।' দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যে নেতা একটি দেশের জন্ম দিলেন, একটি জাতির মুক্তি দিলেন, তিনি এত হত্যা নির্যাতন, ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেও আমার কণ্ঠ শুনেই কেবল আমার নামটি পর্যন্ত মনে রেখেছেন, এইই তো আমার বড় প্রাপ্তি—এ স্মৃতি তো ভুলে যাবার নয়।



ইলা মিত্র : নাচোলের রানীমা, সাঁওতাল বিদ্রোহের নেত্রী প্রয়াত ইলা মিত্র। জীবনই কেটেছে আন্দোলন আর সংগ্রামে, স্বাধীনতার জন্য যার স্বপ্ন আযৌবন, তিনি বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বেন এই তো স্বাভাবিক। সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে ১৯৪৮ সালে তিনি কারারুদ্ধ হন। কারাগারে চলে তাঁর ওপর অমানুষিক অত্যাচার আর নির্যাতন। নাচোল আন্দোলনের বিচারে ইলা মিত্রের প্রথমে ফাঁসির আদেশ হয়, পরে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। ১৯৫৪ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক তাঁকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করেন। তারপর তিনি আর ফিরে আসেননি বাংলাদেশে।

বাংলাদেশের যশোর জেলার বাসুটিয়া গ্রামে ইলা মিত্রের জন্ম। তাঁর স্বামী রমেন মিত্রও একজন কৃষক-নেতা ছিলেন। ইলা মিত্র পশ্চিমবঙ্গের

বিধানসভায় একনাগাড়ে ১৫ বছর সিপিআই-এর বিধায়ক ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ছিলেন। একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ইলা মিত্র বলেছিলেন, বাংলাদেশের সাথে একদিনের জন্যও আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। বাংলাদেশ থেকে প্রগতিশীল আন্দোলনে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারাই আসতেন কলকাতায়, তারা সবাই আমার সাথে দেখা করতে আসতেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহের সাথে একদিনেরও বিচ্ছিন্নতা আমার ছিল না। আমাদের পরিবার ছিল বাংলাদেশের সব ঘটনার সাথে মানসিকভাবে সম্পৃক্ত। ভারতে এসে জড়িয়ে পড়ি রাজনীতির সাথে এ কথা ঠিক, কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতি ছিল আমার চেতনায় প্রতিদিন। একেকটা আন্দোলনের খবর পেতাম, জনগণের জাগরণের ঢেউ, উত্তেজনায় রাতভর ঘুমাতে পারতাম না। সাথে সাথে নানা আশঙ্কাও হতো। কারণ আমি জানি কি ভয়ঙ্কর ওরা, ধর্মের নামে পাকিস্তান বানালেও সভ্যতা মনুষ্যত্ব কোনোকিছুই ওদের কাছে কোনোদিন মূল্য পায়নি। শিক্ষা আন্দোলন, ৬ দফা, ১১ দফার আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান সব ঘটনাই যেন আমার চোখের সামনে ঘটেছে। তবে একটা আশা যেমন ছিল তেমনি আশঙ্কাও পিছু ছাড়েনি। ১৯৭০-এর নির্বাচনে গোটা বাঙালি জাতি যখন একাট্টা হয়ে ছিল আওয়ামী লীগের পক্ষে, তখন ধারণা ছিল পাকিস্তানি শাসকরা অন্তত জনতার রায় মেনে নেবে। কিন্তু একটি দেশের শাসকমহল কতটা জনবিচ্ছিন্ন হতে পারে তা প্রমাণিত হলো ১৯৭০-৭১-এর ঘটনায়।

ইলা মিত্র বলেন, আশঙ্কা যতই থাকুক ২৫ মার্চ থেকে হানাদার পাক-বাহিনী যখন হত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করল সে খবর শোনার জন্য মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। একাত্তরের ২৫ মার্চের পর থেকে একে একে খবর আসতে লাগল, আর আমরা যেন বাকশক্তিহীন হয়ে পড়লাম। কত শত পরিচিতজনের নিহত হওয়ার খবর পেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের অসংখ্য প্রিয় মুখ আর দেখতে পাব না ভেবে ব্যথায় মুষড়ে পড়েছিলাম। ঢাকার, রাজশাহীর, চট্টগ্রামের শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীরা চলে এলেন, এলো বহু স্নেহভাজন ছাত্রছাত্রী, পার্টিকর্মী। এদের কাছে শুনলাম কি ভয়াবহ সব খবর। সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, কিন্তু নৈতিকতাহীন, মানবতাবিবর্জিত এমন সেনাবাহিনী থাকতে পারে তা

ভাবনার অতীত। অবশ্য আমার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েও তা বুঝেছি। তিনি বলেন, একাত্তরে নিজের বাসা ছেড়ে দিয়েছিলেন বাংলাদেশ থেকে চলে আসা বুদ্ধিজীবী নেতাদের থাকার জন্য। কমরেড মনি সিংহ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, বজলুর রহমান আসতেন তাঁর বাড়িতে। থেকেছেনও। ইলা মিত্র ছিলেন 'একাত্তরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি'র যুগ্ম-সম্পাদিকা।

ইলা মিত্র বলেন, একাত্তরে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মানবতাবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদ পশ্চিমবঙ্গের সকল বুদ্ধিজীবী করেছিলেন। তারা মাঠে নেমেছিলেন, শরিক হয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ কলকাতা ভার্সিটির ইনস্টিটিউট হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম সভার আয়োজন করেছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। সে সভায় বক্তব্য রেখেছিলেন অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্ত, কবি তরুণ সন্যাল, শ্রমিকনেতা মাহমুদ ইলিয়াস, অজয় দাশগুপ্ত প্রমুখ। তিনি বলেন, একটি জাতি কতটা নিষ্পেষিত হলে প্রাণ দেয়ার জন্য এগিয়ে যায়, তা একাত্তরে বাংলাদেশের মানুষদের না দেখলে বুঝা যাবে না। গোটা জাতি সেদিন একাত্ম হয়েছিল। ধর্ম, বর্ণ, বয়স, নারী, পুরুষ কোনো বৈষম্য ছিল না। সে এক অপূর্ব একতা। দৃশ্যত এই একতাই একদিকে যেমন বাঙালি জাতিকে যুগিয়েছে বল, অন্যদিকে দেশে ও দেশের বাইরে সমর্থন আদায়ে করেছে সহায়তা। এত বিশাল কর্মযজ্ঞের কিছু ভুলত্রুটি হয়তো হয়ে থাকবে। কিন্তু সব ছাপিয়ে যা তা হলো বাঙালির বিজয়, বাঙালির মুক্তি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ ছিল আমার যৌবনের স্মৃতিভূমি। রাষ্ট্রীয় বিভাজন দেশের অভিন্ন ভালোবাসার মধ্যে ফাটল ধরাতে পারেনি। স্বাধীনতার পর তিন দফা তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন মহিলা পরিষদ এবং শিক্ষক সমিতির সম্মেলন উপলক্ষে। সেসময় দেখা হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে। তখন তিনি বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন, 'সেই ১৯৪৮ সালের মামলা তো এখনও ঝুলছে। বঙ্গবন্ধু তখন তাকে বলেছিলেন, 'এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, আবার মামলা কিসের? সব আন্দোলন তো ছিল এই স্বাধীনতার জন্য। প্রয়োজনে আপনাকে বাংলাদেশের নাগরিত্ব দেয়া হবে।'

ইলা মিত্র বলেন, স্বাধীন ও সাম্যময় এক বাংলাদেশ আমার আজীবনের স্বপ্ন। এই স্বপ্ন লালন করতাম সেই তরুণ বয়সে, লড়াই

করেছি এজন্য, নির্যাতন সয়েছি। আমি তৃপ্ত যে, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরেছিলাম। আমার হৃদয়ে বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত জেগে থাকে।



প্রণবেশ সেন : আকাশবাণীর দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে কে না চেনেন, যারা শুনেছেন একাত্তরে তাঁর কণ্ঠে সংবাদ পরিক্রমা বা সংবাদ পাঠ। কিন্তু কখনো এ কথা কি মনে হয়েছে কে লিখতেন এসব সংবাদ পরিক্রমা আর সংবাদ? অনেকেই হয়তো জানেন, অনেকেই জানেন না এই নেপথ্য কলমসৈনিকের কথা, যার মেধা মূর্ত হয়ে উঠেছিল দেবদুলালের কণ্ঠে। তিনি হলেন প্রয়াত প্রণবেশ সেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, অগ্নিগর্ভা একাত্তরের দিনগুলোর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম এজন্যই যে, বাংলাদেশ আমার জন্মভূমি। যুদ্ধের মাঠে গিয়ে অস্ত্র ধরতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু আমার যা ছিল তাই দিয়ে লড়েছি মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য।

উল্লেখ্য যে, প্রণবেশ সেনের বাড়ি ছিল বাংলাদেশের পাবনা শহরে। পাবনার এডওয়ার্ড কলেজে লেখাপড়া করেছেন। ১৯৫৪ সালে চলে যান ভারতে। তাঁর বাবা কমলেশচন্দ্র সেন পাবনার জিপি ছিলেন। ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর সাথে তাদের ছিল পারিবারিক সম্পর্ক। ১৯৭২ সালে তিনি বাংলাদেশ সফর করে গেছেন। তিনি বলেন, আকাশবাণীতে সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয় সরকারের নীতি অনুযায়ী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে আকাশবাণীর নীতি বুঝে উঠতে সময় লাগে। কিন্তু জন্মভূমিতে হায়েনার ছোবল মন বিষাক্ত করে তোলে আমাদের। তাই প্রথম সুযোগেই যখন কলম খুলে যায় তাতে উঠে আসে প্রাণের কথাগুলোই। প্রতিটি সংবাদ পরিক্রমায় চেষ্টা করতাম বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের সাথে আবেগের মিশেল দিয়ে প্রাণের কথাটুকু বলতে। দেবদুলালের কণ্ঠে তা প্রাণ পায়, আলোড়িত করে সবাইকে। নেশায় পাওয়া মানুষের মতো একাধারে লিখেই চলেছিলাম। বুঝতে পারিনি শ্রোতারা কতটুকু নিচ্ছে। আর আমার বোঝার কথাও নয়, কারণ বেতারের স্ক্রিপ্ট লেখক আমরা যারা তারা সব সময়ই নেপথ্যের

মানুষ। কিন্তু দিন গড়ানোর সাথে সাথে সময়ও পাল্টে যায়। ততদিনে লক্ষ কোটি মানুষ এসে গেছেন ভারতে। কেউ এসেছেন সর্বস্ব হারিয়ে, কেউ এসেছেন যুদ্ধে নামার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে, কেউ এসেছেন প্রবাসী সরকারের দায়িত্ব নিয়ে। তখন স্বাধীন বাংলা বেতারের যাত্রা হাঁটি হাঁটি পা পা করে শুরু হয়েছে বা হচ্ছে। প্রতিক্রিয়া পেতে লাগলাম। কেউবা ফোনে, কেউবা চিঠি লিখে, কেউবা সংবাদপত্রে লিখে শুভেচ্ছা জানাচ্ছিলেন। কিন্তু আমাকে সবচাইতে বেশি তাড়িত করেছে জন্মভূমির প্রতি নাড়ির টান।

প্রণবেশ সেন বলেন, আমার লেখা আর দেবদুলালের পাঠে মুগ্ধ শরণার্থী হিসেবে আসা বহু বাঙালিই শুভেচ্ছা জানাতে আসতেন আকাশবাণীতে। কিন্তু তাদের হৃদয় আসলে কতটা জয় করতে পেরেছি তার প্রমাণ হলো একদিন। এক গাড়িভর্তি বেশ ক'জন তরুণ এসে দাঁড়াল আকাশবাণী ভবনের সামনে। ভেতরে খবর গেল আমার আর দেবদুলালের সাক্ষাৎপ্রার্থী। দেখেই বুঝলাম বাংলাদেশ থেকে এসেছে ওরা। মুখ শুকনো, চোখ দিয়ে যেন আগুন ছিটকে পড়ছে। পরিচয় পেয়ে প্রণাম জানাল। ওদের সবার এক দাবি, ওরা যুদ্ধে যাবে, আমরা কিছু করতে পারি কি না। তাদের সরাসরি দাবি, 'দাদা এতদিন কথা শুনিয়েছেন, এবার আমাদের অস্ত্র আর ট্রেনিং দিন, আমরা যুদ্ধে যাব।' তিনি বলেন, সে স্মৃতি মনে হলে রক্ত টগবগ করে ওঠে। কি এক সময় ছিল, কি দুর্দান্তই না ছিল সেই তরুণরা। কোনো চাওয়া নেই, কোনো জড়তা নেই, কেবল দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে যাওয়ার স্বপ্ন, প্রাণ দেয়ার আকাঙ্ক্ষা। জানি না সেই তরুণরা এখন কে কোথায় আছে। তবে তাদের জন্য বুকের মধ্যে যে শ্রদ্ধা তা কোনোদিন মুছে যাবার নয়। তিনি আকাশবাণীর সংবাদ বিভাগের বিশেষ করে সংবাদ বিচিত্রার প্রযোজক উপেন তরফদার, 'বঙ্গ আমার জননী আমার' অনুষ্ঠানের প্রযোজিকা কবিতা সিংহ, সংবাদ পাঠক দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদানের কথা স্মরণ করে বলেন, ওরাই প্রথম বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে আকাশবাণীতে ধরে রেখেছিল। তিনি 'শোন একটি মুজিবের কণ্ঠ থেকে...' গানটির রচয়িতা গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার এবং গীতিকার ও শিল্পী অংশুমান রায়ের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বলেন, এই দুই মহান ব্যক্তি আকাশবাণীকে তাদের লেখা গান ও সুর দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বেগবান করে রেখেছিলেন।

প্রণবেশ সেন বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অংশুমান রায়, গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার এবং তাকে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য পদক দেয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু দিয়ে যেতে পারেননি সে পদক। তার আগেই তিনি ঘাতকদের হাতে সপরিবারের শহীদ হন। তিনি বলেন, পদক পাওয়া বড় কথা নয়। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে হয়তো এই সূত্রেই তার সাথে দেখা হতো, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা জানাতে পারতাম এই মহান ব্যক্তিত্বকে, যিনি আমার জন্মভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে মুক্তির গান শুনিয়েছেন, স্বাধীনতার মর্যাদা দিয়েছেন। যার জন্য স্বাধীন আমার জন্মভূমি। সেই হিমালয়সম মানুষটির স্পর্শ না পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটি চিরদিনই অতৃপ্ত থেকে গেল।



ডা. জয়নাল আবেদিন : ডাঃ জয়নাল আবেদিন একাত্তর সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি আটবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য ছিলেন। একাত্তর সালে গঠিত সরকারের রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান এবং 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতি'র সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন। একসময়ে অবিভক্ত দিনাজপুরের বাসিন্দা ডাঃ জয়নাল আবেদিনের বাংলাদেশের প্রতি রয়েছে গভীর ভালোবাসা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় একজন কংগ্রেস নেতা হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে যাওয়া হাজারো শরণার্থীর পাশে। বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সাহায্যের হাত। ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরেছেন। খোঁজ নিয়েছেন শরণার্থীদের। তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, শুধু লড়াইয়ের ময়দানে জীবন দিয়ে নয়, স্বাধীনতার জন্য বাঙালি জাতি যে কি নিদারুণ কষ্ট ভোগ করেছেন তা স্মরণ করে আশ্চর্য হয়ে যাই। তিনি বলেন, রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নয় শুধু, রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে ছুটে বেড়িয়েছি শিবির থেকে শিবিরে। কারণ, খাবার আর স্বাস্থ্যসমস্যা তখন সবার জন্যই একাকার হয়ে গিয়েছিল। আমরাও যে খুব স্বয়ংসম্পূর্ণ তা তো

নই। কাজেই শরণার্থীদের ধাক্কাটা সামলানো সত্যি কঠিন হয়ে পড়েছিল। আমাদের যতটুকু করার তা সবটুকু করেছি বাংলাদেশ থেকে আসা ভাইবোনদের জন্য। তিনি বলেন, কি আশ্চর্য আমরা যে খুব এগুতে পারিনি, সাম্প্রদায়িকতাকে অতিক্রম করে যেতে পারিনি। দুই দেশেই মৌলবাদী শক্তি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাইছে। অথচ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভারতে ও বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার কবর দিয়েছিল। ১৯৭১ আমাদের আর একবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে, আমাদের সমাজে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই। সেদিন সব মানুষ মিশে গিয়েছিল এক আত্মায়। সাম্প্রদায়িকতার হয়েছিল অবসান। একে অপরের কাঁধে হাত রেখে মানুষের কল্যাণের জন্য ব্রতী হয়েছিল সবাই। শরণার্থী শিবিরের রুগ্ন অনাহারক্লিষ্ট মানুষের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, সে এক আশ্চর্যের ব্যাপার। সব শরণার্থীই কিন্তু একই কথা বলতেন, যে তারা ভারতে থাকতে আসেননি। খেতে পাননি, ওষুধেরও অভাব ছিল। কিন্তু রেডিও ছিল সব শিবিরেই কমবেশি। 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র-এর একেকটি বিজয়ের সংবাদে তারা সবাই উদ্বেলিত হতেন। কখনো কখনো বলতেন, দাদা আমরা তো ঘরবাড়ি ছেড়ে থাকতে আসিনি। দেশে স্বাধীন হলে আমরা চলেও যাব। তিনি গর্ব ভরে বলেন, এই বোধহয় বাঙালি, এত দুঃখকষ্ট তবুও মাথা নোয়াবার নয়। আমরা আমাদের যা ছিল ততটুকু ঢেলে দিয়েছিলাম আমাদের ভাইবোনদের জন্য। কোনো বিভেদ পার্থক্য আমাদের মধ্যে ছিল না। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি সবচাইতে জটিল অবস্থায় পড়েন শরণার্থী শিবিরে ডায়রিয়া, কলেরা ছড়িয়ে পড়ার সময়ে। তিনি বলেন, প্রায় দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। তখন তো আর এখনকার মতো 'ওরাল স্যালাইন' চালু হয়নি। গোটা উদ্যোগ আমরা কাজে লাগাই ডায়রিয়া যাতে মহামারী আকারে ছড়িয়ে না পড়ে তা ঠেকাতে। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মহান অবদানের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, ইন্দিরাজী সার্বক্ষণিকভাবে বাংলাদেশের শরণার্থীদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতেন। তিনি সেদিনকার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. ত্রিগুণা সেন এবং প্রবীণ নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের কথাও স্মরণ করে বলেন, অবাঙালি একজন নেতা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে এসে জয়প্রকাশ নারায়ণ শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনেছেন, দেখেছেন, তাদের সাথে কাজ করেছেন।

এদের সবার আন্তরিকতা ভুলে যাবার নয়। তিনি বারবার শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে স্মরণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা। তার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে ১৯৭২ সালে ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে মুজিব-ইন্দিরার সমাবেশের কথা। তিনি সে সময় রাজ্য কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। স্বভাবতই এই সমাবেশের সব দায়িত্ব তাকেই পালন করতে হয়। কেন্দ্রের নির্দেশে হঠাৎ করে ২৪ ঘণ্টা এগিয়ে আনতে হয় সভার সময়। কিন্তু তাতে জনতার উদ্যম কমেনি। সেই বিশাল সমাবেশের মতো আর কোনো সমাবেশ কলকাতায় আর হয়নি।

ডা. জয়নাল আবেদিন বলেন, ইন্দিরাজী সেদিন অল্পকথায় বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ভারতের সহায়তার কথা বলেছিলেন। অভিনন্দন জানিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু ও তার মাধ্যমে গোটা বাঙালি জাতিকে। আর বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ছিল বিনয়, আবেগ, কৃতজ্ঞতা আর প্রতিশ্রুতিতে ভরা। নয়া একটি স্বাধীন দেশের নেতা হিসেবে তাঁর ভাষণ সর্বমহলের প্রশংসা অর্জন করে। ডা. জয়নাল আবেদিন ১৯৭২ সালে একবার এসেছিলেন বাংলাদেশে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের সাথে। তখন তাদের সাথে আরও ছিলেন, এবিএম গনি খান চৌধুরী, আব্দুছ ছত্তার, মায়া রায় প্রমুখ।



বিজয় সিংহ নাহার : বিজয় সিংহ নাহার একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গের উপ-মুখ্যমন্ত্রী, কংগ্রেসের সভাপতি এবং বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতির কার্যকরী সভাপতি ছিলেন। কমিটির সভাপতি ছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অজয় কুমার মুখার্জী। সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন হরিদাস মিত্র (বাংলা কংগ্রেস), ডাঃ জয়নাল আবেদিন (কংগ্রেস), অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্ত (সিপিআই,) অধ্যাপক নির্মল বসু (ফরোয়ার্ড ব্লক) ও অরুণ কুমার মৈত্র (কংগ্রেস)। সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন স্বাধীন গুহ (সিপিআই), অরুণেশ দত্ত রায় (বাংলা কংগ্রেস), গোপাল কুমার (কংগ্রেস) এবং করজিৎ বসু (ফরোয়ার্ড ব্লক)। কোষাধ্যক্ষ ছিলেন প্রফুল্ল ঘোষ (কংগ্রেস)।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করে বিজয় সিংহ নাহার বলেন, একাত্তরের যুদ্ধ সে তো আমারই জন্মভুমি স্বাধীন করার যুদ্ধ। এ যুদ্ধ সে তো আমারই মুক্তির জন্য যুদ্ধ। কাজেই আমি কখনো অনুভব করিনি এই যুদ্ধ থেকে আমি বিচ্ছিন্ন। একাত্ম হয়েছিলাম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে। নিজের রাজনৈতিক অবস্থানতো বটেই, ব্যক্তিগত জীবনের গোটা সময় ও সুযোগটুকু ব্যবহার করেছিলাম বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের জন্য। উল্লেখ্য যে, কংগ্রেস নেতা বিজয় সিংহ নাহার বাংলাদেশেরই সন্তান। দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জে তাদের ছিল বিরাট জমিদারি। ঠাকুর দাদা ছিলেন রায় বাহাদুর সেতাব নাহার। তাঁর নামেই সেতাবগঞ্জ চিনির মিল। জমিদারি উচ্ছেদ হওয়ার পর চলে যান ভারতে।

বিজয় সিংহ নাহার বলেন, সোহরাওয়ার্দী ও শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের সাথে রাজনীতি করেছেন তিনি। সাবেক পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের অনেক নেতার সাথেই তাঁর পরিচয় ছিল। সেসব নেতাই তাকে বারবার বলেছিলেন পাকিস্তানে ফিরে আসলে গ্রেফতার করা হবে। এই হুমকির ফলে তিনি আর পাকিস্তানে আসেননি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও আসতে পারেনি জন্মভূমিতে। তিনি বলেন, রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বে ছিলাম। সঙ্গত কারণেই ঘরের পাশে কি ঘটছে তার খবর রাখতে হতো। কিন্তু আমার আগ্রহ ছিল অন্যত্র। কারণ বাংলাদেশ আমার জন্মভূমি। ভাগ্যের টানে আমাকে জন্মভূমি ফেলে ভারতে চলে আসতে হয়েছে। কিন্তু জন্মভূমির সব দুঃখকষ্টের সাথে মানসিকভাবে সবসময়ই একাত্ম ছিলাম। একাত্তরে বিভিন্ন শরণার্থী শিবির চষে বেড়ানোর কথা বর্ণনা করে তিনি বলেন, মানুষের প্রতি মানুষের সহমর্মিতার এমন দৃষ্টান্ত বোধকরি আর কখনো খুঁজে পাওয়া যাবে না। ধর্মের কোনো বিভেদ সেদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি। মানুষ দুঃখের সময় এক হয়ে যায়, তাই বুঝি পাক হানাদার বাহিনীর চরম নির্যাতনের মুখে সব বাঙালি সেদিন এক হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে ধর্ম, আঞ্চলিকতা বা কোনো ব্যবধান ছিল না।

তিনি বলেন, আমরা কতদূর কি করতে পেরেছি তার মূল্যায়ন করবে বাংলাদেশের মানুষ। কিন্তু এ কথা ঠিক, ভারতবর্ষের সব ধর্ম-বর্ণের মানুষ সেদিন সর্বস্ব হারিয়ে আসা মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমানের আহ্বানে, 'যার যা অছে তাই নিয়ে' বাঙালিরা রুখে দাঁড়িয়েছিল পাক হানাদার বাহিনীকে, আর আমরা সাধারণ ভারতবাসীরা যার যা আছে তাই নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম নির্যাতন ও নিপীড়নে জর্জরিত বাংলাদেশের মানুষের পাশে। এই দাঁড়ানো শুধু লোক দেখানোর জন্য নয়, এরা কাঁধে এসে পড়েছে এড়ানো যাচ্ছে না সে জন্যও নয়। আন্তরিকভাবেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম এই মানুষগুলোর আর কোনো উপায় নেই। আর কোনো পথ নেই বলেই এরা রুখে দাঁড়িয়েছে। তরুণ ও মধ্যবয়সীরা রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধের মাঠে, প্রাণ দিতেও তাদের কুণ্ঠা নেই। তাদের পাশাপাশি শরণার্থী শিবিরে এসে আশ্রয় নেয় এমন সব মানুষ ও পরিবার—যারা তাদের চোখের সামনে দেখেছে পৃথিবীর জঘন্যতম ঘটনাবলী। দেখেছে বাড়িঘর পুড়ে শেষ হয়ে যাওয়ার দৃশ্য, দেখেছে স্বজনের মৃত্যু, দেখেছে নিজেদের স্বপ্নের মৃত্যু। কিন্তু একটি স্বপ্ন তাদের বুকে জ্বলজ্বল করছিল তা হচ্ছে স্বাধীনতা। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এই মানুষগুলোর মধ্যে এই প্রশ্নে কোনো হতাশা ছিল না। তারা যেন নিশ্চিতই ছিল স্বাধীনতা তারা পাবেই। আমাদের সবার সকল শ্রম স্বার্থক হলো যেদিন বাংলাদেশের বিজয় এলো। এ বিজয় আমাদের জন্যও আকাঙ্ক্ষিত ছিল।

একাত্তরে বিজয় সিংহ নাহারের বাড়িটা হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামীদের অফিস। রাজনৈতিক নেতা, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী সকলেরই আনাগোনা ছিল এই বাড়িতে। বিরাট রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী বিজয় সিংহ নাহার ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর শিষ্য। তাঁর জীবনের দুটি আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ রয়ে গেছে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা হলো না, কথা হলো না। আমাদের ইন্দিরাজীর পর এ অঞ্চলে আর এতবড় মাপের মানুষের কথা জানা নেই। বড় সাধ ছিল তাঁর সঙ্গে কথা বলার। অপর আকাঙ্ক্ষাটি ছিল বাংলাদেশে যাওয়া, সেতাবগঞ্জের মাটির ঘ্রাণ নেয়া। কিন্তু এ দুটি আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণতা না হওয়ায় তাঁর দুঃখবোধের শেষ নেই।

স্বাধীন গুহ : সিপিআই-এর এক সময়কার রাজ্য মুখপাত্র স্বাধীন গুহ বাংলাদেশেরই সন্তান। বরিশালের দেহেরগতি গ্রামে তাঁর জন্ম। ছাত্র



ছিলেন ঢাকার আরমানিটোলা সরকারি বিদ্যালয়ের। ছিলেন ঢাকা জেলা ছাত্র কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। একাত্তর সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে স্বাধীন গুহ বলেন, কত রাত যে ঘুমাইনি তার হিসাব নেই। ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরেছি, কথা শুনেছি শরণার্থী শিবিরে গিয়ে। শুনেছি তাদের সমস্যার কথা, সর্বস্ব হারিয়ে দেশত্যাগী হওয়ার কথা। কিন্তু তাদের চোখেমুখে জ্বলজ্বল করত স্বাধীনতার স্বপ্ন। ১৯৭১ সালে স্বাধীন গুহ বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে সহায়ক সমিতির পক্ষ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান সুবিমল মুখার্জীর সম্পাদনায় বের হয়েছিল বাংলাদেশে গণহত্যার বিভিন্ন ঘটনার ওপর পুস্তিকা। একাত্তর সালে বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতির তিনি একজন সম্পাদক ছিলেন।

একাত্তরের স্মৃতিচারণ করে স্বাধীন গুহ বলেন, প্রাথমিকভাবে আমার দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষের দেখাশোনা করা। কিন্তু মার্চের পর থেকেই এত মানুষের ঢেউ এপারে এসে লাগল যে আমাদের হিমশিম খাবার যোগাড়। এসব মানুষ কি ভয়ানক অতীত ফেলে এসেছে তা শুনে শিউরে উঠতাম। আমি ঢাকাতেই বড় হয়েছি। কাজেই ওদের মুখে যখন শুনতাম ঢাকায় পাক-বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের কথা, জ্বালাও-পোড়াও আর নারী ধর্ষণের কথা, প্রাণের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠত। সব হারিয়ে যারা এলো তাদের বুকে টেনে নিয়েছিলাম। এই দায়িত্ব পালনের মধ্যে ছিল জন্মভূমির প্রতি টান। আমার মনে হয়, যে জন্মভূমি ছেড়ে এসেছিলাম, একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কিছুটা দায়িত্ব পালন করে যেন মায়ের ঋণ কিছুটা শোধ করতে পেরেছিলাম।

তিনি বলেন, একটি ঘটনার কথা তাঁর মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামারুজ্জামান মেঘালয়ের ডালুতে যান শরণার্থীদের অবস্থা দেখতে। তাঁর সম্মানে সেদিন সেখানে হয়েছিল এক জনসভা। জনসভার শুরুতে বলা হয়, এখন অনুষ্ঠান শুরু হবে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার মাধ্যমে। তখনও কেউ জানত না বাংলাদেশের

জাতীয় সঙ্গীত কী? শুরু হলো 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' হাজারো মানুষের করতালি আর স্লোগানে যেন জনসভায় এলো এক নতুন প্রাণের জোয়ার। সে এক অভাবনীয় দৃশ্য।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসেই একবার এসেছিলেন বাংলাদেশে। সে সময় বেগম মতিয়া চৌধুরীর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশে তিনি বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ যেন কখনো ভুলে না যান কত দাম, কী মূল্য দিয়ে তারা এই স্বাধীনতা অর্জন করেছেন।



চুনী গোস্বামী : ভারতের এক কৃতী খেলোয়াড় চুনী গোস্বামী। কেবল ফুটবলেই নয়, ক্রিকেটেও পেয়েছিলেন খ্যাতি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন কলকাতার ক্রীড়াবিদরাও। তারাও প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছিলেন। চাঁদা তুলেছিলেন। একাত্তরের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশেই আমার পিতৃপুরুষের আদিবাস। বৃহত্তর ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ জেলার যশোদল গ্রামে। তাই এত দুর্বলতা। আর একাত্তরে আমি আরো বেশি দুর্বল ছিলাম, ভাবতাম বাংলাদেশের জন্য কিছু করতে পারি কি না। আর এ কারণেই সেসময় মোহনবাগান ফুটবল টিমের অধিনায়ক হয়ে চেষ্টা করেছি কিছু করার।

চুনী গোস্বামী বলেন, একাত্তরে পাক হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ ছিল সর্বব্যাপী। ক্রীড়াবিদরাও এ থেকে রেহাই পাননি। ফলে বাংলাদেশের বেশকিছু খ্যাতিমান খেলোয়াড় চলে আসেন কলকাতায়। তখন আমি মোহনবাগান টিমের অধিনায়ক। আর মোহনবাগান ক্লাবের সম্পাদক ছিলেন ধীরেন দে। সবার কথা মনে না পড়লেও বাংলাদেশের খেলোয়াড় জাকারিয়া পিন্টু আর সালাহ উদ্দিনের কথা মনে আছে। সেসময় ওরা এসে বলল, স্বাধীনতার যুদ্ধ চলছে। পাক হানাদার বাহিনীর তাণ্ডবের মুখে সব হারিয়ে তাদের মতো অনেকে চলে এসেছে ভারতে। তারা চান কলকাতার মাঠে কিছু প্রদর্শনী ফুটবল খেলতে। আমরা তখন কলকাতার চ্যাম্পিয়ন

দল। ওদের ডাকে সাড়া দেই। এই সাড়া ছিল দুটো কারণে। প্রথমত, ক্রীড়াবিদদের আন্তর্জাতিক সংহতির শপথ আর পিতৃভূমির প্রতি টান। আমার তো নাড়ির টান রয়েছে বাংলাদেশের সাথে।

চুনী গোস্বামী বলেন, এরপরেই আমরা ব্যবস্থা করি প্রদর্শনী ম্যাচের। খেলা হয় মোহনবাগান মাঠে। স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল নামে নতুন দেশের পতাকা হাতে নিয়ে, যে দেশের জন্ম হয়নি, যুদ্ধ চলছে। এ তো খেলা নয়, যেন মুক্তিযুদ্ধ। ভালোই খেলেছিল ওরা। এমনিভাবে সেদিন আমরা বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের সমর্থন দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে এগিয়ে নিই। পরে বাংলাদেশের টিম আরো দুটি প্রদর্শনী ম্যাচে অংশ নেয়। বাংলাদেশের অনেক ক্রীড়াবিদ সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। আর অনেকে অংশগ্রহণ করেন খেলার মাঠে। সেদিন কলকাতার ক্রীড়াবিদরাও মাঠের এই যোদ্ধাদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন।

চুনী গোস্বামী একটি শ্রেষ্ঠ স্মৃতির উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতা সফরে এলেন। নামলেন মোহনবাগান মাঠে নির্মিত হ্যালিপ্যাডে। নেমেই তিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন মোহনবাগানের। হেসে বললেন, আপনাদের পতাকার রঙের সাথে আমার দেশের পতাকার রঙের খানিকটা মিল রয়েছে যে। বঙ্গবন্ধু কৃতজ্ঞতা জানালেন মুক্তিযুদ্ধকালে প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ আয়োজন করার জন্য। বঙ্গবন্ধু আরো বলেন, আপনারা যে ছোট্ট দেশটিকে সেদিন স্বীকৃতি দিয়েছিলেন সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ। চুনী গোস্বামী বলেন, এটি আমার জীবনের এক স্মরণীয় স্মৃতি। একটি মুক্তিসংগ্রামের নেতা কি বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা জানালেন একটি ক্লাবকে, ক্লাবের খেলোয়াড়দের প্রতি। কত প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী আর বিশাল হৃদয়ের মানুষ হলে এভাবে প্রাণ উজাড় করে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারেন তা আমার কাছে এক বিস্ময়।

উল্লেখ্য যে, চুনী গোস্বামী ভারতের জাতীয় দলে খেলেন ১২ বছর। হয়েছিলেন সর্বভারতীয় ফুটবল টিমেরও অধিনায়ক। পেয়েছিলেন স্বর্ণপদক জাকার্তায় এশিয়ান গেমসে। মোহনবাগানে খেলেছেন ১৪ বছর। অধিনায়ক ছিলেন ৫ বছর। তিনি রঞ্জি ট্রফিতে ক্রিকেট খেলেছেন দশ বছর। বাংলা ক্রিকেট টিমেরও তিনি অধিনায়ক ছিলেন। চুনী গোস্বামী

এশিয়া ও ভারতের সেরা ফুটবলার হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন। রাষ্ট্রীয় উপাধি 'পদ্মশ্রী' এবং 'অর্জুন' পেয়েছেন।



ডা. অশোক বাগচী : ১৯৭১ সালে সব হারিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়া বাঙালিদের জন্য শরণার্থী শিবির আর প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোতে যে ক'জন চিকিৎসক ঘুরে বেড়িয়েছেন সহায়তা দেয়ার জন্য, তাদের মধ্যে অন্যতম ডা. অশোক বাগচী। তিনি ভারতের একজন প্রখ্যাত স্নায়ুশল্য চিকিৎসক। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের চিকিৎসক। বাড়ি ছিল বাংলাদেশের পাবনা জেলার তাঁতিবন্দ গ্রামের চৌধুরীবাড়ি। একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে কলকাতার 'কংগ্রেস এক্সিবিউশন' রোডে তার বাড়ি হয়ে উঠেছিল পাবনা জেলার মানুষের ঠিকানা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, সে সময় কলকাতার সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের হাজারো চিকিৎসক নেমেছিলেন শরণার্থীদের কল্যাণের জন্য। সেবা করেছেন নিরলসভাবে। এদের মধ্যে ছিলেন, ডা. মুরারী মুখার্জী, ডা. ভাস্কর রায় চৌধুরী, ডা. রপেন রায়, ডা. নৃপেণ সেন, ডা. অঞ্জলি ভূষণ রায় চৌধুরী প্রমুখ।

ডা. বাগচী বলেন, আমি তো বাংলাদেশের ছেলে। আমার জন্য ঐ সংগ্রাম ছিল জন্মভূমির স্বাধীনতার সংগ্রাম। আমার কথা ভিন্ন। কিন্তু সে সময় আরো চিকিৎসক যারা মুক্তি সংগ্রামীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের অবদান কোনোদিন ভুলে যাওয়ার নয়। তিনি বলেন, চিকিৎসক হিসেবে মানুষের সেবা করাই আমার ব্রত। কিন্তু একাত্তর সালে আমাদের সামনে এক অপূর্ব সুযোগ এসেছিল। ভারতের চিকিৎসকরা সেদিন মানবতার জন্য তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করেছিলেন প্রাণ উজাড় করে। এলাকাভিত্তিক কোনো বিশেষ টিম ছিল না। কিন্তু কিভাবে যেন জানাজানি হয়ে গেল আমি পাবনার লোক। আর তারপরই যেন ঢল নামল সে এলাকার মানুষের। কি এক করুণ পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল আমার জন্মভূমির মানুষেরা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়। তা না হয় মাথা পেতে নেয়া যায়, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে একটি দেশের সেনাবাহিনী তাদের দেশের

মানুষকে এভাবে হত্যা করতে পারে, এভাবে নির্যাতন করতে পারে এটা ভাবা যায় না। প্রতিহিংসার রাজনীতি কি ভয়াবহ হতে পারে এর চাইতে বোধহয় আর কোনো নজির নেই। ডা. বাগচীর সব স্মৃতি জুড়ে রয়েছে বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তার শেষ দেখা হয় ১৯৭৫ সালের ৭ আগস্ট। ডা. বাগচীর নিজের কাছে রয়েছে নেতাজী সুভাষ বসুর কিছু দুর্লভ ছবির সংগ্রহ। এ কথা শুনে বঙ্গবন্ধু খুবই আগ্রহী হয়েছিলেন। তাকে বলেছিলেন ঐসব ছবির একটি অ্যালবাম পেতে তিনি আগ্রহী। ডা. বাগচীও কথা দিয়েছিলেন তা দেবেন বলে। ঢাকা থেকে ভারত ফিরে গিয়ে সেই অ্যালবাম তৈরির কাজে হাত দেন। তৈরিও হয় দ্রুত। কিন্তু ততদিনে সব শেষ হয়ে গেছে। ডা. বাগচী বলেন, আমার জীবনের এই দুঃখ কোনোদিনই ঘুচবে না, বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দিতে পারলাম না তাঁর কাঙ্ক্ষিত অ্যালবামটি।

অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী : একাত্তর সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান এবং বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি একজন সাবেক সাংসদ, জনতা দলের রাজ্য কমিটির সভাপতি এবং সারা ভারত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন। তাঁর আদি নিবাস ছিল বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের ষোলঘর গ্রামে। ঢাকায় থাকতেন আরমানিটোলায়। ১৯২৯ সালে ভারতে চলে যান। তাঁর ঠাকুরদা কেদারেশ্বর চক্রবর্তী ছিলেন একসময় ঢাকার এসপি।

একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের স্মৃতিচারণ করে অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী বলেন, ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ ইউপিএ'র সংবাদদাতা অজিত দাসের কাছে শুনতে পান ২৫ মার্চের রাত থেকে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়েছে পূর্ববাংলা জুড়ে। মানুষ জীবন বাঁচাতে পালাচ্ছেন বাড়িঘর ছেড়ে। ঢাকা থেকে পালিয়ে এসেছেন সুইডিশ সাংবাদিক ওহিয়া। কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেলে তাঁর সাথে আলাপকালে সুইডিশ সাংবাদিক ওহিয়া বলেন, ওপারের অবস্থা খুব খারাপ, পালিয়ে ভারত এসেছেন। পূর্ববাংলার মানুষের এখন দুটিই দাবি। তরুণরা জানতে চায় কিভাবে বোমা বানানো যায়, আর সাধারণ মানুষ চায় তাদের ওপর পাকিস্তানি

হানাদার বাহিনী যে নির্যাতন চালাচ্ছে, ক্ষমতা হস্তান্তর না করে যে অন্যায় করছে, তা যেন বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেয়া হয়। সাংবাদিক ওহিয়ার কাছে ২৫ মার্চের যে বর্ণনা শুনলাম তাতে মূর্ছা যাবার যোগাড়। একটি জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দমিয়ে দিতে সে দেশেরই সেনাবাহিনী এত ভয়ানক আচরণ করতে পারে, এত নির্মম ও বীভৎস হতে পারে, একটি শিক্ষিত সেনাবাহিনীর সদস্যদের এ আচরণ কোনোমতে মেনে নিতে পারছিলাম না। সাংবাদিক ওহিয়ার বক্তব্য শুনতে শুনতে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, এ অবস্থায় ভারতবর্ষের শিক্ষকরা চুপ করে থাকতে পারেন না। বাংলাদেশের ঘটনার ওপর একটি প্রস্তাব লিখে সরাসরি যোগ দেই সিনেট অধিবেশনে।

সেখানে তিনি প্রস্তাব করেন বাজেট অধিবেশন সংক্ষিপ্ত করে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্র-শিক্ষক ও সাধারণ মানুষের ওপর যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালানো হচ্ছে সে ব্যাপারে প্রস্তাব নেয়ার জন্য। যথারীতি পরিস্থিতি আলোচনা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাজেট অধিবেশন শেষ হয়ে যায় কয়েক মিনিটের মধ্যেই। গঠিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি।

অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী বলেন, শিক্ষক হিসেবে সচেতন দায়িত্ববোধ তো ছিলই, তার সাথে বোধ করি যোগ হয়েছিল জন্মভূমির প্রতি নাড়ির টান। সমিতি গঠন করার পর রাতদিন কাজ করেছি। একে একে সময় গড়তে থাকে। ঢাকা থেকে বন্ধুবান্ধব পরিচিতজনরা এলেন, তাদের কাছে সব খবর শুনে শিউরে উঠলাম। কি ভয়াবহ ঘটনারই না প্রত্যক্ষদর্শী তারা। যেভাবে পাকহানাদার বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আর ছাত্রদের মূল টার্গেট করে হত্যা করেছে, তার কোনো নজির নেই। বাংলাদেশ থেকে শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী যারা ভারত এসেছিলেন তাদের অনেকের সাথে মতবিনিময় করে আমাদের করণীয় নির্ধারণ করতে লাগলাম। তিনি বলেন, প্রথমে শিক্ষকদের সমিতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক হলেও দ্রুতই তা ছড়িয়ে দিলাম ভারতের সর্বত্র। এই কমিটি ভারতের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সংগঠিত করে দ্রুততম সময়ে। কমিটির তহবিলে প্রথম চাঁদা দেন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু। এই কমিটি তখন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ড. ডিএস কোঠারির কাছে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে একটি অনুরোধ চিঠি লিখে জানান, সকল

শিক্ষক যেন তাদের একদিনের বেতন বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির তহবিলে দান করেন। প্রচুর সাড়া পড়ে সে আবেদনে। সে তহবিল থেকেই বাংলাদেশের বেশকিছু শিক্ষককে সম্মানী দেয়ার কিছু ব্যবস্থাও করা হয়। এমনিভাবে বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে এগিয়ে আসে। সহায়ক সমিতি প্রকাশ করে ১৪টি পুস্তিকা। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, 'বাংলাদেশ : দি ট্রুথ', পুস্তকের কভারে ছবি ছিল 'একটি কুকুর একটি মহিলার মৃতদেহ খাচ্ছে'। এই পুস্তিকাটি বাংলাদেশের প্রতি বিশ্ববিবেক জাগ্রত করার জন্য পাঠানো হয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে।

অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী বলেন, সেসময় সারা ভারতের শিক্ষকরা যে সচেতনতা ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছিলেন তার কোনো তুলনা নেই। আসলে শিক্ষক হিসেবে মুক্তমনের প্রতিটি মানুষই এভাবে একটি জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দমনের চেষ্টা মেনে নিতে পারেননি। কাজেই সকল সহায়তা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকাকে নিজের জীবনের অন্যতম ঘটনা বলে উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানটি প্রথম যেদিন গৃহীত হয় সেদিনের স্মৃতি। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে সংবিধান গৃহীত হওয়ার দিনটিতে তিনি ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন। সেসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কথাও বলেছেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা হওয়ার স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, এত বড় মাপের মানুষ আমার জীবনে খুব কমই দেখেছি। বাংলাদেশ সে মহান নেতার নেতৃত্বে দীর্ঘপথ এগিয়ে যেতে পারল না তা খুবই দুঃখজনক। স্বাধীনতার এক বছরের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন কি ঘটতে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎকালে কথার ফাঁকে-ফাঁকে বলেছিলেন, 'চক্রবর্তী একটি গুলি আমাকে অনুসরণ করছে। দেশে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি দারুণভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।' তাঁর সে আশঙ্কাই শেষপর্যন্ত সত্য হলো বলে অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী মন্তব্য করেন।

রতন কুমার ঘোষ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যার পথনাটক কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের মানুষকে আলোড়িত করেছিল,



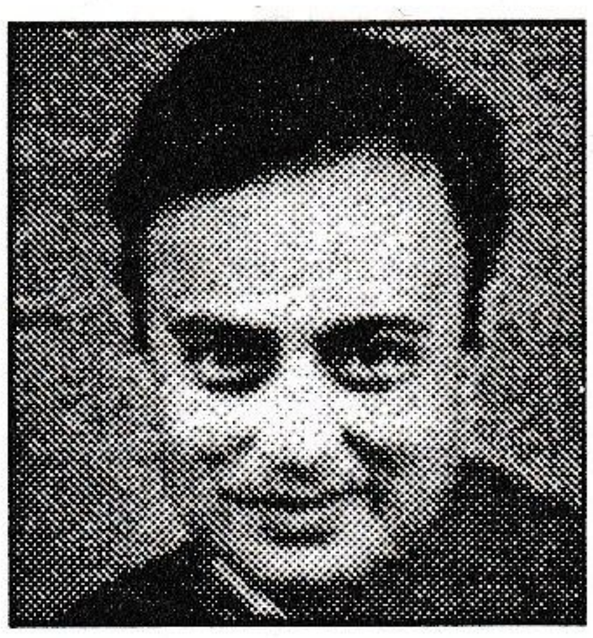
বাংলাদেশের গণহত্যা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বিবেককে জাগ্রত করেছিল তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত নাট্যকার রতন কুমার ঘোষ। রতন কুমার ঘোষের আদি নিবাস ছিল বৃহত্তর খুলনা জেলার বাগেরহাটের বেলেডাঙ্গা গ্রামে। ১৯৫১ সালে তিনি চলে যান ভারতে। রতন কুমার ঘোষ রূপকধর্মী নাটক বেশি লিখেছেন। প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ৫৬টি নাট্যগ্রন্থ। রেডিওতে প্রচারিত হয়েছে ৮১টি এবং দূরদর্শনে ৫টি নাটক। তাঁর বিখ্যাত নাটক 'অমৃত্যস্য পুত্রা'র ১৬ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি লিখেছেন ৩টি পথনাটক। সেগুলো হচ্ছে—'রক্ত স্বাক্ষর', 'নতুন দিন' ও 'পূর্ব দিগন্ত'। ১৯৭১ সালে যশোর ও খুলনার কিছু নাট্যকর্মী এই তিনটি নাটকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে এ তিনটি নাটক প্রদর্শিত হয়েছিল বিভিন্ন হাটবাজারে।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করে রতন কুমার ঘোষ বলেন, একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতার সর্বস্তরের মানুষ আর বুদ্ধিজীবীদের সাথে নাট্যকার এবং নাট্যকর্মীরাও একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রখ্যাত নাট্যকার ও নাট্যশিল্পী মনোজ মিত্র এবং বাদল সরকারের কথা উল্লেখ করে বলেন, সেসময় তারা নৈতিক সমর্থন দিয়ে এগিয়ে নিয়েছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে। মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। আর এ লড়াইয়ে সেদিন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দ্বিধাহীন চিত্তে সমর্থন যুগিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশ নামে একটি নতুন দেশের অভ্যুদয় হয়েছে। আর এই স্বাধীন দেশের মানুষ আজ বাংলায় কথা বলেন, রাষ্ট্রভাষা তাদের বাংলা, এ গর্বের ইতিহাস আজ বিশ্বে বাংলাদেশই সৃষ্টি করছে। রতন কুমার ঘোষ নাট্যকার হিসেবে পেয়েছেন নাট্য একাডেমি পুরস্কার, সর্বভারতীয় রেডিও নাটক পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুরস্কার, ঋত্বিক ঘটক স্মৃতি পুরস্কার, একাডেমি অফ ড্রামা, মিউজিক এন্ড ফাইন আর্টস পুরস্কার ইত্যাদি। পুরস্কার প্রাপ্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ১০ হাজার টাকা মূল্যের নাট্য একাডেমি

পুরস্কারের চেয়ে তার কাছে সে সময়কার এক টাকা মূল্যের একটি পুরস্কার ছিল অনেক দামের। একাত্তরের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, তারিখ মনে নেই তবে বাংলাদেশ তখন অবরুদ্ধ। এ অবস্থায় যশোর সেনানিবাসের কাছে একটি গ্রামের হাটে তার লেখা 'রক্ত স্বাক্ষর' মঞ্চনাটকটি মঞ্চস্থ হয়। তিনি নিজেও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নাটক দেখে দর্শক-শ্রোতারা অভিভূত। নাট্যগোষ্ঠীর ভক্তকর্মী একটি মাটির ভাঁড় নিয়ে এগিয়ে যান দর্শক শ্রোতাদের কাছে। যে যা পারেন তা তুলে ঐ ভাঁড়ে। এসময় এক বৃদ্ধ এগিয়ে আসেন। একটি টাকা দিয়ে বলেন, 'এটা আমি তোমাকে দিচ্ছি বাজান।' রতন কুমার ঘোষ এক টাকা পুরস্কার পেয়ে আবেগে জড়িয়ে ধরেন বৃদ্ধকে। সেদিনকার স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে রতন কুমার ঘোষের হৃদয়ে।

রতন কুমার ঘোষ বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় খুলনার সাতজন যুবক আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। একদিন ঐ সাত যুবকের পরিচিত অপর এক যুবক এসে ওদের নিয়ে যায় বনগাঁয়ে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিংয়ের জন্য। তিনদিন পর এক যুবক এসে খবর দেয় যে যুবক তাদের নিয়ে গেছে সে ছিল পাকিস্তানিদের চর। সে সাত যুবককে ভুলিয়ে নিয়ে যায় বাংলাদেশ সীমান্তে। সেখান চার জনকে হত্যা করা হয়, তিনজন পালিয়ে আসে। এই ঘটনাটি রতন ঘোষকে দারুণভাবে পীড়িত করে। তিনি বলেন, একই সাথে দেশপ্রেম আর বিশ্বাসঘাতকতার এই নজির বড়ই অদ্ভুত। রতন কুমার ঘোষ স্বাধীন বাংলাদেশ তিনবার সফর করেছেন ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনার বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর আমন্ত্রণে। সবশেষে গিয়েছিলেন ১৯৮৮ সালে। সেসময় তাঁর নিজের গ্রামের বাড়িতেও গিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল গ্রামের বাড়িতে গিয়ে তিনি দেখবেন সেই অতীত দিনের ছবির মতো গ্রামকে, শুনবেন পাখির ডাক, হাঁটবেন ধানের ক্ষেত দিয়ে, সরু সরু রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়াবেন। কিন্তু সে সাধ মেটেনি। তবুও তিনি বলেন, পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করে আমার জন্মভূমিতে স্বাধীন পতাকা উড়ছে এ যে আমার অহংকার।

অনিল চ্যাটার্জী : বাংলা চলচ্চিত্রের সফল অভিনেতা অনিল চ্যাটার্জী। চলচ্চিত্র শিল্পী অনিল চ্যাটার্জী বাংলা চলচ্চিত্রের গৌরব। প্রায় তিনশো



ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সিপিএম-এর একজন বিধায়ক ছিলেন। একাত্তরের স্মৃতিচারণ করে অনিল চ্যাটার্জী বলেন, একাত্তরে সিনেমাই আমার জগৎ ছিল। কিন্তু চোখের সামনে যখন মানবতার নির্মম মৃত্যু প্রত্যক্ষ করছিলাম, যখন সভ্যতাকে দলিত হতে দেখলাম পাশবিক শক্তির হাতে, যখন বর্বর হানাদার বাহিনীর হাতে শিল্পীর মৃত্যু ঘটল চোখের সামনে, তখন মনে হয়েছিল বসে থাকার সময় নেই। তাই রাজপথে পা বাড়ালাম, হাত পাতলাম মানুষের সামনে। দাবি একটাই, এত দিন আমার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছেন সবাই, হাততালি দিয়েছেন, এখন ঘরের পাশের দেশের মুক্তিসংগ্রামে সহায়তা দিন। এই বাংলার মানুষ সে সময় না বলেননি। তারা হাত বাড়ান সাহায্যের, বুক উজাড় করে দেন আশ্রয়ের। সব হারিয়ে বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছিলেন তারা তো আমারই ভাইবোন, এ কথা সে সময় এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যাইনি।

একাত্তরের স্মৃতিচারণ করে অনিল চ্যাটার্জী আরো বলেন, চলচ্চিত্রশিল্পী ও কলাকুশলীরাও সে সময় সাড়া দিয়েছিলেন পূর্ব বাংলার অসহায় মানুষদের ডাকে। তারাও জনমত গড়ে তুলেছিলেন। সাহায্যের জন্য চাঁদা তুলেছিলেন। শুধু কি তাই, একাত্তর সালের মে মাস থেকে শুরু করে মাত্র চার মাসের মধ্যে শুটিং করে তৈরি করেছিলেন 'জয় বাংলা' ছবির স্বনামধন্য পরিচালক উমা মৈত্র। ছবির কাহিনীকার ছিলেন মিহির সেন। পণ্ডিত রবিশংকর মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বের করেছিলেন, 'ওয়ে টু বাংলাদেশ' রেকর্ড। রেকর্ডটি সে সময় বিশ্ববিবেককে বাংলাদেশের পক্ষে জাগ্রত করার একটি অস্ত্র ছিল। পণ্ডিত রবিশংকর বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরি করতে বিদেশ গিয়েও অনুষ্ঠান করেছেন। একাত্তরে বোম্বে ও কলকাতার চলচ্চিত্রজগতের প্রখ্যাত পরিচালক, কলাকুশলী সবারই ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আন্তরিক সমর্থন। সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, তপন সিংহ, উৎপল দত্ত, মৃণাল সেন, সম্ভু মিত্র, শক্তি সামন্ত, পাহাড়ী সন্যাল, বসন্ত চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, বিকাশ রায়, বিভাস চক্রবর্তী, তৃপ্তি মিত্র, সবিতাব্রত দত্ত, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তম কুমার,

তরুণ কুমার, সুচিত্রা সেন, ছায়াদেবী, সন্ধ্যা রায়, সুতিয়া দেবী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, বিশ্বজিৎসহ সকলেই এগিয়ে এসেছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে। সেসময় বিশ্বজিৎই বোম্বের শিল্পীদের মধ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি নৈতিক সমর্থন আদায়ের জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়ই সেসময় বোম্বের বহু নামিদামি শিল্পী বাংলাদেশের সাহায্য তহবিলে দান করতে এগিয়ে আসেন।

অনিল চ্যাটার্জী আরো বলেন, যে মনুষ্যত্ব আর আন্তরিকতা একাত্তরে সবার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলাম তা কখনো ভুলে যাবার নয়। পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে আশ্রয় নেয়া মানুষের গভীর প্রত্যয় দেখে অভিভূত হয়েছি। নির্মম ও বর্বর নির্যাতনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এবং শত নিপীড়নের মধ্যেও তারা সামান্যক্ষণের জন্য ভুলে যাননি স্বাধীনতার কথা, মুক্তির কথা। অপরদিকে ভারতের মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে আসা এক কোটি মানুষকে নিয়েছিলেন আপন করে। সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব, জাতপাত ভুলে বাঙালি পরিচয়টি হয়ে উঠেছিল সবচাইতে বড় সত্য। অনিল চ্যাটার্জীর ধারণা, দুই বাংলার মানুষের ভালোবাসার সেতুবন্ধন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে প্রেরণা যুগিয়েছে। তিনি বলেন, আমরা নিশ্চিত ছিলাম বাংলাদেশ স্বাধীনতা পাবেই। কারণ এই লড়াই ছিল মানবতার সপক্ষের লড়াই। কোনো অবস্থাতেই মানবতার হার নেই, পরাজয় নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাহসী নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে অনিল চ্যাটার্জী বলেন, এটি ভাবা যায় না তাঁর ডাকে কাতারে কাতারে মানুষ প্রাণ দেয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন এমনি বড় মাপের নেতা যার সামনে অন্যায়, অসভ্যতা আর বর্বরতা পরাভব মানতে বাধ্য। তিনি বলেন, বাংলাদেশই তো বিশ্বসভায় একটি পূর্ণাঙ্গ দেশ হিসেবে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করছে। যে জাতি এত মূল্য দিয়ে স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জন করেছে তারা তাকে হারিয়ে যেতে দেবে এ কথা বিশ্বাস করি না।

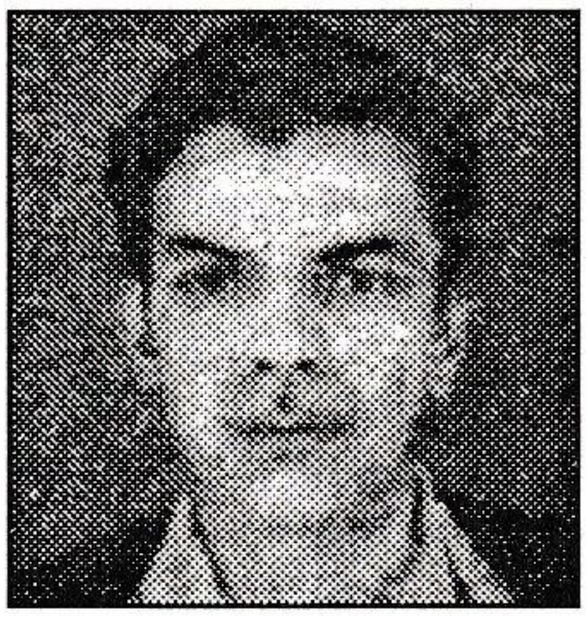
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের বিশেষ করে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো সাহসী ভূমিকা পালন করেছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতি, কালান্তর, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, স্টেটসম্যান যেমন সাহসী

ভূমিকা নিয়েছিল, তেমনি ভূমিকা রাখে দিল্লির প্যাট্রিয়ট পত্রিকাও। এসব সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের কলম ছিল মানবতার সপক্ষে, বাংলাদেশের নির্যাতন, নিপীড়ন আর গণহত্যার বিরুদ্ধে। এসব সাংবাদিকের মধ্যে যাদের নাম শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারণ করতে হয় তাদের মধ্যে রয়েছেন 'আনন্দবাজার'-এর তৎকালীন সম্পাদক অভীক সরকার, বরুণ সেনগুপ্ত, শিবদাস ভট্টাচার্য, তরুণ গাঙ্গুলী, অমিতাভ চৌধুরী, সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, পরিমল ভট্টাচার্য, শুভ্রাংশু গুপ্ত, সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত, বসুমতীর রণেন মুখার্জী ও সুনীল দাস, 'যুগান্তর'-এর তুষার কান্তি ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মিহির গাঙ্গুলী, অনিল ভট্টাচার্য, 'কালান্তর'-এর চিত্তপ্রিয় রায়, দিলীপ চক্রবর্তী, আশু দত্ত, অনিল গুহ, 'অমৃত বাজার' এর তুষার কান্তি ঘোষ, 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এর অমিতাভ দাশগুপ্ত, সৌমেন মুখার্জী, 'প্যাট্রিয়ট'-এর প্রফুল্ল রায় চৌধুরী, 'ইউএনআই'-এর গোপালকৃষ্ণ রায়, 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'র গৌতম অধিকারী, 'নিউ এজ'-এর প্রভাত দাসগুপ্ত, 'হিন্দুস্থান'-এর সুদামা সিং এবং অতীন দাশ প্রমুখ।



প্রফুল্ল রায় চৌধুরী : একাত্তর সালে যেসব প্রবীণ সাংবাদিক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কলম ধরেছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই এখন আর নেই। প্রফুল্ল রায় চৌধুরী একাত্তরে দিল্লির 'প্যাট্রিয়ট' ও লিংক' পত্রিকার কলকাতাস্থ বিশেষ প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি সাংবাদিকতা শুরু করেন ১৯৫২ সালে 'প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার মাধ্যমে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি খবর সংগ্রহের জন্য ঘুরেছেন সীমান্ত এলাকা ও ক্যাম্প। রিপোর্টও করেছেন প্রচুর। তাঁর আদিবাস বাংলাদেশের বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে। একাত্তরের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, একাত্তর সালের ৯ ডিসেম্বর কয়েকজন সাংবাদিকের সাথে গিয়েছিলেন যশোর। যশোর ক্যান্টনমেন্টেও গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন রান্না করা খাবার, বিরিয়ানি, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি ফেলে পাকিস্তানি সৈন্যরা পালিয়ে গেছে। সেখানে তিনি কুড়িয়ে পান এক বালুচ সেনার ডায়েরি, তার নাম আব্দুল কাদের সিদ্দিক। সে ডায়েরিতে বেশ কিছু কথা লিখেছিল। প্রফুল্ল

রায় চৌধুরী কলকাতায় ফিরে গিয়ে ডায়েরির সে লেখা অনুবাদ করান। এতে সেই বালুচ সেনার অনুভূতি ছিল এরকম, 'আমরা যুদ্ধ করি, আর ওরা (পাক-বাহিনী) ফুর্তি করে। আমাদের সৈন্য আর ভারতের অফিসাররা মিলে যদি একটি বাহিনী গড়ে তোলেন, তবে সে বাহিনী হবে পৃথিবীর সবচয়ে শক্তিশালী বাহিনী।' পাক-বাহিনীর ওপর তার ক্ষোভ ছিল প্রতিটি লেখায়। প্রফুল্ল রায় চৌধুরী বলেন, একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর তিনি ছিলেন আগরতলায়। সে সময় সোনামোড়ার এসডিও মি. রায়ের সাহস দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে যান। সব অফিসার বাড়িঘর ছাড়লেও এসডিও নিজ বাসভবনে বাঙ্কার বানিয়ে ছিলেন। পরে তিনি একদল সাংবাদিকের সাথে কুমিল্লাও যান। তিনি কুমিল্লার সে সময়কার ডিসি ও ডিসি পুলের গাড়ির ড্রাইভার নসু মিয়ার কথা উল্লেখ করেন। তিনি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা। ১৯৭৪ সালে ভুট্টো যখন বাংলাদেশ সফরে আসেন তখন তিনি ঢাকায় ছিলেন। সেসময় বঙ্গবন্ধুর সাথে তার কথাও হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাকে বলেছিলেন, পাকিস্তানের কারাগার থেকে যে নিজের জন্মভূমিতে ফিরে আসতে পারব তা ভাবতে পারিনি। আল্লাহর অসীম রহমতে এবং বাংলাদেশের মানুষের দোয়াতেই ফিরে এসেছি।



দিলীপ চক্রবর্তী : 'কালান্তর'-এর তৎকালীন সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী একাত্তরের স্মৃতিচারণ করে বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যশোরে একটি পাঁচ বছরের শিশুর সাহসের কথা তাকে এখনো স্মরণ করিয়ে দেয় সে সময় বাংলাদেশের মানুষ কতটা দুঃসাহসী হয়েছিলেন। তিনি যখন যশোরের একটি গ্রামে যান, তখন ঐ উলঙ্গ শিশুটি মুখ দিয়ে 'গুরুম গুরুম' শব্দ করে সামনের দিকে এগুচ্ছিল। তিনি গুরুমের কারণ জিজ্ঞেস করাতে ঐ শিশুটি উত্তর দিয়েছিল 'একটা বন্দুক দিতে পারেন, আমি ইয়াহিয়াকে গুলি করে মারব।' দিলীপ চক্রবর্তী বলেন, ১৯৭১ সালে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশন প্রধান হোসেন আলীর বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যের সেই শুভমুহূর্তের ঘটনাটি এখনো গভীর দাগ কেটে আছে

কলকাতাবাসীর মনে। এদিন কলকাতার শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা মিছিল করে বাংলাদেশ মিশনের সামনের দিকে এগুচ্ছেন। মিছিলে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্রসহ বহু নামিদামি শিল্পী। মিছিলটি মিশনের সামনে গেলে বেরিয়ে আসেন হোসেন আলী। করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানান বুদ্ধিজীবীরা। হোসেন আলীর গলায় মালা পরিয়ে দেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও আবুল কালাম আজাদ কলেজের অধ্যক্ষ এএমও গনি এবং ডা. রণেন সেন। হোসেন আলী এরপর পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে তোলেন বাংলাদেশের পতাকা। দিলীপ চক্রবর্তী বলেন, ৪ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করার পরপরই সমগ্র কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ে যে, আমেরিকা সপ্তম নৌবহর প্রেরণ করেছে। শুরু হয় আতঙ্ক। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় এক বিরাট জনসভা। সভায় বক্তারা মার্কিনিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। দিলীপ চক্রবর্তীর আদিবাড়ি ছিল বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জের বেতাল গ্রামে।

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত : একাত্তর সালে সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত ছিলেন 'আনন্দবাজার'-এর সিনিয়র সাংবাদিক। একাত্তরের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, আনন্দবাজার গোষ্ঠী সে সময় বাংলাদেশে নিরীহ মানুষের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বর হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। তিনি বলেন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল মানবতার পক্ষে ও পশুত্বের বিরুদ্ধে লড়াই। সে সময় আনন্দবাজারের সম্পাদক প্রয়াত অশোক দাশগুপ্ত বাংলাদেশে মানবতার বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লেখনীশক্তি আরো জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সম্পাদক তৎকালীন অস্থায়ী সরকারকে ৩০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদানও দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, সুখরঞ্জন দাশগুপ্তের আদি বাসস্থান ছিল বাংলাদেশের ঝালকাঠিতে। ১৯৫০ সালে তিনি ভারত চলে যান। ১৯৭৮ সালে তিনি লেখেন 'মিডনাইট ম্যাসাকার ইন ঢাকা'। গ্রন্থটি ৫টি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর তার ঢাকা যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়।

অনিল ভট্টাচার্য : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন সাহসী সাংবাদিক বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু অনিল ভট্টাচার্য ২০০৫ সালের ২২ মার্চ

ভারতের চেন্নাইতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরলোকগমন করেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের রাজনীতিক, সামরিক কর্মকর্তা, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক যারাই ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা গিয়েছেন তাদের সবার কাছেই অনিল ভট্টাচার্য একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি তখন পিটিআই-এর আগরতলা প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁরা আদিনিবাস ছিল কুমিল্লা জেলায়। তাই নাড়ির টানে পেশাগত ভূমিকার বাইরেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধ উপলক্ষে আগরতলা পৌঁছার পর সেখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের প্রাথমিক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা, নানা প্রয়োজনে সহায়তায় দুঃসময়ে তাঁর পরিশ্রমী ভূমিকা এখনো অনেকের কাছে অম্লান হয়ে আছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তিনি একটি স্মৃতিকথা লেখার কাজ শুরু করেছিলেন কিন্তু শেষ করতে পারেননি।



অতীন দাশ : সাংবাদিক অতীন দাশের জন্ম সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার নয়নশ্রী গ্রামে। লেখাপড়া করেছেন সিলেট এমসি কলেজে। দৈনিক 'ইত্তেফাক' ও সাপ্তাহিক 'যুগভেরী' পত্রিকার ছাতক প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৬৩ সালে ভারতের শিলচর চলে যান। বর্তমানে শিলচর থেকে প্রকাশিত সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক যুগশঙ্খ পত্রিকার সম্পাদক। একাত্তর সালে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের স্মৃতিচারণ করে অতীন দাশ বলেন, একাত্তর সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় শিলচর হয়ে ওঠেছিল এক অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সহায়ক সংস্থার কর্মকর্তারা এখানে আসতেন। ব্রিটেনের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'ওয়ার অন ওয়ান্ট'-এর তিন প্রতিনিধিও এসেছিলেন সে সময়। ব্রিটিশ হাইকমিশনের কয়েকজন পদস্থ কর্মকর্তাও এসেছিলেন।

অতীন দাশ বলেন, একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় দীর্ঘ নয় মাস ব্যারিস্টার গোলাম ওসমানীর বাসা ছিল সবার কেন্দ্রস্থল। এই বাসায় মেজর জিয়াউর রহমান থেকে শুরু করে মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত সবাই

এসেছেন। বিভিন্ন ব্যাপারে উচ্চপর্যায়ের শলাপরামর্শ ও নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক কাজকর্ম হয়েছে এই বাসা থেকে। সে সময় সিলেট থেকে যেসব বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী শিলচর এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের অনেকেই সন্ধ্যার পর এই বাসায় জড়ো হতেন। আমি তখন এ বাসায়ই থাকতাম। এ বাসায় প্রায় নিয়মিতই আসতেন জমসেদ বখ্‌ত মজুমদার। তিনি ছিলেন সিলেট জেলা আনসার বাহিনীর এডজুটেন্ট। তিনি এসেই দুঃখের কথা বলতে শুরু করতেন। আশপাশের স্থানীয় লোকেরা তাদের পরিবারের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত, নানা রকম কটাক্ষ করা ছাড়াও রাতে দু-একদিন তার বাসায় ঢিল পর্যন্ত পড়েছিল। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই ধর্মদ্রোহিতা এবং মুক্তিযোদ্ধারা ভারতের দালাল, এ রকম একটা প্রচার ছিল খুব সুপরিকল্পিত। জমসেদ বখ্‌ত মজুমদারের ছোটভাই এসেছিলেন একই সঙ্গে। তার নাম ছিল হোসেন বখ্‌ত মজুমদার। তবে সর্বমহলে তিনি পরিচিত ছিলেন বাবু মজুমদার নামে। তিনি তার ভাইয়ের পরিবারের প্রতি স্থানীয় লোকদের ব্যবহারের কথা শুনে ক্ষোভে ফুঁসতেন। পারলে এখানেই একটি মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেন আর কী। তাদের অবস্থা ছিল অনেকটা পিঞ্জিরাবদ্ধ বাঘের মতো। অবস্থার পরিপেক্ষিতে সবকিছু মেনে নিতে হয়।

অতীন দাশ বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় যারাই বাংলাদেশ থেকে শিলচর এসেছেন তাদের কাছ থেকে চেনাজানা অনেকের খবর নিয়েছেন। সাধ্যমতো সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সিলেট এসে জেনেছেন চেনাজানা অনেকেই পাকহানাদার বাহিনীর হাতে শহীদ হয়েছেন। অতি ঘনিষ্ঠদের মধ্যে পুরান লেনের বিমলেন্দু সেনগুপ্ত ও খাজাঞ্চি বাড়ির নির্মল চৌধুরীকে পাকসেনারা হত্যা করেছে। কবি রিয়াসত আলীর কথা জিজ্ঞেস করায় কেউ নাকি মুখ খুলতে রাজি হয়নি, শেষ পর্যন্ত একজন খুব নিচুস্বরে জানান পাক-বাহিনীর কলাবরেটর রাজাকার সন্দেহে তাকে খুন করা হয়।

১৯৮২ সালে অতীন দাশ দ্বিতীয় দফা বাংলাদেশ সফর করেন। এই সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, মাত্র এগারো বছরের মধ্যেই দেশ ও জাতির জীবনে ঘটে গেছে নানা ধরনের বিপত্তি, দুর্ঘটনা ও পরিবর্তন। জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে

যারা ক্ষমতা জবর দখল করেছিল তারাও টিকে থাকতে পারেনি। আর তাই অনিশ্চয়তার অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

অতীন দাশ বলেন, বাংলাদেশ থেকে অনেক বুদ্ধিজীবী শিলচরে আসেন। একুশে ফেব্রুয়ারির বাংলা ভাষা আন্দোলন তাদের পৃথিবীজোড়া খ্যাতি দিয়েছে। সেই একুশে প্রেরণা থেকেই জন্ম নিয়েছে নতুন একটি স্বাধীন দেশ। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, তাদের একান্ত নিকট প্রতিবেশী শিলচরে একই কারণে এগারোজনের আত্মাহুতির কোনো খবরই তারা জানেন না। যখন জানেন, তখন আরো তাজ্জব হন যে, বাংলা ভাষার জন্য ওপারে বাঙালিরা প্রাণ দিয়েছিল, এপারে তাদের স্বধর্মীয়দের একাংশ এর বিরুদ্ধে কাজ করছে। তিনি দুঃখ করে বলেন, ইতিহাসে অনেক বিচিত্র ঘটনাই ঘটে। সবসময় তার সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না।

কবি এলাংবম নীলকান্ত : ভারতের একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত মণিপুরী ভাষার খ্যাতিমান কবি এলাংবম নীলকান্ত। ১৯৯৭ সালে তিনি বাংলাদেশ সফর করেন। এ সময় তিনি কমলগঞ্জও সফর করেন। তাঁর সাথে ছিলেন মণিপুরী ভাষার কবি এস নীল বীর শাস্ত্রী ও সাহিত্য পরিষদ ইম্ফলের সাধারণ সম্পাদক ড. টিএইচ ইবোহনবী সিংহ। সে সময় আলাপচারিতায় কবি এলাংবম নীলকান্ত বলেন, মানুষে মানুষে বিভ্রান্তির দেয়াল তৈরি করে যারা বিভক্তির বিষবৃক্ষ রোপণ করে তারা মানবতার দুশমন। কবি এলাংবম নীলকান্তের জন্ম ভারতের মণিপুর রাজ্যের ইম্ফল শহরে ১৯২৭ সালে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন ইম্ফলে। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণ করেন তৎকালীন সময়ের খ্যাতিমান বিদ্যাপীঠ সিলেট এমসি কলেজ থেকে। ভারত বিভক্তির পর তিনি পুনরায় ইম্ফল চলে যান এবং গোহাটি কটন কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে এমএ ও পরে এলএলবি পাস করেন। তিনি মণিপুরী, ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় পারদর্শী। এই চারটি ভাষায় তিনি লিখতে ও পড়তে পারেন।

একাত্তরের স্মৃতিচারণ করে কবি এলাংবম নীলকান্ত বলেন, বাংলাদেশে পাক বর্বর-বাহিনীর বর্বরতা তাকে বিদ্রোহী করে তোলে। তিনি বলেন, অস্ত্র হাতে পাক বর্বর-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে না পারলেও গণহত্যার প্রতিবাদে কবিতা লিখে প্রতিবাদ করেছেন। সে সময়ে লেখা তাঁর কবিতা

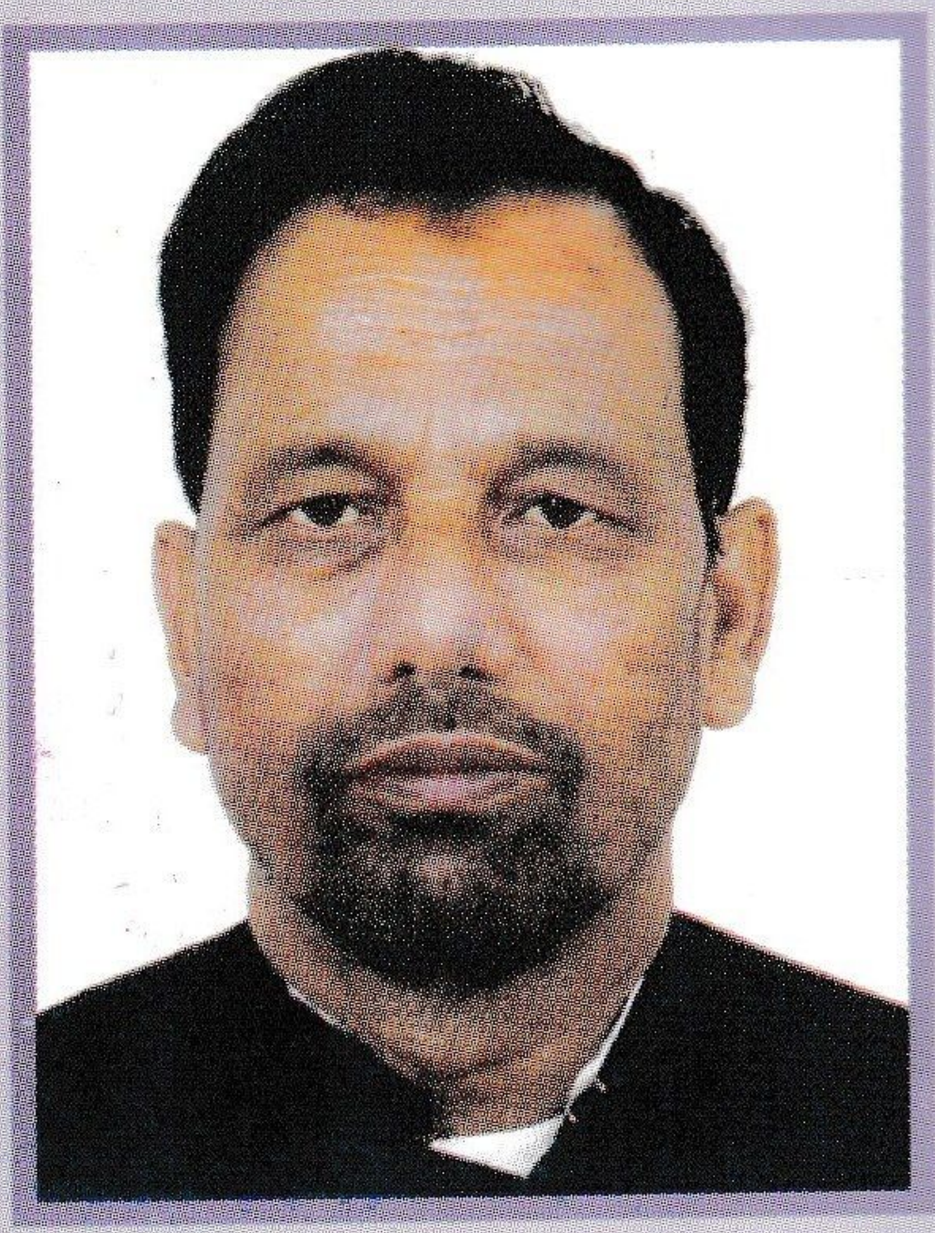


কবি এলাংবম নীলকান্ত'র সাথে লেখক

বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে কলকাতা, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বলে জানান। এমনকি ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারের হত্যা করা হলে তিনি সে নির্মম হত্যার বিরুদ্ধে দ্রোহী ভূমিকা পালন করেন। তিনি এই নায়কীয় হত্যার প্রতিবাদে একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন। যে কবিতাটি বাংলাদেশের কবি এ কে শেরাম বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বাংলাদেশের পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

২০ এপ্রিল, ২০০৫

***তথ্যসূত্র** : অমৃত (অধুনালুপ্ত) কলকাতা, দেশ, কলকাতা, দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, সাপ্তাহিক মনুবার্তা, মৌলভীবাজার, দৈনিক যুগশঙ্খ, শিলচর (ভারত)।*



ইসহাক কাজল জন্ম ২৮ ফেব্রুয়ারি মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ থানার ব্রাহ্মণউষার গ্রামে। পিতা: আমজাদ উল্লাহ, মাতা: সায়রা বেগম। বর্তমানে লন্ডনের ইলফোর্ড-এ বসবাস করছেন।

কলেজজীবন থেকে লেখালেখির হাতেখড়ি। পরবর্তীতে এই লেখালেখিই তাকে একজন বলিষ্ঠ সাংবাদিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। কলমের কাছে থাকতে চেয়েছেন বলে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন সাংবাদিকতাকে এবং এ পেশাতেই আছেন দীর্ঘ তিরিশটি বছর। তিনি শ্রীমঙ্গলের *দৈনিক খোলা চিঠি*'র বার্তা সম্পাদক ও *দৈনিক মৌলভীবাজার বার্তা*'র নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। *সিলেট ডাইজেস্ট* নামে একটি অনিয়মিত সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সাময়িকী সম্পাদনা করেন। জাতীয় দৈনিক *বাংলাবাজার পত্রিকার* শ্রীমঙ্গল ও কমলগঞ্জ থানার প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দুর্দান্ত সব রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে আলোচিত ও সেরা প্রতিনিধির স্বীকৃতি পান। ১৯৯৭-৯৯ সালে বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি, শ্রীমঙ্গল ইউনিটের সভাপতি; ১৯৯৯ সালে কমলগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং ১৯৮৫-৮৬ সালে সিলেট প্রেসক্লাবের নির্বাহী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন রাজনীতির সাথে। রাজনৈতিক জীবনে সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক, জেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক, সিলেট জেলা শ্রমিক কর্মচারি ঐক্য পরিষদের সভাপতি, জেলা সংবাদপত্র হকার ইউনিয়ন ও সমবায় সমিতির সভাপতি, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির জেলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক-এর দায়িত্ব পালন করেন। ইসহাক কাজলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *সুরমা উপত্যকার চা-শ্রমিক আন্দোলন: অতীত ও বর্তমান* শ্রম-সংগ্রামের প্রতিনিধিত্ব করেছে।



ISBN 984 70289 0105 3

